TGPA—18-7-97—48,000 + 54,000 —J.C. No. 5446 + 6426

জলবন্দী

বরুণ চৌধুরী



নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬২

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলকাতা / ৯

মুদ্রক : সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ মনোমোহন বসু স্ট্রিট / কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

JALABANDI

আমার বাবাকে

জলবন্দী

আপনি আর খাবেন না, শুনুন…

তোমার কত বয়স হল, রায়?

সেই ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখে চ্যাটার্জি সায়েব তাকিয়ে আছেন। মাথার চুল বেশ ছোট করে ছাঁটা হলেও মাঝ-বরাবর ছুটো একটা ছোট ঢেউকে কেটে বাদ দেওয়া যায় নি। গালে মুখে নাকে কোথাও কিন্তু কোনো মাংসের ঢেউ নেই। সবই যেন ট্রিম্-করা, সুন্দর। রঙটা কালো হলেও চিবুক নাক মুখের তীক্ষ্ণতার জন্তে এমন মানিয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত রঙের কথা মনেই হয় না। একটা বিরাট এজেন্সির সর্বময় কর্তা অথচ চেহারায় এখনো সেই চৌকস 'স্মার' ভাবটা ফুটে ওঠে নি। হাতে গান্-মেটাল লিংক্স্ নেই। তার বদলে হলদেটে ভাঙা ঝিনুকের বোতাম। শার্টের কলার শক্ত করার জন্তে কোনো বোন্ পোরা নেই। আঙুলে রুপো-বাঁধানো একটা লাল পলার আংটি।

কি হল, উত্তর দিচ্ছ না যে? বলছি তোমার বয়স কত হবে? ত্রিশ-বত্রিশ তো? আমি ও রকম বিশ-ত্রিশটা বসন্ত কুলকুচি করে ফেলে দিলেও, তোমার বয়স আমার বয়েসের সমান হবে না। ভাবছ যা-তা বকছি, তাই না? আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়। জানি, বয়স আমার এখনো ঠিক পাঁচের ঘর পেরোয় নি। কিন্তু দেখলাম তো অনেক, রায়। দু-তিন পুরুষ বেঁচে থেকেও যা দেখা যায় না, আমি যদি বলি আমি এই বয়সেই তা দেখেছি, তা হলে কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। আমার কি মনে হয় জানো, আমাদের মনেরও অনেকগুলো আঙুল আছে। যার মন যত বেশি জন্ম-মৃত্যু-যন্ত্রণার ঘটনা টাইপ করতে পারে যত কম সময়ে— তার বয়স তত বেশি। জন্মের সাল-তারিখে বয়স বিচার হয় না।

আমার বাবা সেটা করতেন বলেই আমি বাবাকে একদম দেখতে পারতাম না।

যাক সে সব কথা। বলো, কি চাও তুমি? রোজ নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আমায় মদ খাইয়ে কি লাভ তোমার। লেখাফেকা আর আসে না আমায়। গত দশ-বারো বছর শুধু চেক সই করা ছাড়া আর কিছুই লিখি নি আমি। লিখতে গেলেই তো ভাবতে হবে। আর ভাবতে ভাবতে পুরোনো স্মৃতিতে ফিরে যেতে হবে। পিছু ফিরে তাকাতে একটুও ভালো লাগে না আমার। এককালে কত গরিব ছিলাম, অভাবে কত কষ্ট পেয়েছি—এ-সব ভাবতে কার আর ভালো লাগে বলো? গরীবকে ঘৃণা করার কোনো প্রশ্ন আসছে না। কিন্তু দরিদ্রতা যে-কোনো গুণ নয় তা পৃথিবীর সব জাতিই মেনে নিয়েছে। মমের কোনো একটা বইতে পড়েছিলাম, কথাটা খুব মনে আছে আমার। দরিদ্রতা ক্যান্সারের মতো তোমার সবকিছু কুরে কুরে খেয়ে নেয়। আর টাকাটা মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো যা না-থাকলে অন্য পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। ত্যাগ-ট্যাগ আমি ঠিক বুঝি না রায়।

সব কিছু ভোগ করতে আমি খুব ভালোবাসি। মদ খেতে খুব ভালো লাগে আমার। দুঃখে দেবদাস হবার জন্যে মদ খাই না আমি। মদ আমার ভালো লাগে। তোমার যেমন লেখা ভালো লাগে। পয়সা যেমন করে হোক বেরিয়ে যাবেই। তার জন্যে মোটেই ভাবি না আমি। যে-কোনো একটা শখকে ঘিরেই তো মানুষ পয়সা ওড়ায়। কেউ রেসে, কেউ বউয়ের জন্যে, কেউ সাধু সন্ন্যাসীর জন্যে। যে যাতে তৃপ্তি পায়। আমি সত্যিই মদে তৃপ্তি পাই। শুধু শুধু ভণ্ডামি করে কি লাভ। তাই বলছিলাম, বারণ কোরো না আমায়। বার্-এ এসেও ঐরকম মা-মাসীর মতো খবরদারি একদম সহ্য হয় না আমার। তার চেয়ে তুমি বরং কেটে পড়ো। আমি একলাই থেকে যাই।

এই সময়টায় বড় অদ্ভুত দেখতে লাগে চ্যাটার্জি সায়েবকে।

কিছুতেই চোখের দিকে তাকাতে পারেন না। ভয় পান। সত্যিই যদি ওঁকে ফেলে চলে যাই আমি! মুখে যা-ই বলুন, আমি জানি উনি একা একা মদ খেতে মোটেই ভালোবাসেন না। তাই ভয় চাপতে গিয়ে মুখটা ওর বেশ ফ্যাকাসে লাগে। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে ওঁর ছোট্ট মুণ্ডুটা অসহায় বেলুনের মতো দোলে। আরো দু পেগ আনতে বলে যেই টাকা বের করার চেষ্টা করি, টাকা সুদ্ধু আমার হাতটা চাপ দিয়ে সরিয়ে দিয়ে চ্যাটার্জি সায়েব বলেন, ওসব রাখো এখন। আমার সামনে বসে কেউ নোট গুনবে—এটা একেবারে সহ্য করতে পারি না আমি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। জানো তো, জলের মানুষ আমি জলেই বিশ্বাসী। সব কিছু জল থেকে ফের জলেই ফিরে যায়। ছোটবেলায় ভূগোলে যখন পড়েছিলাম পৃথিবীর তিনভাগ জল আর মাত্র একভাগ স্থল, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় নি। আজ হাড়ে হাড়ে মানি। জানো রায়, আমাদের দেশে কেউ ঠিক ব্যবসা করতে জানে না। নতুন মাল বাজারে ছাড়ার আগে বেশ মিষ্টি মিষ্টি চমকে দেওয়া নাম রাখতে হয়। আমার মনে হয় বিয়ার বা হুইস্কির নাম জলের নাম দিয়ে রাখলে খুব কাটবে—আর বেশ মানাবেও। সব কিন্তু দেশী নদীর নাম চাই। বিশেষত বিয়ারের নাম যদি 'গঙ্গা' 'মেঘনা' 'পদ্মা' হয়। দু বোতল 'গঙ্গা' খেয়ে ফের এক বোতল 'যমুনা'। আমি একাই তখন ঐসব বিয়ার কম্পানিগুলোকে বড়লোক করে দিতে পারি। রায়, তুমি বিয়ার বের করলে তার নাম কিন্তু গঙ্গা রেখো। আমি গঙ্গাকে কেন এত ভালোবাসি জানো? গঙ্গা আমায় সারা জীবন টেনে নিয়ে যায়। যাদের চিনতাম তাদের মৃত্যু, তাদের বিচ্ছেদ, তাদের শোক ঘৃণা আর রাগ, সব গঙ্গার বুকে বসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছি। বাড়ি ফিরে কাঁদবার সময় পাই নি কোনোদিন। গঙ্গাকে নিয়ে আজ এই যে তোমার সঙ্গে এত সব সেন্টিমেণ্টাল কথা বলছি, এই গঙ্গাকে নিয়ে আবার অনেক ঠাট্টা-তামাশাও করতে হয়েছে আমাকে।

পিটার ব্লুম ছিল ভারি মজার চিফ অফিসার। সোর্ড-মার্কা উইলকিনসন ব্লেডের মতো ধারালো চেহারা ওর। তেমনি ধারালো বুদ্ধি। ডাচ্ লোকগুলোর সাধারণত এত সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ থাকে না। কিন্তু পিটার তার ব্যতিক্রম। এ রকম এক-একটা ব্যতিক্রম না থাকলে সব বড় একঘেয়ে হয়ে যায়। অধিকাংশ বাঙালী কিন্তু এ-সবের ধার ধারে না। বেশ একটা ভরপেট ভাত-খাওয়া ঘাড়ে-পাউডার-মসৃণ জীবনে কতকগুলো বুড়োহাবড়া ধারণা তারা পানের মতো সারা জীবন চিবোতে ভালোবাসে। মরার সময় সেই সব ধারণাই তারা ছেলে নাতি তস্য নাতি সবাইকে উইল করে দিয়ে যায়। যেমন ধরো, ইংরেজ সর্বদা গোমড়ামুখো, ইতালিয়ানরা চোর, স্প্যানিস মাত্রই বদরাগী। মার্কিনরা সবাই দিলদরাজ আর গ্রীক আর স্কটরা হাড়কিপটে—ইত্যাদি ইত্যাদি সব ভোঁতা ধারণা। এ-সব ধারণার খানিক খানিক নিশ্চয়ই সত্যি। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যায়। যাক, যা বলছিলাম।

পিটার ব্লুম। লোকটাকে জীবনে একবারই মাত্র দেখলাম। তাও হয়তো দু সপ্তার বেশি নয়। তবু প্রেমে পড়ে গেলাম লোকটার। যে-কোনো পরদেশীকে বশে আনতে তিন থেকে চার দিনের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। টেকসাসের র‍্যাঞ্চে এক একটা বুনো ঘোড়াকে বশ করার চেয়ে কোনো অংশে কম কঠিন নয় এক-একটা অশিক্ষিত রাগী গোঁয়ারগোবিন্দ শাদা চামড়ার নাবিককে বশ করা। বরং বেশি ধিক্কার বেশি অপমান বেশি ঘৃণা কুড়োতেও হয় এ-সব কাজে। ঘোড়া অপমান করে না, গাল দিতে জানে না, কথার মধ্যে ঘৃণার বিষ ছড়ায় না। বড়জোর হয়তো একটু চাট মারবে। পিঠ থেকে ফেলে দেবে। দাঁত-মুখ ফেটে রক্ত ঝরবে। তার বেশি তো নয়। কিন্তু মানুষ যে হৃদয়ে দাঁত ফোটাতে পারে। বিষ ঢালতে পারে রক্তে।

পিটার কিন্তু তেমন মানুষই না। ওকে বশ করতে হয় নি। উলটে আমিই বশীভূত হয়েছি ওর। জাহাজটা ছিল সুগার বার্থে। এখন

ঘেটার নাম খিদিরপুরের 'ডক-টু'। সুগার বার্থ বা চিনির ঘাঁটি বলা হত এইজন্যে যে এককালে ঐখানে সুমাত্রা জাভা থেকে হাজার হাজার টন চিনি নামত। সে-সব অনেক পুরোনো ব্রিটিশ আমলের কথা। ছেড়ে দাও ওসব। জাহাজটা ভিকট্রি না লিবর্টি-শিপ মনে নেই। তবে ওটা যে একটা পুরোনো জাহাজ ছিল তা বেশ মনে আছে। এ-সব জাহাজে কোথাও ঠাণ্ডা-ঘরের ব্যবস্থার কথা উঠতেই পারে না। জুলাই মাসের ঘামাচি-বেরুনো গলগলে কলকাত্তাই গরম। তার ওপর কেবিনের পাশের ডেকগুলো একেবারে খোলা। রোদের তাতে খাঁ খাঁ করে। তিনতলার পোর্টসাইডে একেবারে শেষ কেবিনটা চিফ অফিসার পিটারের। দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে পড়বে ওর লেখার টেবিল আর চেয়ার। বাঁ দিকে বিছানা। না আছে কার্পেট, না আছে সোফা। একেবারে ছোট্ট একটি খুপরি। এর মধ্যে পিটারকে যেন ঠিক ধরে না। ব্যাটা প্রায় ছ ফিটের উপর লম্বা। পা আর হাঁটু কোনো রকমে মুড়ে দুমড়ে টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে মন দিয়ে স্টোয়েজ প্ল্যান ঠিক করছিল। দরজায় ঘা দিতেই চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁটটা ছুঁচলো করে নাক দিয়ে কুকুরের গন্ধ শোঁকার ভঙ্গিতে সোঁ সোঁ শব্দ করতে লাগলো। তারপর বললে, চলে এসো, চলে এসো, ভিতরে। সোজা ঢুকে পড়বে। কালই তো তোমার সঙ্গে পরিচয় পাত্তা হয়ে গেছে, এখনো আবার দরজায় খুট খুট কেন। আমি ভাবলাম কে আবার নতুন মানুষ এল। তাই গন্ধ শুঁকছিলাম। বসো। সংবাদ কি বলো। জাহাজের কাজ খারাপ হচ্ছে তার জন্যে ঝুড়ি ঝুড়ি কৈফিয়ৎ দিতে চাও তো। তার দরকার নেই। আমি সারাদিন নিজের চোখেই তো সব দেখছি। তোমাদের লোকগুলোও সব হাজার অজুহাত দেখাতে ওস্তাদ। আমি বলি কি, তোমরা বরং রঙবেরঙের কাগজে নানা অজুহাত লিখে একটা ঝুড়িতে ভরে রাখো। মাঝে মাঝে যখনই কাজের গোলমাল হবে এক একটা নতুন রঙের কাগজ টেনে দেখিয়ে দিলেই সব ল্যাটা চুকে যাবে।

আমি ঐ পাগলের কথার উত্তর না দিয়ে, ওর খাটের পাশে

কাঁচের কুঁজোর গা থেকে একটা ছোট্ট লাড্ডুর মতো শুকনো কমলালেবু তুলে বললাম, এটা কি মেড্ ইন্ হল্যাণ্ড? আর যায় কোথা। পিটার শুরু করল।

খাঁটি ভারতীয় ফলের নমুনা হিসেবে ওটা রেখে দিয়েছি বন্ধু। সারা হল্যাণ্ডবাসী জম্মে কখনো এত সূক্ষ্ম লেবু আপেল চোখে ছাখে নি। তাই ভাবছি ওগুলো ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে ভারতের আজব নমুনা হিসেবে দেশে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, যে দেশ এমন উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করে, তার সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কেমন তাই বলো।

মুচকি হেসে পিটার বললে, যদি রাগ না কর তা হলে প্রাণ খুলে বলি।

/বললাম, খামকা রাগতে যাব কেন। আমি তোমার মতো সিড়িঙ্গে লম্বা নই—এ কথা বললে রাগবার কি আছে, তেমনি।

পিটার বলল, তবে শোনো। তার আগে এসো একটু কফি খাওয়া যাক। কটা চিনি দেব তোমায়, তিনটে? আরে বাপরে, এত চিনি খাও? হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোমার দেশের দুটি প্রতীক হওয়া উচিত। এক বুদ্ধদেব, আর দুই ক্যাঙারু। এখানে সবাই দেখি বুদ্ধের মতো ডান হাত তুলে স্বস্তি আর কোলের ওপর বাঁ হাত জড়ো করে ভিক্ষা চায়। সে হিসেবে বুদ্ধদেব সত্যিই বুদ্ধিমান ছিলেন। এমন একটি মুদ্রা বের করলেন যা হাজার বছর ধরে ভারতের প্রতীক হয়ে রইল। আর হল ক্যাঙারু। দেখেছ তো ক্যাঙারু?

বলতে বলতে পিটার উঠে হাঁটু ভেঙে পা বেঁকিয়ে দাঁড়াল। বাঁ হাত পেটের কাছে বেঁকিয়ে, ডান হাতটা কনুই পর্যন্ত ভেঙে বুকের ওপর দোলাতে লাগল। যেন নিজেই এক মূর্তিমান ক্যাঙারু। বলল, এই, এই হল ভারত। পেটের কাছে রোগা স্যাংটো একটা মানুষের ছানা গুঁজে হাত পেতে ভিক্ষা…।

অন্য কেউ আমার দেশ সম্বন্ধে ঠিক এই ধাঁচের কথা বললে আমি

নিশ্চয়ই তার মুখে থুতু ছিটিয়ে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু পিটারের সঙ্গে দিনরাত কাজ করে দেখেছি মানুষটা আমাদের দেশের জন্যে আমাদের চেয়েও কত বেশি কাতর। দুপুর বেলা আমাকে ডেকে বেরুতে বারণ করে। বলে, এই প্রচণ্ড রোদে ওরা যে কাজ ফাঁকি দিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে তুমি তাও হতে দেবে না? ওরাও তো মানুষ? প্লিজ, এখন অন্তত তুমি ওদের তাড়া মেরো না। এই দু-এক ঘণ্টা কম কাজ হলে কিছু এসে যাবে না তোমার।

আমি বাধা দিয়ে বলি, ওরা যে কী ভীষণ কুঁড়ে তা তুমি জানো না চিফ। ওদের একবার ছেড়ে দিলে দু-এক ঘণ্টা কেন, সারা দিনরাত ওরা ঘুমিয়ে কাটাতে পারে।

পিটার বলল, তুমি তো শুধু ওদের দোষ দেখাচ্ছ। অথচ ঠিক ঠিক যন্ত্রপাতির অভাবে, জিনিস-পত্রের অভাবে তোমাদের দেশে কত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায় তার হিসেব জানো? শুধু কতকগুলো আধপেটা দুর্বল মানুষকে চাবকালেই কি কাজ পাওয়া যায়, না দেশের উন্নতি হয়? মেক্যানিকাল উন্নতির জন্যে কি করেছ তোমরা? কতটুকু করেছ তোমরা বলতে পারো?

আমি নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলাম—ওসব তো আমাদের হাতে নেই। আমার যেটুকু দরকার আমার তা আছে। বাকি অজস্র ফর্ক লিফট্, বেশি লম্বা গলার ক্রেন, অনেক মোবাইল ক্রেন, অটোমেটিক গ্র্যাব, বা কনভেয়ার ইত্যাদি লক্ষ ব্যাপার আছে যা সত্যিই উপকারী। কিন্তু সে-সব তো আমাদের হাতে নেই। অত টাকাই বা কোথায়?

পিটার এবার একটু বিদ্রূপের বাঁকা হাসি টেনে বললে, প্রতিকার করার ক্ষমতা যখন তোমার হাতে নেই, তখন মিথ্যে অভিযোগ করে কি লাভ? এ-সব ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি কি! আমি যেভাবে তোমার দেশের বেয়াড়া গরমকে মেনে নিয়েছি। ঠিক করেছি যতদিন তোমার দেশে থাকব সব মেনে নেব। রাগব না একটুও। গান্ধীজি যেমন ঠেঁটি ধুতি আর খালি গায়ে থাকতেন,

আমিও তেমনি ঠেঁটি প্যাণ্ট আর খালি গায়ে থাকতে চাই দিনরাত। উঃ ঘামাচিতে গা ভরে গেল, আর তো পারি না…। এই ছ্যাঁচড়া নদীটা—তোমরা যাকে হোলি গঙ্গা বল—এটার মধ্যে নিরাপদে জাহাজ ঢোকানো যে কি কষ্টের তা তোমরা বুঝবে না। এর বাঁকগুলো যেমন ভয়াবহ তেমনি সরু। তাও আবার পলি জমে জমে বুজে আসছে। এটাকে কিনা তোমরা 'পবিত্র' নদী বল… গঙ্গা গঙ্গা করে পুজো কর…হায়রে…!

আমি বললাম, না সায়েব, ওটাই প্রাণ আমাদের।

পিটার বলল, আরে নদী মাত্রই তো সব দেশের প্রাণ।

বললাম, তাই তো পুজো করি নদীকে আমরা।

পিটার উত্তর দিল, আমরা কিন্তু পুজো করি না নদীকে। শুধু তার উপযোগিতার মূল্য দিই।

একটু থেমে কপালটা হাতের চেটোয় মুছে চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, এবার বুঝলে তো মিস্টার রায়বাবু, কেন আমি গঙ্গাকে হাঁদা প্রেমিকের মতো ভালোবাসি না, কেন আমি তাকে ঘাটের মড়ার মতো পুজোও করতে চাই না। কিন্তু তবু গঙ্গা ঠিক আমার কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করে নেবে। এমন কি পুজোও আদায় করে নেয়। কেমন করে? সে আরো অনেক গল্প। রাত হয়ে যাবে তোমার। মিলি রাগ করবে আমার উপরে। আচ্ছা, তুমি না-ফেরা অবধি কি করে মিলি? সতী-সাধ্বীদের মতো ভাত ঢাকা রেখে নিজে না খেয়ে ঘর-বার করে?

উলটে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি সত্যিই শুনতে চান, চ্যাটার্জি সায়েব?

চ্যাটার্জি সায়েব লাল মাছের মতো বড় বড় চোখ করে বললেন, তার মানে? মিলি সামনে থাকলে তোমায় চড়িয়ে দিতে বলতাম।

আমি হেসে বললাম, মিলি খানিকটা যে তা-ই করে তা জানেন না বুঝি? শুনুন তবে সে কি করে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই দেখি শোবার ঘরে পরম নিশ্চিন্তে মিলির নাক ডাকছে। খাবার-টাবারের

কোথাও এতটুকু চিহ্ন নেই। খাবার টেবিলে শুধু এক গ্লাস জল ঢাকা আর তার তলাতে ছোট্ট একটুকরো চিরকুট। তাতে মিলির এঁ্যাকা-বঁ্যাকা অপরূপ হস্তাক্ষরে লেখা ম্যাগো, এত ঠাণ্ডা ভাত আবার খাওয়া যায় নাকি! ওগুলো প্যালাকে দিয়ে দিয়েছি। বেশি রাত হলে তো তুমি খেয়েই ফেরো। জালের আলমারিতে দুধ ঢাকা রইল। খেয়ে উদ্ধার কোরো। গরম করতে গিয়ে বেশি গ্যাস খুলে রেখো না। তোমার মুখে বড্ড মদের গন্ধ বেরোয়। আমার ঘুম ভাঙালে এক থাপ্পড়…

চ্যাটার্জি সায়েব হো-হো করে হাসলেন। চোখটা রুমালে মুছলেন। আমি ইশারায় আর দু পেগের অর্ডার দিয়ে বললাম, টাইটা আলগা করে এবার আপনার গঙ্গাপুজোটা একটু শুরু করুন চ্যাটার্জি সায়েব।

না রায়, হাসির কথা নয়। গঙ্গা আমায় একটুও সময় দেয় না, একটুও কাঁদতে দেয় না। সে জাহাজটার নাম বোধহয় ছিল 'মালঞ্চ'। অথবা মহানন্দাও হতে পারে। তুমি তো মালঞ্চ নামটা শুনেই ভাবছ বানিয়ে একটা সুন্দর নাম বলছি। তা না, ঐ লাইনের সব কটা জাহাজের নামই 'ম' দিয়ে শুরু। তবু এ-সব মালঞ্চের মালাকার হবার দুর্ভাগ্য যেন তোমার না ঘটে।

সেইলিংয়ের জন্যে সারা দিনরাত প্রচণ্ড ব্যস্ত আছি। গত ৩।৪ দিন সব সময়ই প্রায় গঙ্গায় পড়ে আছি। ঠিক যেদিন জাহাজটা সেইল্ করবে সেদিন জাহাজেই খবর পেলাম গতকাল ভোর ছটায় কাশীর বাড়িতে দাদু মারা গেছেন। ছোটবেলা থেকে আমার সঙ্গে দাদুর যে কি সম্পর্ক তা কারুকে বোঝাতে পারব না। যার একটা হাত কাটা পড়েছে—নেই, তার শার্টেও দুটো হাতা থাকে। একটা হাতা হাতের জন্যে! আর একটা হাতা শূন্যতা ঢাকবার জন্যে। আমি ছিলাম দাদুর সেই শূন্যতা ঢেকে রাখার হাতা। বড় কঠিন বড় করুণ সে ভূমিকা। দাদুর মারা যাওয়ার খবরটা তাই প্রথমে কিছুতেই মাথায় ঢুকল না। শীতের সকাল! কত আলোয় ভরা। খুব

ঠাণ্ডা পড়েছে সেবার কলকাতায়। আকাশ এত নীল যে চামড়াতেও নীলের আমেজ লেগে যায়। অথচ চারদিকের ছুটোছুটি আর প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে সব ভুলে ছিলাম। কিন্তু যখন সূর্য ডুবে গেল, আকাশে রইল কেমন শোক-লাগা লালচে আলো, সেই সময় পশ্চিমে অফিসারদের ডেকে একা একা দাঁড়িয়ে ফের দাদুকে মনে পড়ল। অন্য একটা গঙ্গা বুকের তলায় শুধু বইতে লাগল। একটাও ঢেউ ফুলে উঠল না, বড় হল না। শুধু নিঃশব্দে একটানা বইল আর কাঁদল।

ছেলেবেলায় দাদুর সঙ্গে শিমুলতলার সেইসব দিন আর রাতগুলো হু হু হাওয়ার মতো ভেসে এল। উঃ, কতকাল আগের কথা। যেন আমার জীবনের ঘটনাই নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার শরীরের মধ্যে এসে অন্য কেউ যেন আমার হয়ে বেঁচে গেছে। খানিকটা যেন, তোমার খালি ফ্ল্যাটে আমি গিয়ে কিছু দিন থেকে গেলাম সে রকম আর কি। কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে ঘটনাগুলো আমারই জীবনের।

জাহাজ থেকে তাড়াতাড়ি সিলিং ফেরত পাঠাবার জন্যে নিচে থেকে পরিতোষবাবু সমানে চ্যাঁচাচ্ছেন। আমার বুকের মধ্যে তখন কিন্তু ছোটবেলার শিমুলতলা। মাঝ রাত্তিরে ঘুমচোখে ট্রেন থেকে নামা। মায়ের হাত ধরে পাথরে হোঁচট খেতে খেতে চাঁদের দুধপথ পেরিয়ে শিমুলতলার বাগানে ঢোকা। বিরাট বাগানের চারদিকে ঘন ডোরেণ্ডা গাছ ছেঁটে ছেঁটে হাতি ঘোড়া বাঘ সিংহ জেব্রা জিরাফ করা। সেইসব জানোয়ারগুলো মস্ত কালো কালো ছায়ার শরীর নিয়ে গোল্ডেনমায়ারের আফ্রিকার জঙ্গলের ছবির মতো এখনো যেন মাথার চারপাশে ঘোরে। বাগানের মধ্যে একটু দূরে দূরে দুটি পুকুর আর ছোট্ট একটা সাঁকো পেরিয়ে পথ চলে গেছে সোজা বাড়ির পায়ের কাছে শাদা পাথরের সিঁড়িতে। সিঁড়ির দু পাশে শ্বেত পাথরের দুটি সিংহ ছিল আমার দারুণ পোষা। কিছুতেই ভেবে পেতাম না বনের মধ্যে আসল সিংহগুলো কেন এত বজ্জাত। কেন

তারা পিঠে চাপতে দেয় না। কেন তারা মানুষ খায়। সিঁড়ির উপরে অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় দাদুর একহারা সোজা লম্বা শরীরটা দালানের একদিক থেকে অন্যদিকে পায়চারি করছে। কি অদ্ভুত চেনা দাদুর এই পায়চারির ভঙ্গিটা। এখনো চোখ বুজলেই দেখতে পাই। খালি-গা। পরে আছেন সেই অদ্ভুত খাপি শুভ্র থান ধুতি। যেমন ফরসা তেমনি নিভাঁজ। প্রায়ই মনে হত, দাদুর ধুতি কি কখনো ময়লা হয় না। পায়ে বার্নিশ করা নরম কাফ-লেদারের ঢাকা-চটি। পায়চারি করার সময় খুব হালকা একটা খুট খুট শব্দ হত। অজস্র লোহার হ্যাণ্ডকার্টের শব্দে শেড্ কাঁপছে। হু হু করে ফুল-চেস্ট চা আসছে তাতে। মুহূর্তের মধ্যে ফলেঞ্চা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড বিক্রমে ফোঁস ফোঁস স্টিম ছেড়ে উইঞ্চের ড্রাম ঘুরছে। অনবরত ভারি গলায় ফোরম্যান হোসেনের 'স্যার' 'স্যার' আর ভালো লাগে না। আমি করব কি। এর চেয়ে তাড়া আর মানুষের পক্ষে সম্ভব না। গ্যাংয়ের সর্দার দুটোকে চোখ টিপে খালি পয়সার লোভ দেখাচ্ছি। গ্যাং দুটো খাটছে সাংঘাতিক। শেডের চারদিকে টি-মানি ছড়াতে হবে। তবে কাজ হবে। টাকা টাকা টাকা। টাকা দিয়ে কি না হয়। এতটা বয়স পর্যন্ত এই কথাটা চরম সত্যি মনে হয়। তার পর এটাও মিথ্যে হয়ে যায়। অজস্র টাকা দিয়েও দাদু দুটি ছেলের একটিকেও বাঁচাতে পারেন নি, এন্টিবায়টিক্সের যুগ নয় সেটা। তাই ফুসফুসের রোগ ধরলে বা টাইফয়েড হলে মারা যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না। দাদু কিন্তু তার জন্যে একদিনও একফোঁটা চেঁচিয়ে কাঁদলেন না। শুধু সরে গেলেন। জীবন থেকে। জাহাজ থেকে। গঙ্গা থেকে। একে কিন্তু পালিয়ে যাওয়া বলে না। এর নাম ত্যাগ। যে-কোনো সন্ন্যাসীর থেকেও বড় ত্যাগ। একেবারে বেপরোয়াভাবে লোভ ছাড়তে না পারলে এতখানি নিষ্ঠুর যোগী হওয়া যায় না। দাদুর হাতে টাকা আসছে তখন বানের জলের মতো। এই জাহাজ এই গঙ্গাজলেই টাকা। কিন্তু এই বানের দিকে দাদু অটল পাহাড়ের মতো পিঠ ফিরে দাঁড়ালেন। যে টাকা দিয়ে

স্নেহ আটকে রাখা যায় না, ভালোবাসাকে বাঁধা যায় না,—পেচ্ছাপ করে দি সে টাকায়। চাই না টাকা, ব্লাডি ফুল। ছেড়ে দিতে হবে। সরে যেতে হবে। একেবারে সরে যেতে হবে। সরে যান স্যার সরে যান, খবরদার, ওয়্যার আসছে—চিৎকার করে উঠল খাঁদা উইঞ্চম্যান। সাপের মতো লিকলিকে ওয়্যারটা ডেকের উপর ঝট্ করে একটা লম্বা হিলিবিলি তুলে ফল্কার মধ্যে ঢুকে গেল। অসাবধানে ওর উপর পা পড়লে ছুঁড়ে ফেলে দিত কোথায় কে জানে। কিন্তু সরেই বা দাঁড়াব কোথায়। জায়গা কই। সারা ডেক বিম্ ওয়্যার ব্লক নোংরা-ড্রাম আর লকড়িতে ঠাসা। পা ফেলার জায়গা নেই। আর একটু সরলেই জলে পড়তে হবে। উঃ, এই ঠাণ্ডায় গায়ে জল লাগলেই হয়েছে আর কি। কি ভয় যে করত এই শীতের সকালে শিমুলতলায় কুয়ার জলে চান করতে। দুটো গরুতে কুয়া থেকে টেনে জল তুলত। চামড়ার বিরাট ভিস্তিটা আমাদের মাথায় আলগা করে দেওয়া হত। শুধু আমি নয়, সারা বাগান ঠাণ্ডা কুয়ার জলে চান করত। কুয়াতলায় বসে চোখের পাতায় ঝিকিমিকি জলের ফোঁটার মধ্যে দিয়ে দেখতাম শীতের শিশির-ঝলমল তাজা গোলাপগুলো। গোলাপ লাল সবাই জানে। কিন্তু সবুজ? দাদুর হাতে তৈরি সবুজ গোলাপ দেখেছি। দুপুরে ঘুম পাড়াবার ভয়ে মার কাছ থেকে পালিয়ে সারা দুপুর ময়ূর, হরিণ, হাঁস আর খরগোশের ঘরের পাশে ঘুরঘুর করেছি। ফলন্ত আঙুর আর চেরীর লতাকে কত অনুরোধ করেছি একটু নিচু হতে। গরমের দিনে আবার তেমনি গোলাপজামের, জামরুলের ফুল ছিঁড়ে পাউডারের পাফের মতো আলতো করে গালে বোলাতাম। নুন দিয়ে কাঁচা আম খেতে খেতে যখন খুব গরম লাগত, এক ছুটে গাছঘরের ভিতর ঢুকে যেতাম। দিন দুপুরেও অন্ধকার গাছঘর। উপরে শুকনো শ্যাওলা আর ঘন লতাপাতায় ছাওয়া। ভিতরটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা ছায়ায় ভরা। কবিরাজী দোকানের মতো ভিতরে শেকড়-বাকড়ের বুনো গন্ধভরা কালো কালো পাথরের ছোট ছোট পাহাড় ছিল।



তাতে নানা দেশের নানা রঙের কত মহার্ঘ অর্কিড ঝোলানো। কোনোটা দক্ষিণ আমেরিকার, কোনোটা আফ্রিকার। আরো কত দেশের ছিল তা আর আজ মনে পড়ে না। কত দেশ আর কত বাগানের চা যে লোড হচ্ছে, মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। বিভিন্ন মার্কা, বাগান আর শিপার অনুযায়ী আলাদা আলাদা প্রায় আশি হাজার পেটি চা তোলা হচ্ছে। অথচ চিফের ঘরে আমার মাত্র এক কাপ চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। একবার সময় পাচ্ছি না একটু ডেক ছেড়ে কেবিনে গিয়ে সুস্থির হয়ে বসব।

রাত্তিরে শীত বাড়ছে। ডেকে আর দাঁড়ানোই মুস্কিল। জল থেকে হু হু করে কনকনে হাওয়া উঠছে। গায়ের একটা সোয়েটারে আর শীত বাগ মানছে না। আকাশের দিকে তাকালাম। তারার ছিটেতে আকাশ ভরে গেছে। কিন্তু ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সব অস্পষ্ট দূর অস্বচ্ছ। সাঁওতাল পরগনায় দাদুর সাম্রাজ্যের সে-আকাশ এখানে নেই। সারা রাতের ঝড়ের শেষে, কোনো আলো ফুটি-ফুটি থমথমে ভোরে বাগানে সব দল বেঁধে আম কুড়োতে যেতাম।

মাসিদের পিছু পিছু আমিও যে আছি তা কারুর খেয়ালই নেই। অথচ আমিও আমার হাতের তুলনায় বড় আমগুলো দু হাতে তুলে ঝুড়িতে ফেলেছি। সেদিনের ঘাসপাতার শরীরে ঝড়-বৃষ্টির গন্ধ, ভোরের নীলাভ আলো—সব এখনো স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। মালির ছেলেটা ফিসফিস করে বলেছিল, এখানে সব পাথরই চকমকি পাথর। একটু ঠোকাঠুকি করলে যে-কোনো পাথরেই আগুন জ্বলে। লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে ঠুকে দেখতাম সত্যিই আগুনের ফুলকি ঝরছে। সমানে পাথর ভরে ভরে শার্টের পকেট ছিঁড়ল। মা কত বকলেন। অথচ একবারও বুঝলেন না ছোটরা তাদের ভালো-লাগা স্মৃতিগুলো কি গভীর বিশ্বাসে পকেটে লুকিয়ে রাখতে চায়। তারা পারলে এই সাঁওতাল পরগনার বিশাল অন্ধকার-আলো গোলাপবাগান খরগোশ চকমকি রাত—সব কলকাতায় নিয়ে যাবে। তার থেকে একটুও খরচ করবে না, পাছে ভাগে কম পড়ে।

এক এক দিন সকালে নতুন বাগানের দিকে বেড়াতে যেতাম। দু পাশে সারি-দেওয়া লম্বা লম্বা ইউক্যালিপটাসের দোলা। হাওয়ার মধ্য দিয়ে পাতার সাঁ সাঁ আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। শুকনো পাতাগুলো আঙুলে রগড়ালে ঠিক ইউক্যালিপটাস-অয়েলের গন্ধ। সর্দি হলে মা রুমালে দিয়ে দিতেন বলে গন্ধটা খুব চেনা। বিকেলে কোনো-কোনোদিন কুঁড়োজালি ফেলে পুকুর থেকে ভুসো চিংড়ি ধরতাম। গাছের শুকনো ডাল দিয়ে ক্রশ তৈরি করে তার চারমাথায় গামছা বেঁধে জাল তৈরি হত। গামছার গায়ে ছাতু মাখিয়ে তাতে পাথর দিয়ে ক্রশের মাঝখানে দড়ি বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে দিতাম। খানিক পরে টেনে তুললেই একমুঠো চিংড়ি। পুকুরপাড়ে বসে বসে খুব কাছ থেকে ট্রেনের শব্দ শুনতে পেতাম। আজও কোনো নির্জন জায়গায় ট্রেনের শব্দ শুনলে বুকটা ছ্যাঁৎ করে করে ওঠে। বুকের মধ্যে শিমূলতলা ফিরে আসে। সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে গেলে মধুর মতো ঘন তরল অন্ধকার চোখের পাতায় টিপ টিপ করে পড়ত। কিছুই আর দেখতে পেতাম না। উঠে পড়তাম। জোনাকি-জ্বলা সেইসব পাথুরে রাত, লণ্ঠনের আলোয় গরম গরম শাদা আতপ চালের ভাত, আলুভাজা, মশারির মধ্যে দিদার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনা—সব যেন রূপকথা হয়ে গেছে। সেই রূপকথার রাজ্যে প্রতিটি ঘাস গাছ ফুল জীবজন্তু—সবই যাঁর আপন হাতের ছোঁয়ায় বেড়ে উঠেছে, সেই দাদুই আজ নেই। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেবেলাও আর নেই।...চা-ও আর বেশি নেই। আমার কাজ প্রায় শেষ। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। সারা রাত এই স্পিডে কাজ চললে কাল সকালে আর বিশেষ কিছু পড়ে থাকবে না। এখন ভালোয় ভালোয় রাত কাটলে হয়। অথচ আর একদিন দেরি করলে হেসেখেলে জাহাজ ফিনিশ হয়ে যেত। আমি অন্তত একটু সময় পেতাম দাদুর কথা ভেবে কাঁদবার। কিন্তু তা হবার নয়। কারুর চোখের জলে গঙ্গার ড্রাফট বাড়ে না। বরং এর পর প্রতিদিন জল কমবে। তখন তেইশ ফিট ড্রাফট পাওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে। ফলে এত

লোড নিয়ে জাহাজ সেইল করতে পারবে না। সুতরাং আজই খেল খতম করতে হবে। ঠোঁটটা খড়ের মতো শুকিয়ে গেছে। হাতে বড্ড তেলকালি—মুখেও। তার ওপর গাল বেয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ক্লান্ত হাতে গ্যাং ওয়ের দড়ি ধরে নামতে নামতে মনে হল যেন দাদুর কাজ করে ফিরছি। কাজের মানুষকে কাজ দিয়েই প্রণাম জানাতে হয়। তাতেই তাঁরা খুশি হন। এই লাইনে দাদুর চিরকাল একাধিপত্য ছিল। একলা দাদুর প্রচণ্ড পরিশ্রমে এ লাইনের জাহাজ থেকেই তাঁর ঘরে লক্ষ্মী এসেছিল। কিন্তু পর পর দুই ছেলেকে ফুল সাজিয়ে এই গঙ্গাতেই তাদের অস্থি ভাসিয়ে দাদু নিজেই কলকাতা ছেড়ে কাশী চলে গেলেন। আমার দ্বিতীয় শৈশব তাঁবু পাতল কাশীতে।

আবার গঙ্গা। কাশীর গঙ্গা। গঙ্গা কিছুতেই ছাড়বে না আমায়। আমার কাছ থেকে সে পুজো আদায় করে নেবে। এক একটা মেয়ে থাকে দেখবে, মাথায় তাদের খালি দুষ্টুমি বুদ্ধি। হয়তো তোমার সমবয়সী কিংবা তোমার থেকে হয়তো কিছু ছোটই হবে। এমনিতে তুমি তাদের গাল টিপে, পিঠে কিল মেরে আদর করতে পার। তারা কিন্তু সুযোগ পেলেই সম্পর্কে বড় হওয়ার সুযোগে তোমার কাছ থেকে প্রণাম বাগিয়ে নেবে। প্রণাম হয়ে গেলে তাদের মুখে দেখবে সেই কেমন-জব্দ-ঠিক-হয়েছে টাইপের হাসি। গঙ্গাটা আমার জীবনে তেমনি। চতুর্থীতে দাদুকে গঙ্গাজল দিতে হয়। গঙ্গাজল দিয়ে পুজো। পুজোর ঘরে ঢুকেই বুকটা ধক করে উঠল। দাদুর অজস্র স্মৃতি। যাদের নিয়ে আমার সারাটি ছেলেবেলা, যাদের সব অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলাম সেই সব স্মৃতিরা একসঙ্গে ফিরে এলো মনে। বুকের মধ্যে নিঃশব্দ সারিতে দাঁড়িয়ে তারা সামরিক কায়দায় শেষ অভিনন্দন জানাতে চাইল !···প্রচুর কার্বনব্ল্যাক এনেছে নতুন জাহাজটা। জঘন্য মাল। শুধু বস্তা বস্তা হালকা কালো ধুলো। সারাদিন খেটে মরলেও টন উঠবে না বেশি। আর বিলিতি কায়দায় সব আবার কাগজের বস্তা। ফলে, একটু টানাটানিতেই বস্তা ফেটে,

পাউডারের মতো মিহি কালো ধুলো ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। 'মিল্-অর' (আওয়ার) মানে খাবার সময় সবাই কাজ বন্ধ করে জাহাজ থেকে নেমে যায়। কার্বনব্ল্যাকের কালো প্রত্যেককে একেবারে নিখুঁত কুচকুচে মেক-আপ দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়েছে। নামবার আগে তাই সবাই ডেকে জলের পাইপ খুলে হাত মুখ ধুচ্ছে। কালো কালি উঠে ধীরে ধীরে আসল চোখ মুখ নাকের রেখা ফুটে উঠছে। সেই কাশীর মুখ। কেদারবাবুর লাল সুপুরির দোকান। রমাপুরায় ইন্দ্রবাবুর ফটোর দোকান। ধান নামের সেই মেয়েটা আর তার আধপাগলা বন্ধ কালা ভালোমানুষ বাবা। ছোট ভাইটা মারা যেতে তার বাবার মাথাটা একদম বিগড়ে গেছে। ইউনিভার্সিটির সুতপা, রঘুদার আখড়ার নিশি, ঘোর মাতাল নেপালবাবু—ইত্যাদি আরো কত মানুষের স্মৃতি নিয়ে কাশীর আসল মুখটা ফুটে উঠছে। গাড়ির মতো সময়কেও ডি-কার্বোনাইজ করতেই হয়। সময়কে ডি-কার্বোনাইজ করলেই দেখবে ভেতর থেকে স্মৃতির মুখ ফুটে উঠছে।

বিকেল বেলা দাদুর হাত ধরে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যেতাম। এ গঙ্গা কিন্তু সে গঙ্গা নয় মোটেই। এ আর এক গঙ্গা। ট্রেনটা ধীরে ধীরে ব্রিজের উপর উঠছে। ওপারে সেই পিকচার পোস্টকার্ডের চিরন্তনী কাশী। বেণীমাধবের ধ্বজা, অসংখ্য পায়রা ভরা মন্দির আর উঁচু উঁচু পাথরের ধাপ আর ছাতা। এপারে শুধু রামনগরের রাজবাড়ি আর শাদা টেবিলঢাকায় সোনালী চা-পড়ে-যাওয়া দাগের মতো বালি। এপারটা ব্যাসকাশী। দাদু বলেছিলেন ব্যাসকাশীতে মরলে গাধা হয়। ছেলেবেলায় খুব ভয় করত যখন ট্রেনটা ব্যাসকাশীতে পৌছুত। গতি কমিয়ে ট্রেনটাকে ব্রিজে উঠতে হত। আমার দারুণ রাগ ধরত ট্রেনটার ওপর। আর একটু জোরে গেলে কি এমন ক্ষতি হয় বাবা! এখানে যদি মরে যাই, ঠিক গাধা হতে হবে। গাধা হয়ে জন্মাতে আমার একটুও ভালো লাগে না...। এখনো মনে হয় কাশী গেলেই দেখব, দাদু সেই ছোট্ট

দালানটিতে পায়চারি করছেন। এখানে শিমুলতলা নেই। বাগান নেই। বড় বড় দালান নেই। লোহার গেট পেরুলেই ছোট্ট এক চিলতে উঠোন। উঠোনের দু পাশে মাত্র দশ-বারোটা গাছ। একটা শাদা ফুলে ভরা টগর। দোতলার বারান্দা অবধি একটা লতানে যুঁই। হাজার গাছের নিশ্বাসে ভরা বিরাট আকাশ, কত জীব-জানোয়ার আর লক্ষ ফুলের মাটির ঢেউ—নিজের হাতে গড়া বিশাল রাজত্ব নিজেই স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে এসেছেন দাদু।

কাশীতে দাদুকে দেখতে বড় অদ্ভুত লাগত। উত্তর কলকাতার কেঁচোটে মহেন্দ্র সরকার লেনের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়া একটা মস্ত ইমপালা গাড়ির মতো। মাঝে মাঝে আবার বড় বেশি নির্মম মনে হত দাদুকে। যেন একটুও দয়া মায়া নেই। কেন একবার ভুলেও খোঁজ করেন না সেই শিমুলতলার। কেন কাউকে কখনো জিগেস করেন না সেই পাকা সোনার মতো কামরাঙা ভরা গাছটা কিংবা নিজের হাতে তৈরি কলমের গোলাপগুলো সব কেমন আছে। শিলাবৃষ্টির রাতে শাদা ময়ূরটা মরে গেল কি করে। পিচ, চেরি আঙুরলতাগুলো কি সত্যিই শুকিয়ে গেছে। আর অত সুখের নীলার মতো অর্কিডগুলো? ভাবতাম সত্যিই কি একটুও মায়া নেই দাদুর। পরে বুঝেছিলাম সবই ছিল দাদুর। কিন্তু ওসব কথা ভাবতে নেই, ওসব কথা বলতে নেই। মায়াতেই মায়া বাড়ে। দাদুর সঙ্গে বেড়াতে না গেলে মন খারাপ হয়ে যেত। কোনো কোনো দিন বিশ্বনাথ গলি কিংবা চকে বেড়াতে যেতাম। রোজই এটা-সেটা কিনে দিতেন দাদু। ক্যারম খেলার জন্যে হাতির দাঁতের স্ট্রাইকারটা মনে হয় এই বুড়ো বয়েসেও আমারই কোনো শার্টের পকেটে রয়েছে। মাটির জিনিস কিন্তু কখনো কিনে দিতেন না দাদু। গঙ্গার ঘাটে সব কি সুন্দর রঙিন পুতুল আর ঠাকুর। দাদু বলতেন না, কাশীর থেকে মাটির জিনিস নিয়ে যেতে নেই, সোনা চুরি করা হয়। কিনতে যদি বা পারি কিন্তু কলকাতা নিয়ে যেতে পারব না। ফলে কি লাভ কিনে। কাশীর মাটি সোনা কেন দাদু? উত্তরে দাদু বলতেন,

এটা যে বিশ্বনাথের দেশ। এখানের মাটিতে তাঁর পা পড়ে। এ মাটি তো সোনা হবেই। কাশী থেকে ফেরার সময় তাই জলের কুঁজোও নিয়ে আসা চলত না।

দাদুর কাছে পুরোনো হারানো কাশীর কত গল্প শুনতাম। বরুণা আর অসী মিলে বারাণসীর গল্প। অন্ধকার মণিকর্ণিকায় লাল লাল চিতার আগুন। দশাশ্বমেধের গল্প। দশাশ্বমেধ ঘাটে মায়ের ঋণ শোধ করতে গিয়ে মন্দির ডুবে যাওয়ার গল্প। হরিশ্চন্দ্র ঘাটে রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প। অসীতে বাজরার উপরে দুশো বছরের জীবন্ত মৌনীবাবা। এমনি আরো কত গল্পের বাস্তব দালান ঘাট মন্দিরে দাদুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াতাম। ফিরে এসে দাদু স্নান সেরে সন্ধে করতেন। তার পর নুন দিয়ে শসার কুঁচো, কলা আর বেলের সরবৎ। বেলের সরবৎ আমাকেও খেতেই হত। বেলের সরবৎ আমার একটুও ভালো লাগে না। তবু খেতেই হবে। খেতেই হবে খানিকটা নীট স্কচ্। লুইস বলল, 'কাছে পিঠে ঠাণ্ডা জল নেই যে। বরফও নেই। না কোরো না, খেয়ে নাও। আমার একা একা ড্রিঙ্ক করতে একটুও ভালো লাগে না। আরে, খেয়ে নাও বললেই তো খাওয়া যায় না। আচ্ছা মাথা খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়েছি। হুইস্কির প্রথম চুমুকটাই আমার দারুণ বিশ্রী লাগে। তার উপর একেবারে নীট। কেবিনের ভেতরটা যা গরম। তার চেয়ে বাইরের ডেকে বসলে বাঁচা যায়। বাইরে থেকে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকেই দাদু ঠিক দিদা আর বড় দিদাকে কথায় কথায় রাগিয়ে দিতেন। সবুজ চামড়া-বাঁধানো ভারি ইজিচেয়ারটার উপরে দাদুর ছাইরঙা ফ্লানেলের ফতুয়াটা পড়ে থাকত। সেটা পরে, তার উপর গায়ের চাদরটা জড়িয়ে, সেই ঢাকা চামড়ার চটিটা পায়ে গলিয়ে ফের খুটখুট করে দালানটুকুতে পায়চারি। পুরুত মন্ত্র বলছে। দাদুর নামগোত্র জিগেস করছে। আমি স্বপ্নের মতো বিড়বিড় করছি। মাত্র আঠারো মাস আগে দিদার কাজ করেছি। এ পুরুত নয়। কুলকাকা নিজে করিয়েছিলেন। এ পুরুতটাকে সন্থ

করতে পারি না। ফাঁক পেলেই বিড়ি খাবে। নামাবলী গায়ে বিড়ি খেলে আমার দারুণ রাগ ধরে। যদিও কোনো কারণ নেই রাগ করার। তবু আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। আমায় আবার বলছে দশবার গায়ত্রী জপ করতে। একেবারে বুদ্ধু মার্কা। ভাগ্যিস গায়ত্রীটা মনে আছে। কুলকাকা হলে চেঁচিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র বলে দিতেন। জানতেন আমার কিচ্ছু মনে থাকে না। ঠাকুর-দেবতায় তেমন মতি নেই। তবু কুলকাকা ভীষণ ভালোবাসতেন আমায়। বেচারা কুলকাকা। একঘর ছেলেমেয়ে। অথচ রোজগার বলতে তো মাত্র দু ঘর ঠাকুর পুজো। সব ঝামেলা ছেড়ে ছুড়ে মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে আমেরিকান ছবি দেখতে খুব ভালোবাসতেন। কাউকে না বললেও আমাকে একসময় লুকিয়ে লুকিয়ে সব খুঁটিয়ে জিগেস করতেন। বলতেন, লেখাপড়া জানি না যে, ইংরিজি বুঝবো কি করে। তুমি আমায় গল্পটা একটু বল না কাকা—। আমার অত সময় নেই। প্রায়ই বলতাম পরে বলব। একদিন দেখলাম কুলকাকারই আর সময় নেই।

লাশ তখনও মর্গে নিয়ে যাওয়া হয় নি। সকালে চৌবাচ্চার উঁচু পাড়ে বসে গল্প করছিলেন। হঠাৎ পড়ে গিয়ে, চৌবাচ্চার উঁচু পাড়ে মাথা লেগে, মাথার ভেতর রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। সকালেই মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধের সময় ডক থেকে সোজা ওখানে গিয়েছিলাম কেমন আছেন দেখতে। কলেজ স্ট্রিটের সেই চিরচেনা ট্রাম বাস ঠেলা রিকশা আর অগুনতি মানুষের স্রোত ঠেলে মেডিকেল কলেজ। আাউটডোর, এমারজেন্সি সর্বত্র প্রচণ্ড ভিড়। আমার কথা শোনার সময় নেই কারুর। প্রথমে এমারজেন্সিতে ছিল। তার পর কোথায় গেছে সেটা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের জানার কথা। শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। একটা হবু ডাক্তার আর পুষ্ট নার্স সেই বিখ্যাত গথিক থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কি সব ফষ্টিনষ্টি করছিল। আমি একটি মূর্তিমান আপদের মতো তাদের সামনে হাজির হলাম।

মেয়েটার কেন জানি না দয়া হল। সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া বেডটা দেখিয়ে দিয়ে আর্দালিকে বলে দিল, আমি যদি মুখ দেখতে চাই তা হলে ঢাকা খুলে আমায় যেন দেখানো হয়। একবার ভাবলাম ঐ তরুণ ডাক্তারটার হাত চেপে ধরে জিগেস করি কুলকাকা একটুও বেঁচে আছেন কিনা। দেখলাম মেয়েটা এক ঝটকায় ছেলেটার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লম্বা সিঁড়িগুলো লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে। পেছনে ছেলেটা গম্ভীর মুখে বেশ খানিক দূরত্ব রেখে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। তাদের সিলিউট ক্রমে লং-সট হয়ে মিলিয়ে গেল। ঘরটার মধ্যে লোহার কালো লিকপিকে বেডের উপর নোংরা চাদর ঢাকা। আশেপাশে অন্য দু-চারটে রুগী বোধহয় জ্যান্ত ছিল। সে-সব দেখার চোখ নেই আমার। মাথার মধ্যে ভীষণ লাগছিল। পেরেক পোঁতার যন্ত্রণা। গা-বমি করছিল। সারা মুখে হাতে ডেকের তেল কালি আর ক্লান্তি। ডান হাতের একটা আঙুল কেন যে এত কাঁপছে। রুপোর কোশাকুশির মধ্যে গঙ্গাজলে কালো কালো তিল ভাসছে। আঙুলের কুশ দিয়ে সেগুলো ঠেলতে ঠেলতে বড় রাগ ধরছিল। দাদু, কুলকাকা কেউ নেই। সবাই মরে গেল। কাশীর বাড়িতে যুঁইয়ের লতার পাশ দিয়ে আজও সকালের রোদ ঢুকবে দাদুর ঘরে। দাদু কিন্তু আর উঠবেন না। শেষের দিকে খুব বেলায় ঘুম ভাঙত দাদুর। আজ বেলা শেষ হয়ে গেলেও ঘুম ভাঙবে না। দাদুর মশারি তোলার দরকার হবে না। ছাইরঙের ফ্লানেলের ফতুয়াটা তেমনি পড়ে থাকবে। কাশ্মীর থেকে ফেরার সময় মাত্র একমাস আগেও দাদুকে দেখে এসেছি। শ্রীনগরের রক্ত-ফোঁটার মতো টুকটুকে লাল আপেল এনেছিলাম দাদুর জন্যে। তবে এ যেন অন্য দাদু। সব চুকিয়ে একেবারে তৈরি। দিন-রাত পাথরের মতো স্থির নিস্পন্দ। জগতের পরিচয় যেন ভুলেই গেছেন! আমাকে দেওয়াল আলমারির তলার তাকটা ইশারায় দেখিয়ে দিলেন। প্রচুর হলদে-হয়ে-যাওয়া কাগজের তলা থেকে একটি কাগজের ছোট্ট টুকরো বের করে পড়তে বললেন। দেখলাম আমারই দাদুকে লেখা ছোট বেলার একটা চিঠি। কিছুই

তেমন নেই তাতে। অতি মামুলি একটা ছোট ছেলের গোটা গোটা, লাইন-ভর্তি অক্ষরের কয়েক ছত্র চিঠি, তার মধ্যে একটি লাইনে দাদুর সবুজ কালিতে দাগানো, আমি এখানে একরকম অঙ্ক শিখিতেছি তাহার নাম জ্যামিতি। হাসি পেল। চোখ তুলে দাদুর দিকে তাকালাম। দেখলাম সে চোখ তখন ছুটির দেশে চলে গেছে। কাজকর্ম বা মানুষের চেনা জগতের কথা—সব যেন স্মৃতি হয়ে গেছে সে চোখে। এই বয়সে হয়তো এইরকমই হয়। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে, ছুটির দেশে দেখা কোনো ঝর্ণা যেমন আমাদের কাছে দূরের কোনো স্মৃতির মতো মনে হয়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছাই করে না—ঠিক তেমনি। সত্যিই এমনি একটা বয়েস আসে যখন দুনিয়ার সব কাজ মানুষ ইচ্ছে ইত্যাদি সব কিছু যেন বহুদূর চলে যায়। চোখের সামনে থাকে শুধু চেরাপুঞ্জির পথের বাঁকে ভুলে যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া সেই নামহীন ঝর্ণা। দাদুর চোখে আজ সেই স্তব্ধ ঝর্ণা। কলকাতা বম্বে দিল্লী এবং সারা দুনিয়ার অন্য বহু বাঘা বাঘা শহরগুলো আজ স্মৃতির ধূপ হয়ে গেছে। সব যেন কোনো ভ্রমণের বইয়ে পড়া শহর।

মন্ত্র শেষ হল। নতুন পুরুতটা আমায় সূর্যপ্রণাম করতে বলল। সামনে আলসের ফাঁক দিয়ে সূর্যকে প্রণাম জানাতে গিয়ে মনে হল দাদুকে প্রণাম জানিয়ে আর বিজয়ার চিঠি দেওয়া হবে না। সেই ছেলেবেলা থেকে দিতাম। দাদু দিদা দু জনকে। তার পর শুধু দাদুকে। তার পর কাউকে না। কাউকে না।

রায় বলল, আজ সরস্বতী পুজো, মনে আছে তো চ্যাটার্জি সায়েব? দুপুরে আমার ওখানে খিচুড়ি। না গেলে কিন্তু মিলি আর কথা বলবে না আপনার সঙ্গে।

চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, আমি দুপুরে তো যাব না।

অবাক চোখে রায় প্রশ্ন করল, তার মানে।

চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, মানেটা খুবই সোজা। তুমি দুপুরে দুটি চালে-ডালে খাইয়ে আমায় বিদায় করে দেবে, সেটি হচ্ছে না। আমি এখনই ফ্রি। এখুনি যদি নিয়ে যাও তো রাজি আছি। পরে হলে আর জানি না।

রায় হাসতে হাসতে বললে, সে আর বলতে। জানেন তো আপনার সঙ্গে আড্ডা দিতে পেলে আমার আর কিচ্ছু চাই না। মিলিও দারুণ খুশি হবে। চলুন।

চ্যাটার্জি সায়েবের গাড়িতে বালিগঞ্জ পৌঁছুতে মাত্র দশ মিনিট। পড়ার ঘরটার মধ্যেই সোফা লাগিয়ে বসবার ঘর। ঘরে পা দিয়েই চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, বাব্বা, এর মধ্যে তুমি সোফার ঢাকাগুলো পালটে ফেললে কবে রায়? কি কাপড় এগুলো? র-সিল্ক না র-কটন্ কি যেন বলে, সেই তো? এখানে এ গুলোর খুব দাম, তাই না? আমেরিকায় এগুলো দিয়েই মেয়েরা এখন স্কার্ট বানায়। জুট ফাইবার থেকে তৈরি। নাম 'স্যাক ড্রেস'। আমরা জাহাজ ভর্তি করে পাট পাঠাই আর ওরা তাই দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে। যাক, ঘরের সব পালটালে, অথচ মিলির সেই আদ্দিকালের একঘেয়ে হাসি-হাসি ছবিটা পালটাতে পারলে না। কি যে ভালো লাগে তোমার বুঝি না। রোজ দেখতে দেখতে হাসিটা কেমন যেন একঘেয়ে লাগে না? কলেজে পড়ার সময় জগুবাজারের কাছে

প্রায় রোজই একটা লোককে দেখতাম সর্বদা দারুণ হাসি-হাসি মুখ। লোকটার নাম দিয়েছিলাম মিস্টার এভারলাফিং। ডাবে জল কম হচ্ছে কেন, মুসাম্বি লেবুতে তেমন রস নেই কেন ইত্যাদি নিয়ে রোজ তার বাজারে ঝগড়া লেগেই আছে। অথচ মজা এই যে রেগে গেলেও ওর মুখটা হাসি-হাসি। দেখলে নিজেরই রাগ ধরে যায়। রাগের অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিল। দেবেন ঘোষ স্ট্রিটের মুখেই একদিন সেই হাসিবাবুর সঙ্গে দেখা। আমার হাতে ছিল বাজারের থলি। তবু উনি জিগেস করলেন, কি, বাজারে নাকি? বেশ একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, জগুবাবুর বাজারে। ভদ্রলোক একটুও না দমে তেমনি ভ্যাবন-হাসি মুখেই উত্তর দিলেন, জগুবাবু নয়, যদুবাবুর বাজার। রোজ বাজারে আসেন অথচ বাড়িটার ওপরে লেখা বিশুদ্ধ নামটা কখনো পড়ে দেখেন নি। আশ্চর্য! আজকালকার ছেলেদের কি যে মতি-গতি...। বলেই তেমনি হাসি-হাসি মুখে ট্রাম লাইন পেরিয়ে ওদিকে চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম একবার পল্টুদাকে দিয়ে রামধোলাই দিয়ে দেখলে হয় লোকটার ঐ হাসির জিওগ্রাফি পালটে যায় কিনা।

চ্যাটার্জি সায়েব থামতেই বললাম, মিলিকে ঠ্যাঙালেও ওর ছবির হাসি-মুখ কিন্তু পালটাবে না চ্যাটার্জি সায়েব।

ঠিক সেই সময়ই মিলি ঘরে ঢুকল ঝড়ের মতো। চ্যাটার্জি সায়েবকে উদ্দেশ্য করে বলল, আরে এই তো বিমলদা এসে গেছেন। আপনার গাড়িটা নিয়ে আমি ছেলেমেয়েদের একটু ঠাকুর দেখিয়ে আনছি; ড্রাইভারকে একটু বলে দিন না বিমলদা। আর দু জনকেই বলে রাখছি, আজ আমার পুজো। মনে থাকবে তো—?

চ্যাটার্জি সায়েব হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন, দেখছ রায়, মিলি আমার ওপরেও কী রকম গিন্নিপনা ফলাচ্ছে। আমায় আর বেশি পুজো শেখাতে হবে না। যদি মায়ের মতো দইকর্মা মেখে খাওয়াতে পারো তা হলে কথা দিতে পারি যে আমরা আজ মোটেই

বয়ে যাব না। আপাতত তুমি স্বচ্ছন্দে ঠাকুর দেখতে যেতে পারো। আমার ড্রাইভার এই লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটিকে বেশ ভালোই চেনে।

মিলির হাসির শব্দটা মিলিয়ে যেতে চ্যাটার্জি সায়েবকে সরাসরি দড়াম করে জিগেস করলাম, আচ্ছা চ্যাটার্জি সায়েব, আপনি কখনো কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছেন ?

একটু অবাক হয়ে চ্যাটার্জি সায়েব উত্তর দিলেন, ইউ মিন প্রেম—লাভ ? আলবাৎ। হাজার বার প্রেম করেছি। সুন্দর মেয়ে দেখলেই তো আমি মনে মনে তাকে প্রেম করি। যারা মনে করে প্রেম জীবনে একবারই আসে, তারা তো সব ডেড-পোর্ট—একেবারে মৃত বন্দর। একটা ব্যস্ত বন্দরে কতবার কত জাহাজ আসবে যাবে তবেই তো বড় বন্দর। সেটাই তো প্রাণ। জানো রায়, তোমায় যে সময়ের কথা বলছি তখন আমরা খিদিরপুরে থাকি। আমাদের পাড়াতেই ছিল পদ্মপুকুরটা। সেখানেই নীতার সঙ্গে ভাব। দিদির একগাদা বড়খুকি ছোটখুকি-মার্কা বন্ধু ছিল—নীতা তাদেরই একজন। নীতা তখন অঙ্কে দু বার গাড্ডা ঝেড়েছে। খুব মন খারাপ। আমিও অঙ্কে মাঝে মাঝে গাড্ডা খেতাম, তবে আমার কখনো মন খারাপ হত না। আমি ভাবতাম অঙ্ক তো বুঝলেই করা যায়। আমি বুঝতে চাই না তাই গাড্ডা মারি। যেদিন অঙ্কে লেটার পাব, সেদিন ধনগোপাল মাস্টারের আমাকে সকলের সামনে হ্যাটা করা বার করে দেব। আমি নীতাকে এ-সবই বলেছিলাম যাতে সমব্যথী পেয়ে ওর মনটা একটু ভেজে। ফল হল উলটো। নীতা রেগেমেগে কি সব ভগবান-টগবান পাপ দেবেন, মাস্টারকে ওসব বলতে নেই ইত্যাদি জ্ঞান দিয়ে, ফ্রকের পেছন ঝেড়ে পুকুরপাড় থেকে উঠে পালিয়ে গেল। ওর ফ্রকের পেছনে তখনো দু-চারটে ঘাস লেগে ছিল। আমার খুব ইচ্ছে করছিল হাতে করে ঝেড়ে দি। ও 'ধ্যাৎ অসভ্য' বলে ছুটে পালাল। আমি কিন্তু তখনো হাল ছাড়ি নি। সেই বয়েসেই আমার মেয়েদের সম্বন্ধে কেমন একটা বেয়াড়া সাইজের কৌতূহল ছিল। খুব প্রেম করতে

ইচ্ছে হত। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের হলুদ আলোয় পদ্মপুকুরের নীলচে জলের ধারে বসে নীতাকে ঠিক কিছুই বলতে পারতাম না গুছিয়ে। পরে নিজের উপর খুব রাগ হত। খানিকটা পুষিয়ে নিতাম নীতাকে ফের অঙ্কের টিপ্‌স দেবার সময়। আশ্চর্যের ব্যাপার, নীতা আমার সব কথা খুব মন দিয়ে শুনত। বলতাম পরীক্ষার সময় কখনো আগে অঙ্ক করতে নেই। প্রশ্ন পেয়েই ওটার উলটো পিঠে জ্যামিতি দিয়ে শুরু করতে হয়। একটি বিরাট সরলের ধাপে ধাপে উঠে শেষকালে যখন দেখবে উত্তর হল দুই পূর্ণ একশো বাহাত্তরের তিনশো তিরিশ, তখনই তো জানলে ডিগবাজি খেয়ে গেছ। সরলের উত্তর সব সময়ই এক দুই তিন জাতীয় কিছু হয়। সুতরাং প্রথম থেকেই মাথা গুলিয়ে ব্যাস্‌…। এইভাবে নীতার সঙ্গে যখন আমার বেশ জমেছে, তখন মা যেন আমাদের সম্বন্ধে কাকে বলেছিল, আহা কি রাজযোটক মিল দু জনের। দু জনেই অঙ্কে লাড্ডু। বিয়ে দিলে দু জনের খুব মনের মিল হবে। কথাটা কানে যেতে মায়ের ওপর রেগে লাল হয়ে গিয়েছিলাম। তবু মায়ের ঐ 'বিয়ে দিলে' কথাটা কেমন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেত। বিকেলে জলের গা থেকে একটা গাঢ় আঁশটে গন্ধ উঠে আসত। আজও মাঝগঙ্গার জাহাজে ডিঙি করে যেতে যেতে সেই ছোটবেলার জলের গন্ধ পাই। উত্তাল গঙ্গা। হাওয়া আর মোমের মতো নরম আলো। জলের রঙটা গেরুয়া। নৌকার গলুইয়ের তলায় গাঢ় গুগ্‌লি-গন্ধটাও ছেলেবেলার। ছোটবেলায় পদ্মপুকুরটাই কি দারুণ বড় লাগত। দেখে দেখে কূল পেতাম না। দক্ষিণপাড়ে একটা ক্লাবঘর ছিল। সেখান থেকে যুবতী নয়, শুধু যুবকরাই জলে ঝাঁপ দিত সাঁতার কাটার জন্যে। প্রত্যেকটা ছেলেকে আমার থেকে কি ভীষণ বড় বড় লাগত। তাদের মস্ত মস্ত লোমশ জোয়ান হাত-পা, প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর, আর কত ছোট্ট আমি। কিছু কিছু বড় মেয়েরাও আসত। তারাও কত বড় আমার চেয়ে। কেউ কেউ শাড়ি বা লম্বা ঝুল ঘটিহাতা

ফ্রক পরত। হাতে তালি দিয়ে দিয়ে ওরা কি সব মেয়েলি খেলা খেলত। অনেক সময় এক্কা-দোক্কা বা নাম পাতাপাতিও খেলত। সবিতাদের চাকরটা একদিন আমায় একটা ছড়া শিখিয়ে দিল। বলল, মেয়েদের বলে দেখো কেমন মজা দেবে। একদিন বসে বসে নাম পাতাপাতি খেলার সময় আমি বেশ চেঁচিয়ে অনেক মেয়েদের মধ্যে ছড়াটা শোনাতে চেয়েছিলাম। আম খেও জাম খেও তেঁতুল খেও না, তেঁতুল খেলে পেট গুলোবে ছেলে হবে না। ছোট মেয়েগুলো খিলখিলিয়ে উঠে এ-ওর মুখ চাওয়াচায়ি করল। ধাড়ি মেয়েগুলো কিন্তু দারুণ গম্ভীর হয়ে আমায় মারবার ভয় দেখাল। আমি ছুটে সোজা বাড়ি। রাত্তিরে একা একা শুয়ে বেশ ভয় করত মার খাওয়ার। তখন শুয়ে-শুয়েই ছুটে কোথাও লুকিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখতাম। তিন-চারদিন পর ফের যেদিন পদ্মপুকুরে গেছি, সেদিন পার্কে তখনো বিশেষ কেউ আসে নি। ক্লাবঘরের পাশে সেই ঢাউস নৌকোটা উপুড করা ছিল। তলায় রঙ উঠে কাঠের গায়ে সবুজ শ্যাওলা ধরে গেছে। হালকা সবুজ সেই শ্যাওলার গায়ে অনেক খাকি রঙের গুগলি লেগে রয়েছে। গুগলি দেখলেই জিভে জল আসে—কালোপিসির কথা মনে পড়ে যায়। সরু সরু আলু পেঁয়াজ দিয়ে কী সুন্দর গুগলির ঝোল রাঁধতে পারতেন। আগে আগে প্রায়ই ভাবতাম পকেটভর্তি গুগলি নিয়ে যাব। পার্কের ও পাশটায় হঠাৎ চোখ পড়তে দেখলাম সেই কালো অশ্বত্থ গাছটার ফাটা ফাটা গুঁড়ির তলায় নীতা স্কিপিং করছে। এই তিন-চারদিন ওর সঙ্গে দেখা না হলেও ওর কথা প্রায়ই মনে হত। ওকে বলার জন্যে তখন মাথা খাটিয়ে অনেক ভালো ভালো প্রেমের কথা ঠিক করেছিলাম। আজ ওকে সব কথা বলতেই হবে। ওকে হাত ধরে গাছতলায় বসালাম। নীতা বললে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভারি বয়েই গেছে। সব্বাই বারণ করে দিয়েছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। তুমি কি সব অসভ্য কথা শিখেছ ওই জন্যে। তোমাকে আজকাল কেউ দু-চক্ষে দেখতে পারে না।

হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে ট্রামের পুলির চিড়িক-মারা বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। প্রথমটায় খুব গুম হয়ে গেলাম। আমি রেগেছি বুঝতে পেরে নীতা বললে, বাব্বাঃ, এতে আবার মুখ হাঁড়ি করার কি হল! ওরা বারণ করলেই যেন শুনছি আমি। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ তোমার সঙ্গে কথা বলব—হয়েছে তো মশাই? অশ্বত্থ গাছের তলায় একতলা দু তলা তিনতলা করে অনেক কালো নুড়ির শিবঠাকুর সাজানো। তাদের মাথায় মাথায় বেগুনি নয়নতারা ফুল। কারা যেন পুজো করেছে। নীতা একটু আদুরে গলায় বলল, শিবপুজো করলে কি হয় জান। শিবের মতো বর হয়। আমি রোজ শিবপুজো করি। আর আমার কি ইচ্ছে করে জান—? আচ্ছা, আগে তোমার ইচ্ছের কথা বল, তার পর আমি বলব।

আমার মাথায় তখন যদিও আর আগুন নেই, কিন্তু মাথার ভেতর থেকে ভালো কথাগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে। নীতার ঘাম-পিটপিটে ফরসা কপাল আর অল্প উঁচু বুকটার দিকে তাকিয়ে মনটা হঠাৎ কেমন ত ত ত ত···তরল হয়ে গেল। আর সেই সময় মুখ থেকে আলটপকা একটা অবান্তর কথা বেরিয়ে গেল, জান নীতা, আমার না আজকাল ভীষণ বাবা হতে ইচ্ছে করে। ছেলেরা বাবা হয় কি করে বল তো? নীতা আর একটি কথাও না বলে কেমন যেন দইবড়া মুখ করে উঠে গেল। নীতার সঙ্গে আর কখনো আমার একলা কথা বলার সুযোগ হয় নি। অথচ আজ কেউ বিশ্বাস করবে না যে, কথাটা আমি একটুও ভেবে বলি নি। আসলে কথাটা আমি বলতেই চাই নি। সেই থেকে নীতার সঙ্গে আমার সব শেষ। আমার প্রথম প্রেম নিবেদন করার চেষ্টা ঐখানেই দফারফা। ক্লাবঘরের পাশে যে একটিমাত্র চালাঘর ছিল, সেখানেই মেয়েগুলো সব শিবুদার কাছে ব্রতচারী নাচ শিখত। শুনেছি সেই শিবুদার সঙ্গেই নীতা একদিন পালিয়েছিল। তা যাক। কিন্তু নীতা আমাকে বাবা হতে শেখালো না কোনোদিন এটাই পরম দুঃখের। কথাটা আবার একবার বুবুকে বলেছিলাম। বুবু জোরসে আমার নাক টিপে

দিয়ে 'বাঁদর' বলেছিল। থাকগে আবার বুবুর কথা। তার চেয়ে বরং বাঁদরের কথাই শোনো।

একটা হাফপচা গ্রীক জাহাজ। একেবারে ধড়-ধড়ে। সারাটি দিন বৈশাখের প্রচণ্ড রোদের আগুনে পুড়ে হাড়ের টুকরো, চামড়া, অভ্র আর চা লোড করেছি। সন্ধের দিকে স্টোয়েজের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে চিফ অফিসারের ঘরে গেছি। লোকটা অল্প কথার মানুষ। বেশ গম্ভীর দেখতে। কিন্তু দারুণ মজার মজার কথা বলতে পারে। আমি যেতেই শুরু করে দিল, বোসো বোসো। এমন বাঁদরের মতো মুখ-চোখ তৈরি করলে কি করে। ঠাণ্ডা বিয়ার খাও। একবার কি হয়েছে জানো। একটা জাহাজে আমরা প্রায় চার-পাঁচশো বাঁদর লোড করেছিলাম। জাহাজ নিয়ে আমরা যখন ঠিক সুয়েজ ক্যানালে ঢুকবো ঠিক তার আগেই কি করে যেন বাঁদরগুলো সব খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে, সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। ভেবে দেখ কী সাংঘাতিক অবস্থা। জাহাজের ডেক, ব্রিজডেক, মাস্তুল আর ডেরিকের তার সব বাঁদরে ছেয়ে গেছে। আর অত উঁচুতে উঠে আমরা যে তাদের ধরবো তার উপায় নেই। এদিক দিয়ে ধরতে চেষ্টা করলে তারা তার বেয়ে অন্য মাস্তুলে পালিয়ে যাচ্ছে একেবারে বিদ্যুৎ-গতিতে। তখন একটিমাত্র পথ খোলা ছিল আমাদের। ডেকের ওপর নানা জায়গায় দড়ির জাল পেতে রাখলাম। আর সেই জালের ওপর খাবার জল এবং খাবার সাজিয়ে আমরা সবাই পালা করে দিনরাত পাহারা দিতে লাগলাম। ওরা তো মানুষেরই মতো। জল অথবা খাবার না খেয়ে কতকাল থাকবে বাছাধনেরা? ফলে একে একে অনেকেই রাত্তিরে নামত। আমরাও তৎক্ষণাৎ তাদের দড়ির জালে আটকে ফেলতাম। কিন্তু তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে এত করেও সব কটাকে আমরা পাকড়াতে পারলাম না। প্রায় শ-খানেক সেই উঁচু টংয়ে বসেই রইল। একফোঁটা জল বা খাবার কিছুই খেল না। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। সুয়েজে ঢোকার কি ভীষণ কড়াকড়ি-

তখন তা নিশ্চয়ই জানো। পারের চারিদিকে হামদোমুখো বন্দুক-ধারীদের ভিড়। সবাই গোমড়ামুখে এমন ভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে যেন আমরা সবাই এক-একটা হিটলারের বাচ্চা। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের জাহাজ ঢুকল সর্বাঙ্গে একপাল জ্যান্ত বাঁদর নিয়ে। এতদিন খিদে তেষ্টা চেপে বাঁদরগুলো ক্ষেপে সবাইকে দাঁত খিঁচচ্ছে আর ভেংচি কাটছে। উঃ সে কি অবস্থা। অবস্থাটা কল্পনা করে আমিও হেসে বাঁচি না। চারিদিকে নীল জলের অসীম সমুদ্রে মোচার খোলার মতো জাহাজটা ভাসছে। আর তাকে ঘিরে কমপক্ষে দশ ডজন বাঁদর দিব্যি মাস্তুলে চেপে বসে আছে। আমি প্রাণ খুলে হাসলাম।

রায় বলল, আমি আর বাঁদরের গল্প শুনতে চাই না। আপনি আপনার গল্প বলুন চ্যাটার্জি সায়েব।

কড়ে আঙুলের পাশে আংটির আঙুল দিয়ে কপালে টিপ দেবার ভঙ্গিতে চ্যাটার্জি সায়েব চশমাটা নাকের ওপর তুলে নিলেন। বাচ্চা ছেলের মতো ফিক করে অল্প একটু হাসলেন। ঠোঁট নাক আর চিবুকটা চ্যাটার্জি সায়েবের একটু বেশি পাতলা, সরু। হাসলে তাই চ্যাটার্জি সায়েবের মুখে সহজেই একটা দুষ্টু দুষ্টু ছেলেমানুষি ভাব ফুটে ওঠে। তেমনি একটুকরো হাসি ছড়িয়ে চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, কি হবে ওসব কাফলাভের কথা শুনে। তা ছাড়া আমার ওসব ঠিক মনেও নেই।

চ্যাটার্জি সায়েব সিগারেট ধরাবার জন্যে পকেট হাতড়াতে থাকেন। একটু যেন বেশি ছটফট করেন। ঘরের চারিদিকে দ্রুত চোখ বোলাতে থাকেন। তার পর নিজেই উঠে গিয়ে রেডিওর পাশ থেকে এ্যাস-ট্রেটা তুলে এনে পাশের টিপয়ে রাখলেন। রায় স্পষ্টই বুঝতে পারে চ্যাটার্জি সায়েব প্রসঙ্গান্তরে যেতে চান। অথচ কথায় কথায় দু জনেই এগোতে এগোতে একেবারে জলের ধারে এসে পড়েছে। এখানে দাঁড়াবার মাটি বড় নরম আর দুর্বল। আর একটু নামলেই ধসে যাবে। প্রতিবারই চ্যাটার্জি সায়েব এখান থেকে

সযত্নে পাশ কাটিয়ে ফিরে যান। অন্য সময় চ্যাটার্জি সায়েবের যা মুড থাকে তাতে জোর করে কিছু বলাও যায় না। আজ কিন্তু তা নয়। ফলে বেশ একটু অবিশ্বাসের সুরে রায় বলে, সত্যিই কি আপনার কিছু মনে পড়ে না চ্যাটার্জি সায়েব? কাউকে না?

চ্যাটার্জি সায়েব একমিনিট রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা পড়ে নেবার চেষ্টা করলেন। তার পর নিজেও খুব হালকা সুরে বললেন, হ্যাঁ অনেককেই মনে পড়ে। দীপা, সবিতা, শীলা, মনীষা ইত্যাদি কত নাম তুমি শুনতে চাও বলো। কিন্তু এ-সবই তো ম্যাটিনি শো-এর টিকিট কেটে, সন্ধে ৬টায় তার কথা মনে পড়ার মতো। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে রায়। সত্যিই দেরি, অনেক অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাল ভোর পাঁচটায় জাহাজটা চলে যাবে। কাজের ঝামেলা মিটছে না কিছুতেই। রাত এগারোটায় তৃতীয় শিফ্‌টের কাজ ঠিকমতো চালু করে ভাবছি আর ঘণ্টাখানেক দেখে সরে পড়ব। বিশেষ কিছু আর করারও নেই। কিছু লোহার পাইপ ছিল পেডের এক কোণে। সেগুলোকে বার করে জাহাজে যে হ্যাচে নেবে তার কাছে আনাতে হবে। সেই জন্যে চাই একটা মোবাইল ক্রেন আর কিছু ট্রেলার। পোর্টের কাছে ওটা কিছুই মহামারী ব্যাপার না। কিন্তু ঠিক দরকারের সময় সেগুলো পাওয়া যেন ধর্মতলায় বসে নেপোলিয়ানের মাথার একগাছা চুল চাওয়ার মতো। আমায় সে রাত্তিরে অবশ্য একটুও বেগ পেতে হয় নি। পোর্টের তরফ থেকে রাত ডিউটিতে ছিল আমারই বন্ধু পরিতোষ রায় চৌধুরী। এক কথায় ঝামেলা মিটে গেল। আমি ফের জাহাজের ডেকে ফিরে এসে এক নম্বর হ্যাচের পাশে জার্মান চিফের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম আর চোখ রাখছিলাম বিষাক্ত গ্যাসের যে সিলিণ্ডারগুলো লোড করা হচ্ছিল তার দিকে। এ রকম অদ্ভুতভাবে সিলিণ্ডার লোড করার কায়দা আগে ঠিক দেখি নি। আমরা চিরদিন ছোট ছেলের মতো লম্বা করে শুইয়ে সিলিণ্ডার লোড করতে অভ্যস্ত। এ লোকটা কিন্তু সিলিণ্ডারগুলোকে ওপর-

মুখো করে সিধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে ডেকের ওপর। রাত যখন বারটা তখন চিফ আমায় বললে চলো এবার একটু পান করে আসি। আমি ঠিক করতে পারছি না এত রাতে আর ওসব শুরু করবো কিনা। শরীর আর বইছে না। এবার বাড়ি ফিরে শুতে পারলে বাঁচি। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সারাদিনের ক্লান্তির পর দু-এক পেগ টানতে পারলে বেশ চাঙ্গা হওয়া যেত। মন থেকে সেই ইচ্ছেটাকে তাড়াবার জন্যে আমি জোর করে কাজের কথা পাড়লাম। জিগেস করলাম এ-ভাবে খাড়া করে সিলিণ্ডার লোড করার মানে কি। চিফ তখুনি আমায় রীতিমতো বোঝাতে শুরু করে দিল যে, গ্যাসটা কি ভয়াবহ রকমের বিষাক্ত। ওগুলোকে শুইয়ে রাখার অনেক বিপদ। সমুদ্রে পড়ে জাহাজ যখন দুলবে, কিংবা ঢেউ এসে প্রবল ঝাপটা দিয়ে যখন ডেক ধুয়ে দেবে, তখন হয়তো ওগুলো রোল করতে পারে। এমন কি গড়াগড়িতে পরস্পরের ধাক্কায় ফেটে যেতে পারে। তখনই হল যাকে বলে রাম ঠ্যালা। দুনিয়ার কেউ তো তখন সে ঠ্যালা সামলাতে আসবে না। কিন্তু সমুদ্দুর অবধি আর যেতে হল না। এক মিনিটের মধ্যে আমার চোখের সামনেই ঘটে গেল সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দড়ির সিলিং ছিঁড়ে একেবারে কংক্রিটের কি লাইনের উপর আছড়ে পড়ল তিনটে সিলিণ্ডার আর সঙ্গে ফেটে গিয়ে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সবাই জানে গ্যাসটা বিষাক্ত। ফলে, মুহূর্তের মধ্যে দিগ্বিদিকশূন্য ভয়ার্ত মানুষের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। আমরাও কী ভাবে যে জাহাজ থেকে নামলাম কিছুই জানি না। শুধু জানি চোখ প্রায় বন্ধ করে ছুটছি ছুটছি ছুটছি। পূর্ব পারের খিদিরপুর ডকের গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। নিশ্বাস যখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল, তখন ভাবতে চেষ্টা করলাম আমার এবার কি করা উচিত। গেট কাছেই। চুপিসারে কেটে পড়া খুব সোজা। আর এই গোলমালে কেউ আমায় দোষও দিতে পারবে না। বলে দিলেই হল যে, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। চিফ

অফিসারের শেষ বিদ্রূপ বাক্যটা মনে পড়ল দুনিয়ার কেউ তো তখন ঠ্যালা সামলাতে আসবে না…। ভাবতেই বিশ্রী লাগল যে, প্রতিটি ভারতীয়কে ঐ একটা শাদা চামড়ার মানুষ ঠাট্টা করবে, যদি এই দারুণ বিপদের সময় একজন অন্তত দায়িত্বশীল মানুষ ঝুঁকি সামলাতে এগিয়ে না আসে। পা-দুটো আপনি আবার জাহাজের দিকে চলতে শুরু করল। গ্যাসের তীব্রতা খোলা হাওয়ায় বেশ খানিক পাতলা হয়ে এসেছে। প্রথমেই পরিতোষের অফিসে যাওয়া দরকার। চারিদিকে অনেক টেলিফোন ছড়াতে হবে। যারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে তাদের জন্যে এম্বুলেন্স, গ্যাস থামাবার জন্যে লম্বা পাইপসহ দমকল, অনেক গ্যাসমুখোশ, এজেন্টকে জানানো ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখলাম আমার আগেই পরিতোষ এ-সব কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। বাঙালী সায়েবের বাড়িতে রাত একটার লগ্নে ফোন বাজছে তো বাজছেই। হয়তো যে ঘরে একলা নিঃসঙ্গ ফোনটা বন্দী আছে, তার থেকে অনেক দূরের কোনো কাঁচবন্ধ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে মহার্ঘ জাপানী কম্বলের উষ্ণতায়, কোনো মধুর স্বপ্ন বানানো হচ্ছে নির্বিঘ্নে। রাতটা তো ঘুমবার জন্যে। এ-সব উটকো ঝামেলা আসে কোত্থেকে। হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের বুদ্ধিতে যা যা করা দরকার তা-ই করলাম। শেডের ভেতরের মানুষগুলোর অবস্থা সত্যিই চোখে দেখা যায় না। এত চকিতে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে কেউ কিছু বোঝবার সময় পেল না। শেডের খোলা দরজাটার সামনেই সিলিণ্ডারগুলো ফেটেছে। আর মাঝরাত বলে শেডের অন্য দরজাগুলো সব বন্ধ ছিল। ফলে যারা ভেতরে কাজ করছিল অথবা ঘুমচ্ছিল তারা ঠিক বেরুবার সুযোগই পেল না। আর সেই বিষাক্ত গ্যাসটিও শেডের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর বেরুবার পথ পেল না। লোকগুলোর কেউ কেউ গলা-কাটা মুরগির মতো মেঝের উপর পড়ে ঝটপট করছে। কেউ কেউ একেবারে অজ্ঞান, চোখের তারা ভেতরে ঢুকে শুধু শাদাটা বেরিয়ে আছে আর ঠোঁটের কস বেয়ে ফ্যানা গ্যাঁজলা উঠছে। এম্বুলেন্স এল সত্যিই অবিশ্বাস্য-

রকম তাড়াতাড়ি। টপাটপ তেঁতুল তোলার মতো লোকগুলোকে স্ট্রেচারে তুলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে হুস করে বেরিয়ে গেল। তার পর এল দমকল। জলের পাইপ দিয়ে ডেকের জল টেনে চারিদিকে জল ছড়ানো চলতে লাগল। নিজের বুকের ভেতরটাও জল চাইছে। নিশ্বাস নিতে জ্বালা করছে সমস্ত শ্বাসনালী। মুখের ভেতরটা ভীষণ তেতো, আর বমি-বমি পাচ্ছে। ঘুমভরা ক্লান্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি ছোটালাম যত জোরে সম্ভব। মাঝরাতের কলকাতা ঠিক তেমনি সুন্দর। উজ্জ্বল তারা-মোড়া নীল বৈশাখী রাত। ঘুমন্ত রেসকোর্স আর কি ঠাণ্ডা হু হু হাওয়া। বিশুদ্ধ হাওয়াটা যে কি ব্যাপার তা এমনি সময়ে বোঝা যায়। বিষাক্ত গ্যাস ভেতরে ঢুকে বুক জ্বলেছে, চোখ জ্বলেছে। এমন কি জোরে নিশ্বাস নিতেও ভয়। যদি বেশি গ্যাস ভিতরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। তার পরেই রেসকোর্সের বুকভরা এই পরিষ্কার ঠাণ্ডা বিরাট হাওয়ার সমুদ্রে ভাসা। সারারাত শ্মশান ঠেঙিয়ে ভোর রাতে গঙ্গায় ডুব দেওয়ার মতো। তিনু কাকাকে পোড়াতে গিয়ে কিংবা শিবুর জ্যাঠামশাইকে চিতায় শুইয়ে সারারাত প্রায় শ্মশানে কেটেছে। কাঁচা-কাঠের ধোঁয়ায় বহুক্ষণ কাটিয়ে তার পর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ-মুখ ধোয়ার মতো দারুণ আরামের হাওয়া আসছে মাঠ থেকে। নিজের সারা গায়ে মানুষ-পোড়া গন্ধ। স্নায়ুগুলো অবশ। মনে হচ্ছিল সুইচ অফ করে, গিয়ার নিউট্রাল করে, চুপ করে স্টিয়ারিংয়ে বসে থাকি। গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে যতদূর যায় যাক। তার পর থেমে গেলে দরজা খুলে নেমে পড়ব। সারারাত শুয়ে থাকব ভিক্টোরিয়ার 'রেনট্রি'গুলোর যে-কোনো একটার তলায় আর আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির অসংখ্য জানলার মতো শরীরের প্রতিটি রোমকূপ খুলে সারা জীবন শুধু পরিষ্কার হাওয়া টানব আর ঘুমবো। ছোটবেলায় খিদিরপুরের স্কুলের জামগাছতলায় এমনি একা একা একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বুবু গেটের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গিয়েছিল।

বুবুটা কে চ্যাটার্জি সায়েব? এতক্ষণ পরে কথা বলার সুযোগ পেয়ে রায় একেবারে ছোট ছেলের মতো সোজা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

ওটা একটা মেয়ের নাম। আমার সেই পুরনো সিগারেট কেসের ওপরে যার নাম দেখেছ—সে-ই।

রায় তবুও জিজ্ঞাসু চোখে বলে, কিন্তু ওটা তো 'পি' লেখা। বুবু হলে তো 'বি' হবে—তাই না?

চ্যাটার্জি সায়েব হেসে বললেন, আমি বুবুকে 'পেত্নী' বলতাম। সেসব অনেক কালের কথা। বাদ দাও।

নাছোড়বান্দা রায়কে কিছুতেই ঠেকানো গেল না। বিশেষত প্রেমের গন্ধ পেলে কেই বা ছেড়ে দেয়। ফলে চ্যাটার্জি সায়েবকে শুরু করতেই হল।

খিদিরপুরের মনসাতলায় ঢুকেই যে লাল রঙের দোতলা বাড়িটা চোখে পড়ে, সেটাই ছিল আমাদের 'বাণীমন্দির' স্কুল। স্কুলের পশ্চিম দিকের পাঁচিলের গায়েই ছিল বুবুদের বাড়ি। ওর দাদা অলক আমাদের স্কুলে আমার এক ক্লাশ নিচে পড়ত। বয়েসের তুলনায় অলকটা একটু বেশি এঁচোড়ে পাকা ধরনের। সব সময় একটা বড়লোকি চাল মেরে বেড়াতে ওর এতটুকুও লজ্জা করত না। আর কেমন একটা বড় বড় ভাব দেখাবার চেষ্টা। ক্লাস সিক্স থেকে টেস্ট পেপার আর লম্বা চেনওলা চাবির রিং হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা অলকের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। একদম নিজস্ব চাবিওলা কোনো সম্পত্তির কথা আমরা তখন ঠিক ভাবতেই পারতাম না। ওদের বসবার ঘরে চার-পাঁচটা কালো পালিশ করা উঁচু উঁচু কাঁচের পাল্লা-দেওয়া আলমারিতে বই থাকত। প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট জার্মান মাস্টার লক্ লটকানো। তার চাবি অলকের কাছেই থাকত। মাঝে মাঝে অলকের সঙ্গে যখন ওদের লাইব্রেরি থেকে বই নিতে যেতাম, দেখতাম আলমারিগুলোর কাছে বুবু সমানে ঘুরঘুর করছে। আমায় একা পেয়ে একদিন বললে, গ্যাখো না বিমলদা,

আমি কি কচি খুকি যে বই ছিঁড়ে ফেলব। দাদা আমাকে কক্ষনো এখান থেকে বই নিতে দেয় না।

আমি এক পলক বুবুর দিকে তাকালাম। সত্যিই বুবু আর কচি খুকি নেই। শাড়ি পরে। একটা লাল-কালো ডুরে শাড়ি পরে আছে। বুকে আর পাছায় মাঝারি ঢেউ দেখে বেশ বোঝা যায় জোয়ার আসার দেরি নেই। আমার চোখের তলায় ও লজ্জা পেল। মুখটা নিচু করল। আমি সহজভাবে বললাম, ঠিক আছে, অলক না দিক। আমি যখন বই নেব একখানা করে তোমার জন্যেও নেব। মলাট দিয়ে পড়বে আর আমি যখন স্কুল ছুটির পর বাড়ি যাব, তখন ফেরত দিও আমাকে, কেমন?

বুবু ঘাড় নাড়ল। জিগেস করলাম আজ কোনো বই চাই কিনা। বুবু বলল ও নিজেই জানে না কি বই নেবে। আমাকেই অনুরোধ করল একটা বই বেছে দেবার। আমার আজও মনে আছে বুবুকে আমি প্রথম বই দিয়েছিলাম বিভূতি মুখুজ্যের 'নীলাঙ্গুরীয়'। এইভাবে বই দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটা বড় বিপদ-জনক। বেমালুম ভাবে কত অঘটন যে ঘটে যায় ঐ চোরা পথে। আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হল না। বই নিতে নিতে বুবু যে-কোনো সময় আমায় কি দিয়ে ফেলেছিল, তা আমি নিজেও ঠিক বুঝি নি। স্কুলে ঢোকার সময় ওদের বাড়ির জানলায় মুখ তুললেই দেখতে পেতাম বুবুকে। একমাথা কটা চুল নিয়ে ঝাঁকড়া-বুড়ি হয়ে বসে আছে। স্কুলে আমাদের খেলার মাঠে দুটি মাত্র বড় গাছ ছিল। একটা কদম গাছ। আর একটা জাম গাছ। আষাঢ় মাসে গাছের নিচে কত জাম পড়ত। মোটেই মিষ্টি বা বড় না। ছোট ছোট কষা বিচিসর্বস্ব। তাতেও রেহাই নেই। নিজে তো খেতামই, আবার পকেটে পুরে নিয়ে আসতাম বুবুর জন্যে। শাদা শার্টের পকেটে কপিং পেন্সিলের মতো বেগুনি ছোপ লাগত। অর্ধেকদিনই বুবুকে সেগুলো দেবার সুযোগ পেতাম না। সঙ্গে অন্য ছেলেরা থাকত। আর কদম ফুল দেবার ব্যাপারটা তখনো আমার ঠিক মাথায়

আসে নি। তখন শুধু 'কদমছাঁট' আর 'কদমতলায় কে' পর্যন্ত আমার বিদ্যে। ফলে বাদল দিনের কদম ফুলের কথা জানতাম না। তবে গেটের পাশেই তাজা গন্ধরাজ ছিঁড়ে মাঝে মাঝে ওপরের জানলায় ছুঁড়ে দিতাম। বুবু বসবার ঘরেই একটা কাঁচের ডিসে ওগুলো রেখে দিত। গ্রীষ্মের দুপুরে বন্ধ অন্ধকার ঘরে শাদা শাদা গন্ধরাজগুলো ধূপের মতো স্নিগ্ধ গন্ধে ঘর ভরিয়ে রাখত। বেশ মনে আছে, ঐ ঘরেই আমি বুবুকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম। বুবুর কথা সেই জন্যে চিরদিনই আমার কাছে শাদা গন্ধরাজের স্মৃতি হয়ে আছে। আমার হাতে একবার একটা চিঠি দিয়েছিল লুকিয়ে। তাতে লেখা ছিল আমার নিশ্চয়ই চোখ নেই। থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম…। সে চিঠি পাবার পর অনেকদিন রাত্তিরে আমার ঘুম আসে নি। তাতে অভিযোগ ছিল 'দাদা যখন থাকে না' তখন যাই না কেন। হায় রে! তখন খামোকা যাই কি করে। কাকে ডাকতে কে বেরিয়ে আসবে, তখন বলবটা কি? তবে ওর ইঙ্গিতটা আমার খুব মনে ছিল। বিকেলে একদিন স্কুল ছুটির পর অনেকক্ষণ মাঠে বসে ছিলাম। ক্লাশ থ্রি্র বঙ্কিমকে আর গোপীকে 'হেড অফিসের বড়বাবু' কবিতাটা অঙ্গভঙ্গিসহ মুখস্থ করার তালিম দিচ্ছিলাম। সাতদিন পরে পুরস্কার বিতরণের উৎসব। যখন স্কুল থেকে বেরুচ্ছি, তখন একদম লাল বিকেল। সারা স্কুল ফাঁকা শুধু আমরা ক-জন ছাড়া। গেটের পাশেই দেখি একটা আইসক্রিমওলাকে ঘিরে আরো দু-তিনটে বাচ্চার সঙ্গে বুবুও দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে জিগেস করল, কি ব্যাপার, এত দেরিতে বাড়ি যাচ্ছ যে?

বঙ্কিম গোপী বুবু ওদের সকলকে একটা করে আইসক্রিম দিলাম। তখন দু-পয়সায় নেবু রঙের কাঠি-আইসক্রিম পাওয়া যেত। চুষতে চুষতে ঠোঁট-জিভ লাল, আর কাঠির গায়ে শাদা বরফ বেরিয়ে পড়ত। হঠাৎ আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। বুবুর কথার উত্তরে বললাম, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি না মোটেই। তোমাদের বাড়িই যাচ্ছিলাম একটা বই ফেরত দিতে।

ওর মুখটা হঠাৎ একটু লাল হল। হাতের আইসক্রিমের রঙটা যেন সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই চলে যেতে আমি বললাম, চলো। বুবু ঠোঁটটা দাঁতে চেপে একটু মুচকি হেসে বলল, দাদা নেই কিন্তু। তোমার আবার একা একা ভয় করবে না তো?

আমি বললাম, আমার একা ভয় করে না। তবে কাছে পেত্নী থাকলে ভয় করে।

বাড়িতে সত্যিই অলক ছিল না। স্কুলের পরেই কোথায় ম্যাচ খেলতে গেছে। স্পষ্ট জিগেস করলাম এখন ওর বাবা বা অন্য কারুর ফেরার সময় কিনা। বুবু শুধু ঠোঁট ওলটাল। আমি বাইরের দিকের দরজাটায় খিল তুলে দিলাম। বাড়ির ভেতরের দরজার একটা পাল্লা বইয়ের আলমারির লাগোয়া। সেটাকে ভেজিয়ে দিতে বেশ একটা নিরাপদ কোণ তৈরি হল। বুবু শুধু ভয়ে ভয়ে আমার বইগুলোর পাতা ওলটাচ্ছিল। তার পর ফিসফিস করে বলল,

এই, না…কেউ যদি এসে পড়ে…যদি দাদা…।

আমি বললাম, ধ্যুৎ বাইরে থেকে কেউ দরজা ঠেললে, তুমি ভেতরে পালাবে। আমি শান্তশিষ্ট ছেলের মতো দরজা খুলে দেব। ভাব দেখাব যেন অলকের জন্যে অপেক্ষা করছি।

বুবু মাথা নিচু করে বলল, বেশ, এক মিনিট কিন্তু। তার বেশি হলেই আমি চ্যাঁচাবো।

প্রথমে এত জোরে বুবুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম যে ও নাক কুঁচকে বিড়বিড় করে বলল, উঃ লাগে না বুঝি আমার। ও যত জোরে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে আমি তত চেপে ধরছি। পুট করে একটা কাঁচের চুড়ি ভাঙার শব্দ।

ভাঙলে তো।

ইস, ভারি তো একটা কাঁচের চুড়ি।

তার পরেই বেশি টান পড়ে পিঠের একটা টিপকল খুলে যাওয়ার চাপ 'পুট'।

ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরোটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এঃ কি বাজে ঠাণ্ডা আইসক্রিমের মতো ঠোঁট। চুমু না হাতি। ধ্যাৎতেরিকা, আমার ঠোঁটেও নেবু আইসক্রিমের রঙ লেগে গেল কিনা কে জানে। ঠিক একটা পেত্নীর ঠোঁট।

ইস, অসভ্য কোথাকার। আর কোনোদিন চেও, তখন ছাখাবো মজা। তরমুজের শরবত খেয়ে যাবে, পালিও না। একছুটে ওপরের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল বুবু। খানিক পরে হাতে একগ্লাশ টকটকে লাল তরমুজের শরবত নিয়ে ফিরে এল।

নিন মশাই খেয়ে নিন। মা ডাকবে এখুনি।

আমার তখন শরবত খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। বুবুর ঠোঁটের স্বাদ তখনো আমার ঠোঁটে লেগে আছে। বাচ্চা ছেলের মতো ভয় করছে কিছু খেলে যদি স্বাদটা ধুয়ে যায়। মনে মনে ভাবছিলাম মুখ ধোব না অনেকদিন। বুবু কিন্তু নাছোড়াবান্দা। শরবত খেতেই হবে আমায়। অগত্যা বললাম, তুমি আগে একটু খেয়ে দাও। না হলে খাব না।

বুবু বলল, মাগোঃ এঁটো খেতে লজ্জা করে না ?

খানিকটা খেয়ে গেলাসটা আমার হাতে দিল। আমি এক চুমুকে শেষ করে বললাম, মানুষের এঁটো বিশ্রী। পেত্নীর এঁটো খেতে আমার দারুণ ভালো লাগে।

আমাদের টেস্ট পরীক্ষার পর বহুকাল আর বুবুর সঙ্গে দেখা হয় নি। কখনো-সখনো স্কুলে যেতাম। সময়ের ঠিক ছিল না বলে বুবুকেও জানলায় আর দেখতাম না। ওদের অন্ধকার জানলাটা শুধু বুবুর কালো চোখের মতো আমার দিকে চেয়ে থাকত। সে সময়টা আমার খুব খারাপ চলছে। পরীক্ষার ভয় তো ছিলই। তার ওপর বাবা প্রায়ই চাকরির কথা শোনাতেন। অর্থাৎ, লেখা-পড়ার এখানেই ইতি টানতে হবে। আমার সঙ্গে ঐ নিয়ে রোজই খিটিমিটি বাধত। এ-সব ঝামেলা থেকে সরে পড়ার তালে আমি তাই ছ মাস মাসিমার কাছে বাঁকুড়ায় চলে গিয়েছিলাম। পরীক্ষার পরে

একদিন স্কুলে গেলাম মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকদিন পরে গেটের পাশে সেই শাদা গন্ধরাজের গন্ধ পেয়ে বুবুর জন্যে বড় মন কেমন করল। ফেরার সময় পথেই অলকের সঙ্গে দেখা। শুনলাম গত মাসে অসিতদার সঙ্গে বুবুর বিয়ে হয়ে গেছে। অলক নিজে আমায় নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তখন বাঁকুড়ায়। এর পর আর অলকের একটি কথাও শুনতে পাই নি আমি। মনে হল আমি সত্যিকার হ্যামলেটের কাকা এবং আমার কানের মধ্যে কে যেন গরম সিসে ঢেলে দিয়েছে। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না আমি। হঠাৎ, পাখির ডাক, রাস্তার মানুষের গোলমাল, গাড়ির চীৎকার—সব ঠাণ্ডা। কোনো হুল্লোড়-মার্কা গানের মাঝখানে আচমকা রেডিওর সুইচ অফ্ করে দেওয়ার মতো।

॥ ৪ ॥

ইস্টিশানের মিষ্টি ফুল

একটু থেমে চ্যাটার্জি সায়েব যখন ফের আর এক কাপ চা ঢালতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই মিলিরা এসে পড়ল। ঘরে পা দিয়েই মিলি চেঁচিয়ে উঠল, না, না, আর চা নয় বিমলদা। এবার খাবার ঠিক করব। তুমি কি গো, এতক্ষণ বিমলদাকে স্নানটা করে নিতে বল নি। ইস কত বেলা হয়ে গেল। অথচ বাথরুমে আমি নতুন তোয়ালে সাবান সব রেখে গেলাম—।

চ্যাটার্জি সায়েব ব্যস্ত হয়ে বললেন, আমি তো স্নান করেই বেরিয়েছি মিলি। আমার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। তার আগে তুমি নিজে ঐ বাসন্তী শাড়িটা ছেড়ে এসো দিকি। ও রঙটা আমার মোটে সয় না।

মিলি চ্যাটার্জি সায়েবের কাছে এগিয়ে এসে ভুরু কুঁচকে বিস্ময়ের ভান করে বলল, কেন, রঙটা কি দোষ করল শুনি। আগে বলুন কেন, তার পর শাড়ি পালটাব। না বললে শাড়ি ছাড়ব না ঘেঁচু।

চ্যাটার্জি সায়েব হাসতে হাসতে বললেন, ঐ হলুদ রঙটায় আমার বড় চোখ জ্বালা করে।

মিলি বলল, বারে, শুধুমুধু আপনার চোখ জ্বালাই বা করবে কেন। খিদিরপুরে ছোটবেলায় আমরা সকলে লালপাড় বাসন্তী শাড়ি পরে পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী-ঠাকুর দেখতে বেরুতাম। মুন্না, পরী, আমি, তিতি আরো কত মেয়ে। নাম ভুলে গেছি। আজকাল বড্ড সব ভুলে যাই। আচ্ছা বিমলদা, সত্যি করে বলুন, আমি কি বুড়ি হয়ে যাচ্ছি। চ্যাটার্জি সায়েব বুড়ো আঙুলের টুসকি দিয়ে শার্টের বুকের ছোট্ট টাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, কে বললে তোমায় বুড়ি হয়ে যাচ্ছ। একটুও না। তবে হ্যাঁ, তোমার বরকে তোমার পাশে খুব খোকা খোকা লাগে।

মিলি চ্যাটার্জি সায়েবের হাতে এক চিমটি কেটে বলল, ইস্‌ বললেই হল। সেবার পুরীর হোটেলওলা কি বলেছিল জিগেস করুন না ওকে। আমাকে নাকি ওর মেয়ের মতো দেখতে। শুনে লজ্জায় মরি।

চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, তা না হয় হল। কিন্তু তুমি বুবুকে চিনলে কি করে? মনে আছে বুবুকে তোমার?

মিলি বলল, বারে, আমার সঙ্গে তো প্রায়ই বাজারে দেখা হয়।

চ্যাটার্জি সায়েব অন্যমনস্ক ভাবে জুড়ে দিলেন, ও হ্যাঁ, বুবু তো এখন তোমাদের পাড়ার লোক।

মিলি তার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলল, জানেন বিমলদা, বুবুদিই জোর করে আমায় বাসন্তী শাড়ি পরা শেখাল। তার আগে সরস্বতী পুজোর সকালে আমি এমনি লাল-পাড় শাড়ি পরতাম। সবাই তো আর বুবুদির মতো সুন্দর নয় যে যা পরব তা-ই মানাবে। কি দারুণ কোমর না বুবুদির! এত সরু কোমর আপনি একটাও পাবেন না। এ মা, দেখছেন আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে সব দেরি হয়ে গেল। খিচুড়িটা গরম করেই আমি ডাকছি।

মিলি যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। রায় আর চ্যাটার্জি সায়েব খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে বসে রইলেন। রায়ই প্রথম শুরু করল, কিন্তু আপনার চোখ জ্বালার ব্যাপারটা যে পুরো শোনা হল না চ্যাটার্জি সায়েব। এখন দেরি করলে মিলি মেরে ফেলবে। বিকেলে কিন্তু বলতেই হবে।

চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, রাজি আছি, যদি নিদেনপক্ষে একটা জিন পাওয়া যায়। নেবুর গোল টুকরো ভাসিয়ে ঠাণ্ডা জিনের গেলাস নিয়ে ওরা যখন ফের আড্ডায় বসল, কলকাতায় তখন খোকন-হাসি-বসন্তের বিকেল। প্রথম দখিনে হাওয়া শুরু হয়েছে। হাওয়ার জানলায় অনেক লাউডস্পিকারে মিক্স্‌ট ফ্রায়েড রাইসের মতো অসংখ্য হিন্দি বাংলা ইংরিজি গানের মিশ্রিত শব্দ বেরুচ্ছে। জানলার দিকে তাকিয়ে কতকটা আপন মনেই চ্যাটার্জি সায়েব

বিড়বিড় করলেন, এই খিচুড়ি-সঙ্গীতে যাদের কান ঝালাপালা, তারা চলে যাক হিটলারের আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কারে। সেখানে কোনো সাড়া-শব্দ পাবে না। আসলে মাঝে মাঝে এক-আধদিন এই রকম বেপরোয়া হৈ চৈ আমার বেশ ভালোই লাগে। বিশেষত সরস্বতী পুজোর কলকাতার বেশ একটা নিজস্ব চেহারা আছে, প্রাণ আছে। এই জন্যেই তো কলকাতা কলকাতাই—দিল্লী বম্বে ম্যাড্রাস নয়। যাক, বাদ দাও। তুমি যা শুনতে চাইছিলে সেটাই শুরু করা যাক। যা ভাবছ তা নয় কিন্তু। বুবুর বাসন্তী শাড়ির স্মৃতিতে আমার চোখ জ্বালা করে না। যদিও স্বীকার করছি বাসন্তী শাড়ি পরে আজও যদি বুবু আমার সামনে হাজির হয়, আমি হয়তো মাথার ঠিক রাখতে পারব না। কিন্তু তবু বলি রায়, প্রেমের স্মৃতির থেকে আরো অনেক বাস্তব আমার এই ডক জীবন। এখানে গমের গরম ধুলো, হলুদ সালফার আর সিমেন্টের ধুলো—দম আটকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বাসন্তী রঙটাও আমায় তেমনি একটা গন্ধকের দমবন্ধ স্মৃতি এনে দেয়। চোখ আপনিই জ্বলতে শুরু করে। কিং জর্জ ডক ছাড়িয়ে সুন্দর রূপালী জাপানী ক্রেনওলা একটা বার্থে জাহাজটা ছিল। ডকের প্রায় শেষ সীমায় বলে মোটরে যাওয়া আসাতেও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় চলে যায়। জাহাজ যাবার জন্যে ব্রিজ খোলা থাকলে অথবা রাস্তার ওপর দিয়ে কোথাও ওয়াগন পাস করলে তো কথাই নেই। সাতসকালে গিয়ে জাহাজে উঠতে হয়। গন্ধক বা গম একেবারে জাহাজের মধ্যে ঢেলে নিয়ে আসে। বড় বড় চামচ হৈ হৈ করে থলি ভর্তি চলেছে আর হাওয়ায় হাওয়ায় হলুদ গন্ধকের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে সারা জাহাজে। জাহাজের ভেতরে কেবিনগুলো অবশ্য সবই শীততাপনিয়ন্ত্রিত, রঙিন কার্পেট আর সুন্দর কাঠের প্যানেল করে সাজানো। মস্ত তিন-তারা হোটেলের মতো বার, লাউঞ্জ, ডাইনিং রুম সব আলাদা আলাদা। সুন্দর করে সাজানো। ডাচ জাহাজ। রটারডাম্ এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তিনটি পোর্টের একটি। বিচিত্র জাহাজের আনাগোনা

আর বিপুল ব্যস্ততা সেখানে। ও বন্দরে জাহাজ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যাবার বাঁশি বাজে। এই রকম সব তিন-চার হাজার টন গন্ধক ভরার জন্যে একটা জাহাজকে পুরো একদিনও পোর্টে রাখা হয় না। শুধু পালাই-পালাই ভাব। আমাদের এখানেও ব্যস্ততা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের।

নিজের হাতে কোনোদিন অনেক পেঁয়াজ কেটে দেখেছ রায়? গন্ধকের গুঁড়োয় তার দশগুণ বেশি চোখ জ্বলে। যত বেলা বাড়ে, চুল মাথা ভুরু গোঁফ সব ধীরে ধীরে হলদে গুঁড়োয় হলুদ হয়ে আসে। আর ক্রমাগত জল কেটে চোখ তো একেবারে কর্মচা। শাদা বিদেশী টুইলের হাফশার্ট আর শাদা শর্টস্ পরে চিফ অফিসার ভ্যানলেনেফ বেরিয়ে এল ডেকে। মৃদু হেসে আমায় ঠাট্টা করে বলল, ব্যাপার কি, কেঁদে কেঁদে তো ডেক ভাসিয়ে দিলে। এবার বরং ভেতরে বসে একটু কফি খাবে চলো। অথবা একটা ঠাণ্ডা অ্যাম্‌স্টেল বিয়ার? তোমার যা খুশি। ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, এখন যাওয়া একটু মুশকিল। চোখ না রাখলেই এরা যা-তা করবে। কোমিংয়ের ভেতরে দু মানুষ উঁচু মাল ছেড়ে রেখে শুধু সামনে থেকে ভরাই করে পালাবে। সুতরাং এখন বুঝতেই পারছ, এতটুকু চোখ ফেরাবার তো নেই।

চিফ তবু কৌতুক করতে ছাড়ল না, আরে তোমার চোখ থাকলে তো ফেরাবে। এখন তোমার চোখ বলতে তো শুধু হাউমাউ করে কেঁদে ভাসানোর দুটি গর্ত।

ওর বলার ধরনে সত্যিই হাসি পেয়ে গেল। বললাম, কান্না ছাড়া আর গতি কি বল। এখন দেখছ এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছি, আবার এখান থেকে সরে গেলে যখন কাজের দফারফা হবে তখন তুমিই আমার ওপর চিল্লাবে আর আমায় স্রেফ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদুনি গাইতে হবে। সুতরাং…

সুতরাং খুব হাড়ে হাড়ে বুঝছি যে তোমাদের জাতের আরো দু-পাঁচশো বছর এমনি চোখের জল ফেলতে হবে অথচ মাত্র এককাপ

জলে এক চামচ কফি ভিজিয়ে খাওয়ার সময় পাবে না কোনোদিন, তাই না? এ-সব লোকগুলো কি টাকাপয়সা পায় না, তা হলে কেন তারা নিজেদের কাজ নিজেরা যত্ন করে করবে না? Why for each and every work you have to keep a watch-dog?

উত্তরে বললাম, উঃ, তোমার এই কেন-র ঠ্যালায় প্রাণ গেল! তার চেয়ে বরং তোমার ঘরেই খানিক বসে আসি চল। এখুনি তো 'মিল-আওয়ারে'র জন্যে এমনিতেই কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং আর আমার কোনো আপত্তি নেই। চিফ অফিসারের ক্যাবিনে ঢোকার আগে বেশ করে হাত-মুখ রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নিলাম। আমার জুতোটার রঙ কালো ছিল। এখন বেশ একটা সালফার রঙের বরকর্তার পাম-স্যু হয়ে গেছে। জুতোটা ভালো করে পাপোশে মুছেও ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিলাম। ভ্যানলেনেফ অভয় দিয়ে বলল, কুচ পরোয়া নেই, চলে এসো। আমার ঘর কিছুতেই নোংরা হবার নয়। রোজ সকালে মস্ত ইলেকট্রিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কার্পেটের প্রতিটি রোমকূপ থেকে টেনে ধুলো বের করে নেওয়া হয়। আর তার সঙ্গে ঘরের সব কিছু ঝাড়াঝাড়ি তো চলেই। সুতরাং স্বয়ং নেপোলিয়নের মতো তুমি ঢুকে আসতে পার, কোনো ভয় নেই। আমি তবু একটু মাথা চুলকে বললাম, কিন্তু কোনো ছিঁচ-কাঁদুনে নেপোলিয়নের সঙ্গ কি তোমার ভালো লাগবে? তার আগে তোমার বেসিনে আমাকে যদি একটা ওয়াস নেবার অনুমতি দাও তো বাধিত হবো। সত্যি ভীষণ চোখ জ্বলছে। ভালো করে না ধুলে কিছুতে জ্বলুনি যাবে না।

চিফ বলল, ওঃ, এই কথা। তুমি স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকে যেতে পার। ওপরের র‍্যাকে সাবান আছে। বাঁ দিকের তোয়ালেটা বিলকুল ফরসা।

স্নিগ্ধ পদ্মগন্ধী বিদেশী এলিডা সাবানে চোখ-মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে বসলাম। রটারডামের সেই বিখ্যাত 'রাইজিং-হোপ' মার্কা কালচে-নীল টোব্যাকোর প্যাকেটটা টেবিলের ওপরেই পড়ে ছিল। তুলে

নিয়ে তার থেকে একটা মোটকা রোল পাকালাম বিনা বাক্যব্যয়ে। চিফ আমার কাপে কপি ঢালছিল নীরবে। হঠাৎ মাথার ওপর ফুরফুর শব্দে চোখ তুলে দেখলাম একঝাঁক ছোট ছোট রঙিন লাভ-বার্ড জাতীয় পাখি ঢুকে এল খোলা দরজা দিয়ে। আমি বিস্মিত চোখে জিগেস করলাম, এ গুলো আবার কোত্থেকে আমদানি করলে? তোমার ক্যাবিন তো আটকাঠ বন্ধ, ঠাণ্ডা ঘর। এখানে আবার বার-দুনিয়ায় চিড়িয়া ঢোকে কি করে?

চিফ হেসে বলল, আরে না না, ওগুলো মোটেই বাইরের পাখি না। আমারই পাখি। আমি যতক্ষণ ঘরে থাকি, ওদের ছেড়ে দি। ওরা করিডোরগুলোয় দিব্যি উড়ে বেড়ায়। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ডেকে যাওয়ার সময় করিডোরে দাঁড়িয়ে শিস দিলেই ওরা ফের ক্যাবিনে ঢুকে আসে। তখন আমি দরজা টেনে দিয়ে ডেকে বেরিয়ে যাই। খাঁচায় বন্ধ পাখি আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। তোমার নিজের খেয়াল-খুশি অথবা শখের জন্যে তুমি ওদের খাঁচায় আটকে রাখবে, এতটুকু মুক্তি দেবে না, সেটা কি ভালো। পুরো মুক্তি যদি নাও দিতে পার, অন্তত খানিকটা ডানা মেলার সুযোগ করে দাও, তুমি কি বল?

বললাম, হ্যাঁ, সেটা ভালোই বলেছ। কিন্তু একটা কথা বুঝছি না যে একবার ডানা মেলার সুযোগ পেলে তারা নিশ্চয়ই আরো বড় আকাশ চাইবে। যাকে বলে অসীম মুক্তি—তাই না? আবার তারা বন্দী হতে আসবে কোন্ দুঃখে?

চিফ নিজের মসৃণ গালে দু বার আলতো করে হাত বোলায়। ওর মুখটা বেশ ভরপুর, মোটাসোটা। গাল বেশ গাবদা। তবে কপালটা উঁচু আর নাকটা রোগা বলে ওকে ঠিক ঢ্যাপসা দেখায় না। বরং মুখে এমন একটা প্রশান্তি আছে যে দেখলে একটু বেশি বয়স্ক মনে হয়। যতই জোড়া থুতনির ভারে ওকে ধীর-স্থির বুড়ো মানুষটি মনে হোক, আসলে বয়েস কিন্তু ওর খুব বেশি না।

চিফ চিন্তিত সুরে বললে, হায় ভগবান, তোমার দেশে নেই যে

কিছু। তোমায় বোঝাই কি করে। একটা গোটা নির্ভেজাল মুক্তি কেউই চায় না। সুখ ভালোবাসা ক্ষমতা টাকা নাম বা কাম ইত্যাদি নানা বাক্সে নানাজন আজীবন বন্দী থাকতেই বেশি ভালোবাসে। পাখিরাও তাই। ছেড়ে দিলেই পালিয়ে যাবে এ ধারণাটা মারাত্মক ভুল। নিজের জীবনে সংসারে মানুষ বার বার এই ভুলটা করে বলেই ঘরে ঘরে যত অশান্তি। যাক গে। বড় লম্বা লম্বা কথা বলে ফেলছি। তোমার বিরক্তি লাগবে। তার চেয়ে পাখির কথাই শোনো।

আমাদের দেশে একটা বিরাট পাখির পার্ক আছে। সেখানে অনেক উঁচু উঁচু গাছে কত যে রঙ-বেরঙের ঝাঁক ঝাঁক পাখি ছাড়া আছে তার ইয়ত্তা নেই। ঠিক ঠিক সময়ে তারা ভালোরকম খাবার পায়, জল পায়, আর ওড়বার জন্যে সারা পার্কের আকাশ তো পড়েই আছে। ফলে তারা কখনো পার্ক ছেড়ে অন্য কোথাও পালায় না। তুমি তোমার বাড়িঘর সব ছেড়ে কি হঠাৎ মুক্তির জন্যে ফাঁকা মাঠে বা বনে-জঙ্গলে ছুটে পালাবে? আসলে মুক্তি-ফুক্তি ওসব ফাঁকা বুলি। তুমি যত বড় 'বস' বা দণ্ডমুণ্ডের মালিক হও, এটুকু জানবে যে, একটা লোকের কাছ থেকে তুমি যতটা কাজ পাবে, তার দু গুণ কাজ পেতে পারো যদি তাকে একটু নিজের মতো করে ডানা মেলতে দাও। আমি যখন ছুটিতে দেশে যাই, তখন আমায় প্রায়ই তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে হয়। অফিসের দরকারি চিঠি, কাজের হিশেব, নানা পোর্টে জাহাজ-মালিকের পক্ষে জাহাজের যত কাজ করিয়েছি তার হিশেব। বিভিন্ন বন্দরে নানা ড্যামেজ ক্লেম ইত্যাদি হাজার লেখালিখির কাজ। এ-সব কাজ আমার বাড়ি বসে করতে একটুও ভালো লাগে না। ফাইল, টাইপ মেশিন নিয়ে আমি গাড়িতে উঠি। বউ আমায় পার্কে পৌঁছে দেয়। ওরও সুবিধে হয় ঘরের কাজ করার। বেলা একটা-দেড়টায় বউই আবার খাবার নিয়ে আসে। সারাদিন পাখির গান শুনতে শুনতে টাইপ করি। বউ এলে গাছতলাতেই দু জনে লাঞ্চ করি।

তার পর খানিকটা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি। কাজ না থাকলে বউটাও আমার পাশে শোয়। শুয়ে শুয়ে দু জনে কত পাখির রঙ দেখি, গান শুনি, চুমু খাই…। বেলা পড়লে সব গুটিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। জীবনটা কেমন বল তো।

কফি শেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এগারোটা বাজে। এতক্ষণ ঠাণ্ডায় বসে বেশ ঝিম্ লাগছিল। ঘড়ির মুখ দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। বিদায় নিতে নিতেই চিফের প্রশ্নের জবাব দিলাম, অপূর্ব, নিঃসন্দেহে অপূর্ব চমৎকার জীবন। কিন্তু বড্ড রূপকথার মতো। প্রায় ফেয়ারি টেলস্। এখন জীবনকে বিশ্বাস হয় না। আর এ-সব গল্প আমাদের দেশের কাউকে বললে তো নির্ঘাত ঠ্যাঙানি খেতে হবে। যেখানে মানুষেরই থাকবার খাবার জায়গা জোটে না, সেখানে পাখির সংসার নিয়ে গল্প করাটা কেমন যেন মস্করার মতো শোনায়। জানি তুমি এখুনি আমার কথার প্রতিবাদ করবে আর তার প্রমাণস্বরূপ আবার তোমার দেশের রূপকথা শুনিয়ে দেবে। আমার কিন্তু এখন সত্যিই সময় নেই। বেলা বারোটার মধ্যে সব রকম লেবার বুকিং লেবার বোর্ডে পাঠিয়ে দিতে হয়। অথচ এখান থেকে অফিস পৌঁছুতেই আমায় কত সময় চলে যাবে। কিছু মনে কোরো না, সন্ধেবেলা-কিংবা কাল সকালে আবার তোমার সঙ্গে আড্ডা দেব…সো লং।

অফিসে পৌঁছেই শুনলাম কাল থেকে একটা ইটালিয়ান জাহাজ কাজ করবে। ওখানে ওর পেট থেকে 'কোল্-টার' রঙ মেশা কি সব কেমিকেল নামাতে গিয়ে এক অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওগুলো জাহাজের যে হোল্ডে ছিল সেখান থেকে একটা বিষাক্ত গ্যাস উঠছিল। সেই বিষাক্ত গ্যাস টেনে, কিংবা ঐ কেমিকেল মেশা রঙ শরীরে লেগে বম্বের বহু শ্রমিক রক্ত পেচ্ছাব করতে শুরু করেছে। ওখানকার ডক-সেফটি থেকে আমাদের সতর্ক করার জন্যে লম্বা চিঠি ঝেড়েছে। এখানে তাই শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্যে গ্যাসমুখোশ, রবারগ্লাভস, ওভারঅল ইত্যাদি অনেক কিছু সরবরাহ করতে হবে।

ডকের ব্রিজ পেরুবার সময়ই দেখতে পেলাম জাহাজটা থেমে আছে বার্থের বাইরে। বিকেলে বার্থ পাবে। হলদের ওপর নীল বর্ডার দেওয়া চিমনিটা দেখে বার বার মনে হল কি হিংস্র জাহাজটা—মানুষখেকো।

ডক অফিস থেকে বেরিয়ে যখন চৌরঙ্গি পেরুচ্ছি, মনে হল রাস্তা থেকে কে যেন ডাকল আমায়। লাল লাইটের জন্যে গাড়ি এমনিতেই থামিয়েছিলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি ডানদিকের ফুটপাথ থেকে তপন হাত নাড়ছে। প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে তপনের সঙ্গে দেখা। ছেলেটা এখন যে ঠিক কি করে জিগেস করতে ভয় করে। কোনোদিনই ও সীরিয়াসলি কিছু করে না জানতাম। তবে চিরকালই তপন খুব ফাঁকা আওয়াজ ছাড়তে আর চাল মারতে ওস্তাদ। কিন্তু এখন যে ঠিক কি করছে এ প্রসঙ্গটা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। তপনের একটা ব্যাপার আমার সব সময়ই খুব টানে। যেটা হল সর্বদা ওর ফিটফাট সাজপোশাক। নাকের তলায় সুন্দর ভাবে ছাঁটা সরু ছিমছাম গোঁফ একসুতো বাড়ে না কমেও না। ব্লেড-সমেত হাতটা প্রতিদিন কী ভাবে এত নিখুঁত কাজ করে, একটুও কাঁপে না, ভুল করে না—এটা আমার কাছে সত্যিই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। শাদা প্যান্ট শাদা শার্ট। কোমরে চামড়ার চওড়া শৌখীন বেল্ট। পায়ে সেমিব্রোগ নস্যি রঙের সোয়েড সু। তখন গাড়ির কাছে এসে হাসতে হাসতে পরিচিত ভঙ্গিতে বলে, এই যে মক্কেলকে ধরেছি আজ। এখন সরস্বতী পুজোর ছুটির দিনেও এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ মানিক?

ইতিমধ্যে লালবাতি সবুজ হয়ে পেছনের গাড়িগুলো এন্তার হর্ন দিতে শুরু করেছে। আমি দেখলাম যখন তপনের পাল্লায় পড়েছি তখন সহজে ছাড়া পাওয়ার আশা কম। চট্ করে দরজা খুলে ওকে গাড়িতে পুরে একটু এগিয়ে গিয়ে কষে বাঁ দিক চেপে গাড়িটা পার্ক করে জিগেস করলাম, কেমন আছিস, খবর কি বল্।

আমার কাঁধে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে তপন বলল,

রাখ তোর কেমন আছিস। চল্ আমাদের পাড়ায়। দেখবি কি আগুন সব মাল আজ চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে। তোর জাহাজী ব্রাণ্ড একটা ছাড়। কতদিন ভালো সিগারেট খাই নি মাইরি। আমার পনেরো বছরের নেশা ছিল শালা ক্যাপস্টেন। তার পর টকাটক উইল্স্ পানামা পেরিয়ে সোজা চারমিনারে নেমে গেলাম। এক-একটা বাজেট পেছনে বাঁশ দিয়ে দিচ্ছে মাইরি। তোমার আর কি বল, দিব্যি শালা জাহাজী মাল মারছ। বেশ আছিস মাইরি তোরা, নারে?

মনে মনে ভাবলাম এই সব গেরুবাজ পায়রাগুলোকে চুলের ঝুঁটি ধরে সালফারের হ্যাচে ঢুকিয়ে দেখি বেশ থাকার মানেটা বুঝতে পারে কিনা। অথবা কাল যে বিষাক্ত গ্যাস ভরা ইটালিয়ান জাহাজটা উঠবে সেটায় পুরে দেখি ওদের পেচ্ছাবের সঙ্গে রক্ত বেরোয় না খুশির ডিমটো বেরোয়। মুখে শুধু বললাম, তা বেশ ভালোই আছি বলতে পারিস। কাজ-ফাজ তো কিছু করতে হয় না। শুধু মাঝে মাঝে জাহাজ বেড়িয়ে আসি, ভার্মুথ খাই। শোন, তোর সঙ্গে পরে একদিন জমিয়ে আড্ডা দেব। আজ ধর্মতলার দিকে আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

তপন স্পষ্ট অবজ্ঞার হাসি দিয়ে সব উড়িয়ে দিল। বলল, ছাড় তোর কাজ। আজ তোকে আমাদের পাড়ায় যেতেই হবে। অন্তত একদিন আমার কথা শুনে ত্যাখ না। যদি তোর লোকসান হয় আমায় সাত জুতো মারিস।

দেখলাম তর্ক করে লাভ নেই। মিছিমিছি আরো বেশি সময় নষ্ট। তার চেয়ে এখুনি ওদের পাড়ায় ওকে ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়তে পারলে অনেক ভালো। বিকেলে বরং একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রাবার গ্লাভস ইত্যাদির ব্যাপারটা সেরে ফেলতেই হবে। সালফারের জাহাজটায় ছুটো ক্লিনিং গ্যাং বুক করতে ভুল হয়ে গেছে। কাছে পিঠে কোথাও একটা ফোন পেলে ভালো হত। জাহাজটার ক্লিনিংয়ের কাজ সঙ্গে সঙ্গে শেষ করতে না পারলে লোডিং শুরু

করতে দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু এ-সব এখন ভেবে লাভ কি। সন্ধেবেলায় জাহাজে তো যেতেই হবে। তখন যা হয় দেখা যাবে। তপনের মুখে একটা কিংসাইজ গুঁজে দিয়ে তাই তাড়াতাড়ি বললাম, চল্ তোদের পাড়াতেই ঘুরে আসি।

তপন অত্যন্ত খুশির সঙ্গে ফের আমার ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে বলল, এই তো গুরু, এতক্ষণ ছিলে কোথায়।

অদ্ভুত একটা বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। চোখটা থেকে থেকে এখনো একটু একটু জ্বলছে। বালিগঞ্জে তপনদের পাড়ায় পৌঁছুতে মাত্র দশ মিনিট। ওখানে পৌঁছেই তপন ওর দল পেয়ে গেল। ঠাকুরের থেকে একটু দূরে তোড়া বাঁধা ট্যাঁপারির মতো একগুচ্ছ মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরা ঐ দিকে যাবার জন্যে আমার হাত ধরে টানল। আমি দেখলাম এই তাল। টুক করে এ সময় সরে পড়ার ধান্দায় বললাম, দাঁড়া, তোরা ঠাকুর কী রকম করলি সেটা আগে একটু দেখে আসি।

জানতাম এতে কেউ বাধা দেবে না। বাতির খেল্ আর ঠাকুর সাজাবার অভিনবত্বে প্রত্যেক পাড়ারই নিজস্ব গর্ব থাকে। বেপাড়ার কেউ সেটি দেখতে চাইলে ওরা দারুণ খুশি হয়। প্রথমটায় সত্যিই ঠাকুরের সামনে গেলাম। নিজেই অবাক হয়ে ভাবছি এ-ভদ্রমহিলার কাছে তো আমার আসার ঠিক কথা ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই সরস্বতীকে আমি ঠিক ঠাকুরের সম্মান দিতে পারি না। কি শাদা সাজ, আর কি দারুণ ফরসা পাতলা পেট। বেশ মনে পড়ে লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাবার দিনগুলো। খোলা লরিতে হৈ হৈ বসন্তের উদ্দাম হাওয়া। ঠাকুর যাতে পড়ে না যায় তাই বুকের সঙ্গে সরস্বতীকে জড়িয়ে রেখেছি। একবারও মনে হয় নি ঠাকুরের গায়ে হাত দিয়েছি। মনে হয়েছে বুবুকে বুকের কাছে ধরে রেখেছি। ঠিক তেমনি সরু কোমর। এগিয়ে আসছে। কি চোখ ধাঁধানো বাসন্তী শাড়ি—ঠিক গন্ধকের গুঁড়োর মতো রঙ…বুবুর মতো…। ধ্যুৎ তাই আবার হয়। নিশ্চয়ই চোখে

এখনো সালফারের গুঁড়ো ঢুকে আছে, সব সর্ষে ফুল দেখছি। দূর ছাই, গন্ধকের জাহাজে আর কক্ষনো কাজ করব না। চোখটা সত্যিই এখনো জ্বালা করছে। না হলে মেয়েটা এত কাছে এসে গেছে, তবু আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি না কেন। ওমা এই তো বুবু।

বুবু···বুবু···বুবু···।

একটা রঙ-ওঠা জাহাজের গায়ে যখন পুরোদমে চিপিং-পেস্টিংয়ের কাজ চলে, তখন একসঙ্গে হাজার ছেনি-হাতুড়ির শব্দে কানে তালা লেগে যায়। কালা হয়ে যায় কান। তখন ডেকে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চীৎকার করলেও পাশের লোক কিচ্ছু শুনতে পায় না। আমার রঙ চটা বুকের ভেতরেও এখন লক্ষ হাতুড়ির শব্দ। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও বুবু শুনতে পাবে না। ভাবছি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সরে পড়ব কিনা। বুবু কিন্তু স্থির ভাবে আমার চোখের উপর চোখ রেখে এগিয়ে এল। এতটুকু ঘাবড়াল না। আমার বুকের বোতামে আলতো হাত রেখে বলল, এই, বিমলদা না? দাঁড়াও দাঁড়াও। একটিও কথা বোলো না। একটু দেখতে দাও তোমায়। ক-তদিন দেখি নি তোমায় বল তো। আমার ওপর ভীষণ রেগে গেছ, না বিমলদা। কিন্তু কেন যে হঠাৎ বিয়ে করলাম শুনেছ সব? উঃ কত কথা যে তোমায় বলার আছে। তোমার কথা কিন্তু আমি অনেক শুনি। এখনো খিদিরপুর গেলেই শুনি। তুমি নাকি আজকাল মস্ত জাহাজী বাবু হয়েছ। অনেক অনেক কাজ করছ। ধ্যুৎ, আমার বিশ্বাসই হয় না।

কথা বলতে বলতে কখন যে আমরা পুজোমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসেছি বুঝতেই পারি নি। তপনদের দলটা তখন ও-ফুটে পানের দোকানে। তপন দড়ির আগুনের ফুলকি থেকে শার্ট বাঁচিয়ে একমনে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত। বুবুকে দেখলে হয়তো ফস করে কি একটা বলে বসত। আমি তো ভয়ে কাঁটা। দু-পা ঘুরেই রাসবিহারী এভিনিউ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কাছে-পিঠে কোনো গাছের ছায়া খুঁজলাম। নেই। সমস্ত ছায়াই কেউ না কেউ

দখল করে আছে। গাড়ি, ঠেলা অথবা রিকশা। অল্প দূরে একটা রোগাটে বকুলগাছের একটুকরো ছায়া পেলাম। একটা আইসক্রিম-ওয়ালা দাঁড়িয়েছিল সেখানে। তাড়াতাড়ি একটা অরেঞ্জ-বার কিনে 'ঠিক হ্যায়, যাও' বলতে লোকটা সত্যিই ভালো-মানুষের মতো এগিয়ে গেল তার গাড়িটা ঠেলে। অরেঞ্জ বারটা বুবুর দিকে এগিয়ে দিতেই বুবু হেসে বলল, উঃ, তোমার সব মনে আছে বিমলদা? সত্যি, আমার নেবু আইসক্রিম এখনো দারুণ ভালো লাগে। তুমি ঠিক ওটাই কিনলে।

আমি গম্ভীর ভাবেই বললাম, দূর, আমি সব ভুলে গেছি। আসলে ঐ অরেঞ্জ-বারটাই সবচেয়ে সস্তা তাই কিনলাম।

ঠোঁটটা বাঁ দিকের গালের দিকে টিপে স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুরে বুবু বলল, ও তাই বুঝি? তা একটা কেন, নিজেরটা কোথায়।

বললাম, ওতেই হুটো আছে। তা ছাড়া আজকাল আইসক্রিম কোম্পানির নতুন আইন হয়েছে, একবয়সী হুটো ছেলেমেয়ে একটির বেশি হুটো পাবে না।

সারা দেশে কি ভীষণ খাদ্যাভাব তার খোঁজ রাখো। বুবু হেসে উঠে হাতে চিমটি দিয়ে বলে, খুব যে মজা। আমার বিয়ে হয়ে গেছে, একটা মেয়ে আছে, এ-সব কি মশায়ের জানা আছে?

আমি বেশ একটু অবাক অবাক মুখ করে বললাম, তার সঙ্গে আইসক্রিম খাওয়ার কি। তা ছাড়া আমি তো মানুষের এঁটো খাই না। আমি পেত্নির এঁটো খেতে ভালোবাসি।

বুবু বলল, বাঃ চমৎকার। রাস্তাঘাটে এ সমস্ত কেউ করে? কেউ যদি দেখে ফ্যালে আমরা হু জনে একটা আইসক্রিম খাচ্ছি। তোমার কি কোনোকালে বুদ্ধি হবে না।

আমি তেমনি দৃঢ়ভাবেই বললাম, আমি তো বোকা বরাবরই। কিন্তু তুমি যে আমার চেয়েও বোকা তা কি করে জানব বল। আমাদের সিনেমা দেখা ছাড়া লোকের বুঝি অন্য কাজ নেই।

আমি একটা আইসক্রিম তোমার হাতে দিলাম। তুমি তাতে মুখ দিলে। তার বেশ খানিক পরে তুমি সেটা আমায় ফিরিয়ে দিলে। আমি আবার তাতে মুখ দিলাম। এই টুকরো টুকরো ছবিগুলো একসঙ্গে প্রজেক্ট করলে তবেই আমরা লোকের চোখে সিনেমার মতো ধরা পড়ব। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। একটা লোক দেখে গেল আমি একটা আইসক্রিম খাচ্ছি। তাতে হলটা কি। দু জনেই যে এক আইসক্রিম খাচ্ছি তার কি প্রমাণ।

মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বুবু বলল, বাব্বাঃ। তুমি ঠিক আগের মতো আছ। যা গোঁ ধরবে তাই চাই। বেশ বাবা নাও, খাও। কিন্তু আগে বল আমার একটা কথা রাখবে।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বুবু বলল, আমার আগেকার চিঠিগুলো কি এখনো তোমার কাছে আছে? যদি থাকে, আমায় দেবে একদিন?

একটা আলাধরা ঠাট্টার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, কেন ভয় করছে? যদি বরকে দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করি? তার আর কোনো ভয় নেই। শেষবার ফ্ল্যাট পালটাবার সময় ছাদে গিয়ে নিজের হাতে সব পুড়িয়ে ফেলেছি। একটুও কাঁদি নি কিন্তু।

বুবু একটুও দুঃখ পেল না। বেশ সহজ সুরে উত্তর দিল, বেশ করেছ। কোনো চিহ্ন না রাখাই ভালো। কোন দিন আবার একটা বিয়ে করে বসবে। বউ তোমার কীর্তি দেখে দু দিনেই ডিভোর্স করে পালাবে। কি দরকার ওসব।

এই প্রথম বুবুকে আমার স্পষ্ট খারাপ লাগল। ভীষণ বেড়াল বেড়াল। মাদি বেড়ালের মতো গোছানো প্রকৃতির। ঠিক তালে থাকে, একটু উঠে গেলেই পাত থেকে নিঃশব্দে মাছের টুকরোটা নিয়ে কেটে পড়বে। অথচ তার আগের মুহূর্ত অবধি মুখে কি নির্বিকার ভাব। হাসি পেল। বললাম, চিহ্নগুলো সব মুছে দিতে চাও তুমি, কিন্তু এমন অনেক সূক্ষ্ম চিহ্ন থেকে যায় যেখানে

তোমার আঙুল রগড়ে ভেঙে ফেললেও মুছতে পারবে না—সেটা জান? বুবু স্রেফ ঠোঁট উলটে বলল, ওসব সূক্ষ্ম চিহ্ন ভেতরে থাকে। কেউ দেখতে পায় না। কতরকম ভান করে ওসব ঢেকে রাখা যায়। তাই ও নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

বুবুর সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে আর কোনো কড়া কথা মুখে এল না। একটা ঝরা অশ্বত্থ পাতা উড়ছিল হাওয়ায়। ওটাকে দেখিয়ে বুবুকে বললাম, ছাখো বুবু, ঐ ঝরা পাতাটার বুকে কান পাতলে আমি কিন্তু ওর অনেক কথা শুনতে পাই। যে ঝড়ের রাতে ও গাছ থেকে ছিঁড়ে পড়েছে, তখনকার সব আর্তনাদ ওর বুকে কান পাতলেই শুনতে পাই আমি।

অদ্ভুত একটু ম্লান হেসে বুবু বলল, তুমি বুঝি এখনো কবিতা লেখ বিমলদা? তুমি আবার মস্ত বড় জাহাজী বাবু—আমাকে তাও বিশ্বাস করতে হবে।

বললাম, কে বলেছে আমি মস্তবড় জাহাজী বাবু। জাহাজের ওপর সব্বাই ফড়িংয়ের মতো ছোট্ট। সমুদ্দুরের ওপর প্রকাণ্ড জাহাজও আবার কুঁচো চিংড়ির মতো ছোট্ট।

বুবু আমার কথার উত্তর দিল না, প্রতিবাদ করল না। ওর লালচে ঠোঁটে শুধু সেই শাদাটে লিপস্টিকের মতো ম্লান হাসিটা লেগে রইল। হেঁটেই বুবুকে ওদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিলাম। বড় করুণ ভাবে ও আমাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ জানাল। কিন্তু সত্যি এতটুকু সময় নেই আমার। তবু ওকে নিরাশ না করার জন্যেই বললাম সময় পেলে সন্ধের দিকে ঠিক আসব। ও আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে বলল, আমার গা ছুঁয়ে বল ঠিক আসবে।

দেখলাম বুবুর চোখে জল চিক চিক করছে। সিঁড়ির তলায় অন্ধকার। বুবুর ফরসা কপালে আমার ঠোঁট। একটুও ভয় পেল না বুবু। আমি চলে যাচ্ছি। পেছনে রইল অন্ধকারে উজ্জ্বল বাসন্তী শাড়িতে মোড়া ছোট্ট একটা ক্যানারির মতো বুবু।

উঃ, এই বিষাক্ত অন্ধকারে ঐ সুন্দর ছোট্ট ক্যানারিটাকে নামিয়ে দেবে ওরা। ভাবলেই বিশ্রী লাগছে মনটা। সেই বিষের ধোঁয়া-ভরা ইটালিয়ান জাহাজ। চার নম্বর হ্যাচেই আসল ব্যাপার। টুইন-ডেকে নেমে, একটি একটি করে হ্যাচবোর্ড খুলতে ভয় পাচ্ছে সবাই। রাসায়নিক পরীক্ষাগার থেকে যে লোকটি এসেছে নানা সাজসরঞ্জাম নিয়ে, তাকে সাহায্য করবার জন্যেও লোক চাই। জাহাজের ইটালিয়ান ক্রু-গুলো কেউ ভয়ে নামতে চায় না। অথচ হ্যাচ আজ খুলতেই হবে। হ্যাচের মধ্যে বায়ু চলাচলের পথ করে দিতে হবে। মনের মধ্যেও। বিশেষত মেয়েদের মনে। একবার যার কাছে তারা মনের জানলা খুলে শান্তি পায়, তাকে না পেলে যেন তার বাকি জীবনের দাবি কিছুতে মেটে না। জানি না হয়তো সব পেয়েও তাই বুবু আমায় ভুলতে পারছে না। আজও বুবু ভালোবাসে আমায়। কিন্তু শুধু ভালোবাসার জোরে একটা মানুষকে কি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া যায়। ইসমাইল সর্দার খুবই ভালোবাসে আমায়। এই সুযোগে আমি তাকে ঐ বিষাক্ত হ্যাচটা খুলতে অনুরোধ করলে ও সত্যিই হয়তো টুইন-ডেকে নেমে পড়বে ওর দু-তিন জন লোক নিয়ে। কিন্তু আমি অনুরোধ করব কি করে। বলব কি করে। কই আমি নিজে তো যাচ্ছি না ওখানে। যেহেতু আমি ওপর তলার লোক তাই আমার প্রাণের দাম আছে আর ঐ গরীব মানুষগুলোর প্রাণের কোনো মূল্যই নেই? শুধু এই কথা কটা ইসমাইল আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে পারত। তা হলেই আমি নেড়িকুত্তার মতো ল্যাজ মুড়ে সুড়সুড় করে পালাতাম।

কিন্তু ইসমাইল তা করে নি। আমার বলার আগেই লেগে গেছে হ্যাচ খুলতে। আর আমি যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে, যথেষ্ট সাবধান হয়ে শুধু উঁকি দিলাম। হ্যাচের মধ্যে রাশি রাশি জমাট অন্ধকার। বজবজের পথে দৃষ্টি চলে না এত অন্ধকার। আশ্চর্য গাঢ় অন্ধকার এই রাস্তাটা।

কি নরম অন্ধকারটা, নাগো ?

বুবুর মাথা আমার বুকে। বললাম, ঠিক পশমের মতো নরম।

বুবু বলল, এ রকম পশমের জামা বুনলে পরবে তুমি ?

বললাম, পরবো, কিন্তু জামার ওপরে না। জামার সঙ্গে যার হাতের স্পর্শ থাকে, তাকে আর একটা জামার ওপরে আটকে রাখতে আমার ভালো লাগে না।

নিজেদের নোংরা জামার ওপর লোকগুলো সব রঙিন রাবারের ওভারঅল্‌ জুতো গ্লাভস্‌ ইত্যাদি পরে ভারি খুশি। হায় রে আমার দেশ। পৃথিবী-বিখ্যাত অনুন্নত দেশের মানুষ এরা। সামান্য নতুন জামাকাপড় পেলে ওরা হাসিমুখে মরতে যেতেও রাজি। এতটা সরলতা অর্থনীতিতে চৌকস কোনো বিদেশীর চোখে নিঃসন্দেহে চরম পাঁঠামি। কিন্তু এ রকম দৃশ্য যে আজকের দুনিয়ায় কত দুর্লভ তা কে অস্বীকার করবে। কত অল্পে খুশি ওরা। হাজার রকম মালে ভরা হ্যাচগুলো সব গর্ভদেশের মতো। কখনো আমরা দাইয়ের মতো পেট খালাস করি। কখনো কামুক পুরুষের মতো পেট ভরে দি। এই হ্যাচটা খোলার ভয়াবহ সতর্কতা দেখে মনে হচ্ছে গর্ভে কোথাও ক্যান্সার হয়েছে। একটি একটি করে হ্যাচ বোর্ডের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষক মিস্টার বিশ্বাস ছোট্ট একটি খাঁচায় একটি হলুদ ক্যানারি এনে নামিয়ে দিয়েছেন একেবারে ডিপট্যাঙ্কে। ওপরে আমাদের সকলের শ্বাসরুদ্ধ প্রতীক্ষা।

কিন্তু কতদিন আর প্রতীক্ষা করে থাকা যায় তুমিই বল। আমরা সবাই জানতাম মা আর বেশিদিন নেই। মুখে কিছু তেমন বলেন না। শুধু চোখ থেকে জল পড়ে।

বজবজ যাওয়ার পথেই বুবু বলেছিল এ-সব কথা। চারিদিকে তখন সবে অন্ধকার নামছে। অল্প গরম পড়তে শুরু হয়েছে। তুলতুলে নরম বসন্তের সন্ধে। একটুও ধোঁয়া নেই কোথাও। তরল অন্ধকারটা দেহের প্রতিটি রোমকূপে ঢুকে পড়েছে জলের মতো।

লম্বা একটানা রাস্তা ভরে আছে বনফুলের গন্ধে। দু পাশে ছড়িয়ে আছে লাউ-কুমড়োর লতা দোলানো সেই বাংলা-বাংলা অন্ধকার। এই অন্ধকার, এই আলু-পোড়া গন্ধ মৃগনাভী আধুনিকাদের নাককে পীড়া দেয়। নাকে সুগন্ধী হ্যাঙ্কি চাপা দিয়ে তারা বলে, গন্ধের জন্যে না, আমি রুমালে হাই চাপলাম। ক্যাপ্টেন আমায় সাবধান করে দিয়ে বলল, শুধু নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তুমি হ্যাচের কাছে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না চ্যাটার্জি। ওটা স্রেফ বোকামি। এ-সব গ্যাস রুমালে আটকায় না। নিশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে রক্তে মিশে যেতে পারে। মাস্ক না পরে ওখানে গিয়ে বীরত্ব দেখানোর কোনোই মানে হয় না।

অগত্যা দূর থেকে শুধু দর্শক হয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। খোলা ডেকের ওপর আকাশভাঙা আলো থেকে একটা ছোট্ট হলুদ প্রাণ ডুবে গেছে ডিপ ট্যাঙ্কের অতল অন্ধকারে। বেচারি পাখি, যদি মরেই যায়, তার জন্যে কারুরই মাথাব্যথা নেই। তবু সকলেরই কি হয় কি হয় অবস্থা। সেটা পরীক্ষার ফল জানবার জন্যে। পাখিটার জীবনের জন্যে নয়। বেশ খানিক পরে খাঁচাটা তোলা হল। মরে নি পাখিটা। হলুদ ডানা তুলে সুন্দর নেচে বেড়াচ্ছে সারা খাঁচায়। শিস দিচ্ছে, গান গাইছে আনন্দে। প্রথমে গান গাইতে বরং লজ্জাই পাচ্ছিল বুবু। তার পর দু পাশের অন্ধকার গাঢ় হতে নিজেই গেয়ে উঠল। সুরের সূক্ষ্ম কাজ তোলা ওর সেই একান্ত নির্জন গলা। গুনগুন করে অলি বার বার ফিরে আসে আমার চোখে···গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনে···পেট্রলে···মোবিলে···রক্তে। ভাবছিলাম সারা জীবন যদি বুবুর গানভরা মাথাটা বুকে নিয়ে পথ চলতে পারতাম!

গান, গান, গান। বল কি গান শুনতে তুমি ভালোবাস।

আমার মুখের ওপর নীল চোখ রেখে প্রশ্ন করল জার্মান ক্যাপ্টেন রোসা। মাত্র দু-তিন হ্যাচের ছোট্ট জাহাজ। বড় বড় নতুন জার্মান জাহাজগুলোর পাশে এটাকে এত পুঁচকে আর করুণ

লাগে। ঠিক একটা গাধাবোটের মতো। মস্ত মস্ত লোহার জয়েস্ট, রেল সবই কিন্তু এর পেটে ধরে যায়। শুধু হ্যাচগুলোর মুখ ছোট বলে লোড করার সময় আমাদের জিভ বেরিয়ে যায়। দশ-আনা ছ-আনা সিলিং করে প্রায় খাড়া অবস্থাতে ওগুলো হ্যাচের ভেতর ঢোকাতে হয়। একটু উনিশ-বিশ হলেই চেন থেকে পিছনে একেবারে জাহাজের হোল্ড ফুটো করে দেবে। আর নিচে যারা থাকবে তারা স্রেফ চিঁড়ে-চ্যাপ্টা। হ্যাচের ভেতরে লোহাগুলো সাজানো ঠিক হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে ডু নম্বর হ্যাচের ধারে ঝুঁকে দেখছি। মাথার ওপর কখন যে ক্রেনটা ঠোঁটে করে নিঃশব্দে এক সিলিং লোহা এনে ফেলেছে খেয়াল করি নি। তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালাম। রাত হয়ে গেছে তবু ক্লান্ত লাগছে না আজ। চারিদিকে এত পাগল করা হাওয়া যে মনে হচ্ছে ভারি ভারি লোহার জয়েস্ট-গুলো কি লাইন থেকে দেশলাই কাঠির মতো উড়ে যাবে। এক-একদিন শেষ বসন্তে কলকাতায় এমনি রাজকীয় হাওয়ার রাত আসে। কোথাও শীতকালের মতো ধোঁয়া নেই। চারিদিক একেবারে স্বচ্ছ। বুবুদের পাড়ায় মোড়ের বাড়িগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। বুবুকে বলেছিলাম, এমনি পরিষ্কার হাওয়ার রাতে তোমাদের পাড়াটা একেবারে ঈশ্বরের পাড়া মনে হয়। ভগবান সম্বন্ধে আমার যে একটুও মাথা-ব্যথা নেই তা তো তুমি জানই। তবু যা ভালো লাগে তা ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে কোনো মানুষকে আর হিংসে করার কিছু থাকে না। সেইজন্যে এখন আমার প্রায়ই মনে হয় তোমাদের এ-পাড়াতেই কোনো বাড়িতে হয়তো ঈশ্বর কিছুদিন ভাড়া ছিলেন।

বুবু বলেছিল, আর আমার কি মনে হয় জান? মনে হয় ঘরে নয়, পাড়ায় নয়, একদম ফাঁকা মাঠে পালিয়ে যাই। এমনি হাওয়ার রাতে ভীষণ ফাঁকা মাঠে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কক্ষনো এ রকম হয় না। শুধু বইয়ে পড়ি।

আমি হাসতে হাসতে বলি, একেবারে একা একা মাঠে শুয়ে থাকতে ভালো লাগে তোমার ?

বুবু হাতের মধ্যে টিস্যু পেপার দলা পাকানোর সুরে বলল, ধ্যাৎ, একা কেন। সঙ্গে কেউ থাকলে। আচ্ছা বল তো বিমলদা, পুরুষের ঠিক কোথায় মাথা রেখে শুতে আমার ভালো লাগে। কোলে না কিন্তু।

আমি একবার চোখ বুজলাম একবার খুললাম। বললাম, তুমিই বল কোথায়।

সুদূর অস্পষ্ট ফিসফিসে সুরে বুবু বলল, বুকে।

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। চোখ বুজেই রইলাম। বুবু আমার কাঁধে একটা ছোট ঝাঁকা দিয়ে বলল, শোন না বিমলদা, আমরা যখন খুব বুড়ো হয়ে যাব, মাথা ভর্তি পাকা চুল, তখন তো আমরা একসঙ্গে ঘুরলে বা থাকলে কেউ কিছু ভাববে না ? বুবুর নরম হয়ে আসা ঠোঁট আর চোখে এই ফিকে নীল ইচ্ছেটাকে আঘাত করতে পারলাম না কিছুতে। যদিও স্থির জানি 'শিব-ঠাকুরের আপন দেশে'-ও তা সম্ভব নয়। সেই ডাচ চিফ অফিসারের পাখির পার্কের কথা মনে পড়ল। এই ডানা মেলবার সুযোগ আমাদের দেশে অন্তত কখনো পাব না। মুখে বললাম, তখন বুড়ো বুড়িকে দেখে কে আর কি ভাববে। আমরা তখন একেবারে স্বাধীন। পাখির বাসার মতো আমাদের একটা টিনটিনে ঘর থাকবে। আমি শুয়ে শুয়ে পড়ব আর তুমি ছোট্ট পাখির মতো আমার জানলার ধারে গান গাইবে···।

কথাটা বলে আমি নিজেই হেসে ফেলি।

না না হেসো না। আমি সত্যি বলছি।

ইটালিয়ান ক্যাপ্টেন মোনারোর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। জাহাজটা একটা রদ্দি লিবার্টি শিপ্। অবস্থা একেবারে খতম হয়ে এসেছে তবু এখনো বড় বড় কন্‌স্ট্রাকসান পার্টস্ নিয়ে আসছে। আর ক্যাপ্টেন মনারোর মতো দিলদার লোক বড় একটা চোখে পড়ে না।

নিজের মেয়েকে নিয়েও ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। নিজের মোটা মোটা আঙুলের প্রকাণ্ড থাবা দেখিয়ে বলে, ছাখো, মেয়েটার আমার এই বয়েসেই এ্যায়সা এ্যায়সা বুক। ওর মা পাড়ার মস্তানগুলোকে কিছুতে আটকাতে পারছে না। আমি বলি কি দরকার বাপু আর লেখাপড়ায়। ওদের থেকেই একটা বড়লোক পাকড়ে বিয়ে থা দিয়ে ফেল, ল্যাটা চুকে যাক। মেয়ের তা মনে ধরবে কেন। উনি মেডিকেল পড়ে দক্তর হবেন। আর তাই বিরাট পাছা তুলিয়ে এখন রোজ কলেজ যাবেন। পাড়ার ছেলেদেরই বা দোষ দি কি করে বল। তারাও তো মানুষ। এদিকে আমি ছুটিতে ফি বছর বাড়ি ফিরলেই বউয়ের কাঁদুনি, মেয়েকে কিছু বলছ না। আচ্ছা আমি কি বলব বল তো। মেয়ে এখন বড় হয়েছে, ধিঙ্গি হয়েছে, এখন সে যা ভালো বোঝে করুক। প্রত্যেকেরই তো নিজের সম্বন্ধে ভাববার স্বাধীনতা আছে—না কি? উঃ এই নিজস্ব স্বাধীনতা যে কি জিনিস তা বোঝাতে পারবো না তোমায়। আমাদের মতো ছটফটে অস্থির মানুষের পক্ষে যুদ্ধবন্দী হয়ে চুপচাপ বসে থাকা একেবারে অসম্ভব। তবু থাকতেই হত। তখন মনে হত পাগল হয়ে যাব। তোমার এখন কাঁচা বয়েস, এখনো কত যুদ্ধ দেখবে তার পর বুঝবে, কী মর্মান্তিক এ সব অভিজ্ঞতা। বন্দীশিবিরে বসে বসে দেখতাম, ভাবতাম কাঁটাতারের বাইরে ঐ রাস্তার কুকুরটারও একটা পছন্দমতো গাছ বেছে নিয়ে ঠ্যাং-তুলে পেচ্ছাব করার স্বাধীনতা আছে। আমাদের তাও নেই। সেইজন্যে আজ আমরা এমন হন্যে হয়ে 'পীস' খুঁজছি। শুধু ধ্বংস আর মৃত্যুর জন্যেই যে যুদ্ধটা ভয়াবহ তা কিন্তু আমি মনে করি না। ধ্বংস মৃত্যু তো আছেই। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অসংখ্য মানুষের বহু বছরের স্বাধীনতা চলে যায়। নিজেদের কৃষ্টি আর অভ্যাস পালটে যায়। এটা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। এমন ভেবেই 'পীস' শব্দটাকে দারুণ সুন্দর বড় মিষ্টি লাগে। তোমাদের বাংলা ভাষার এই 'পীস' শব্দটাকে কি বল?

বললাম, শান্তি।

মনারো বলল, কি, শা-শা শান্তি ?

বললাম, ঠিক হয়েছে। তবে শব্দটা যদি আরো সহজভাবে উচ্চারণ করতে পারতে তা হলে দেখতে 'peace'-এর চেয়ে 'শান্তি' কত গভীর। মনে হয় বর্তমান যুগে 'পীস' শব্দটার গায়ে যত বেশি রক্তের দাগ লেগেছে, শান্তির গায়ে ততটা না।

মনরো বলল, তা হয়তো হতে পারে। আপাতত আমি কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে ঐ দুটো শব্দের যে-কোনো একটা বজায় রাখতে পারলে বেঁচে যাই। জান, সেবার প্রায় দু বছর পরে বাড়ি ফিরেছি। ওখানে তখন ভরা সামার। হঠাৎ পৌঁছে সকলকে অবাক করে দেব ভেবে আগে থেকে কোনো খবর দিই নি। দুপুর বেলায় বাড়ি পৌঁছুলাম। মেয়ে দরজা খুলে অবাক। বললাম, মা কোথায়। সে বলল ঘরে ঘুমচ্ছে। আমি জানতাম গরম-কালের দুপুরটায় বউ আজকাল একটু-আধটু ঘুমায়। হাজার হোক বয়েস তো হচ্ছে। মেয়ে আমাকে বারণ করল তার মাকে ডাকতে। আমি বললাম, রাখ তোর মায়ের ঘুম। ভেতরে ঢুকতেই বউ ধড়মড় করে উঠে বসেছে। এমন একটা উদাস উদাস চাউনি, আমায় যেন চিনতেই পারছে না। দুপুরবেলা ঘুমিয়ে উঠলেই দেখবে মেয়েরা একটু কেমন কেমন হয়ে যায়। কিচ্ছু চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না। কতক্ষণ যে নিজের স্বামীকেই চিনতে পারে না তার ঠিক নেই…।

দুপুরের ঘুম ভাঙিয়ে বুবুকে ডাকতে বুবুও প্রথমটায় অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। মেঘ-ভাঙা আলো ফরসা কপালে, চুলে। কপালে হাত রাখতে এমনভাবে বুবু চাইল আমার দিকে যেন মনে করবার চেষ্টা করছে কে আমি। যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যিই আমি এসেছি। ছোটবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমার কেমন যেন মনখারাপ থাকত। কোনো কারণ নেই, তবু কান্না পেত। বুড়ো বয়েসেও সে অভ্যেসটা যেন খানিকটা

রয়ে গেছে। তাই দুপুরে আমি টপ করে ঘুমতে চাই না। এই বয়েসে তো ঘুম থেকে উঠে অকারণে ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে পারি না। তবে দিনেঘুমনো মেয়েদের ঘুমন্ত শরীরটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। গায়ে হাত দেবার আগে তাই বুবুর ঘুমে ফোলা শরীরটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। বুকের ওপর থেকে শাড়ি সরে গেছে। চেনা সেই মাংসের ফুল দুটি ওঠা নামা করছে নিঃশব্দে। আমি বলতাম ওয়াইল্ড্ ব্র্যারিজ। চুপটি করে একলাটি একটা জাহাজের ডেকে একবার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ মনে হল তীরের মাটিতে গাঁথা ক্রেনটা যেন নড়ছে। নড়াটা ঠিক ঘুমের সময় খুব মৃদু নিঃশ্বাসে বুকের ওঠাপড়ার মতো নিঃশব্দ ধীর। ভাবলাম চোখের ভুল। ক্রেনের মাথাটা চব্বিশ ঘণ্টা সারসের মতো ঘুরছে ফিরছে, ওঠানামা করছে তা সব সময়ই দেখছি। কিন্তু পায়ের দিক থেকে ক্রেনের সারা দেহটা আকাশের দিকে উঠছে নামছে—এটা একটা সাংঘাতিক অদ্ভুত ব্যাপার! চোখ রগড়ে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম! নাঃ, একটুও ভুল নেই। ক্রেনটা সত্যিই ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে। আর ধীরে ধীরে নড়ছে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই নয়। জলের মৃদু ঢেউয়ে, প্রায় বুঝতে দেয় না এত আস্তে, সারা জাহাজটাই উঠছে নামছে। ফলে মনে হচ্ছে তীরের ক্রেনটা যেন ওঠানামা করছে। বুবুর মেয়েটা এখনো স্কুল থেকে ফেরে নি, তবে ফেরার সময় হয়ে গেছে। বুবু তাই দরজা খুলে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অসিতদা আজই সকালের ট্রেনে ট্যুরে চলে গেছেন। ফিরবেন হয়তো দিন চার-পাঁচ পরে। একটা মস্ত ওষুধ কম্পানিতে ভালো চাকরি করেন অসিতদা। প্রায়ই ট্রেনে বিহার উড়িষ্যা ঘুরে বেড়াতে হয়। এ সম্বন্ধে অসিতদার নিজের উক্তিটা ভারি মজার। বলেছিলেন প্রায় রোজই ট্রেনে রাত কাটিয়ে ঝাঁকানিতে এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে বাড়ির নিশ্চল খাটে আর ঠিক ঘুম আসে না। বাড়ির বিছানায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে ভীষণ খারাপ

লাগে। মনে হয় এ আবার কি, নড়ে না কেন, সারারাত এক স্টেশনেই পড়ে থাকবো নাকি। এমনিতে অসিতদা মানুষটা ভালোই। তবে কথাবার্তা ব্যবহার সবই বড় চৌকো মতো। অর্থাৎ, কোণ আছে, ধার আছে। মোটেই গোল নয়, মিষ্টি নয়। কেজো ভাবটা যেন একটু বেশি। সুযোগ পেলেই নিজের পতাকা ওড়াবার চেষ্টা। দুনিয়ায় আর কেউ যেন কাজ করে না। গায়ে যেন সব সময়ই একটা অফিসের অদৃশ্য কোট চাপানো। জিভে সর্বদা অদৃশ্য টাইপ রাইটারের ফিতে বাঁধা। মনে হয় অসিতদা যেন কথা কইছেন না, কথা টাইপ করছেন। এ ধরনের মানুষ দেখলে হাসি পায় আমার। এরা অন্যের কথা শোনে, কী ভাবে তাকে পাশ কাটানো যায় শুধু সেই জন্যে, তখন এদের মুখটা ভারি মজার দেখায়। ঠিক যেন ফরওয়ার্ড লাইনে পি. কে. ব্যানার্জি গোল দেবার আগে প্রতিপক্ষের মধ্যে লুকিং ফর অ্যান ওপ্‌নিং। তবে অসিতদার সেরা গুণ হল উনি ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না। এটা কিন্তু অসিতদার পোজ নয়। অনেক দিনের অভ্যেস। বউ আমার সঙ্গে প্রেম করবে কিনা—এ-সব ব্যাপার অসিতদার কাছে নেহাতই ছোটখাট ব্যাপার। —তাই তা নিয়ে মাথাব্যাথার সময় নেই অসিতদার। শুধু বউয়ের প্রতি ওঁর কর্তব্য ঠিক হচ্ছে কিনা এটুকু জানলেই অসিতদা খুশি। হয়তো শুধু এই জন্যেই বুবু অসিতদাকে ভালোবাসে। অসিতদাও বেশ জানে সেটা। আর অন্য কিছু না জানলেও চলে যাবে। মস্ত মস্ত কাজের লোকেরা সব এমনিই হয়তো হয়ে থাকে। জানি না ঠিক। তবু মনে হয় ওরা হয়তো ভাবেন যে তারা যা জানেন, তার বাইরে আর জানার কিছু নেই, তারা যা বলেন তার পরে আর অন্য কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। অন্তত দত্ত কম্পানির হরেন্দ্রচরণবাবু তা-ই জানতেন। সেই রাতে আমার কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না উনি। ঘুঘু লোক হরেন্দ্রচরণবাবু। সাধে-সাধে আমায় মাইনে দিয়ে, গাড়ি দিয়ে পুষে রাখেন নি নিশ্চয়ই। টাকা দিলে

মুখের রক্ত তুলে খাটিয়ে তা উশুল করে নেওয়াটাই তো নিয়ম।

অফিসে যেতে শুধু দুটি কথায় তিনি আলোচনা শেষ করে দিলেন। আমার কথায় নির্ভর করে উনি জাহাজের পাইলট বুক করেছেন। জার্মানিতে জাহাজ-মালিকদেরও সেই ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। চিটাগাং চালনাতেও কার্গো বুক করা হয়েছে, কাল জাহাজ কলকাতা ছাড়লে ঠিক যে সময় ওখানে পৌঁছুবে সেই অনুযায়ী। এক্ষেত্রে রাত পোহালে আমি যদি ইমপোর্টের মাল সব না নামাতে পারি তা হলে জাহাজ সেইলই করতে পারবে না। সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। তাতে শুধু নিজেদের অপদার্থতাই প্রমাণ হবে না, আর্থিক ক্ষতিও দাঁড়াবে গিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকার। সুতরাং তাঁর শেষ কথা হল, 'আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না।

অথচ মজা হচ্ছে এই যে, আমি আজ সারাদিন-রাতে পুরো কাজ করার সুযোগই পেলাম না। চার-পাঁচ ঘণ্টা ক্রেন খারাপ, কর্কলিফ্‌ট নেই, রাতে লেবার কম ইত্যাদি কত যে ঝামেলা! হ্যাচকোমিংয়ের গায়ে ব্লক ফিট করে বিশাল পেটিগুলোকে উইঞ্চ দিয়ে টেনে টেনে হ্যাচস্কোয়্যারে বার করে রাখা হচ্ছে। ক্রেন এসে সেগুলো মুখে তুলে নিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। ওপর ওপর চাপানো এক একটি পেটির কাঠ আলগা হয়ে যাচ্ছে। একটার পেরেক, স্ট্রিপ, কাঠ নিচের বা পাশের পেটির সঙ্গে ফেঁসে যাচ্ছে। শালা, লাস কিছুতেই টেনে বের করা যায় না। অথচ এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় নেই। ব্লক থেকে যে তারটা পেটি টানছে, সেটা সোজা আর শক্ত হয়ে থরথর করে কাঁপছে। আর ব্লকটা ঘাড়ভাঙা গরুর মাথার মতো বেঁকে শক্ত হয়ে একটা অদ্ভুত কটকট আওয়াজ দিচ্ছে। রেগে উইঞ্চম্যানকে আরো জোরে টানতে বললাম। হঠাৎ আমার পাশ থেকে ফোরম্যান ঘোষ 'খবরদার' বলে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে, হাতের এক ঝটকায় আমাকে ব্লকের পাশ থেকে স্টারবোর্ড সাইডে ফেলে দিলে। একবারও ভাবি নি বুবু আমায় এইভাবে মাটিতে ফেলে

দেবে। হঠাৎ তলপেটে লাথি খাওয়ার মতো। যন্ত্রণায় সকলকে উল্লুক শুয়ার খচ্চর বলতে ইচ্ছে করছে। অথচ কি করেছি আমি। কিই বা চেয়েছি আমি। কিছুতেই মনে পড়ছে না কি চেয়েছি আমি। শুধু মনে পড়ছে বুবুর হাত থেকে কি পড়ে গিয়েছিল। আজই যেন আমি সেটা তুলে দেওয়ার জন্যে মাটিতে হাত ঠেকিয়েছিলাম। কি তুলে দিতে চেয়েছিলাম মনে পড়ে না। সেটা ঠিক বুবুর হাত থেকে পড়েছে, না চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়েছে মনে নেই। তুলে কার হাতে দেব। বুবুর হাতে? কোথায় বুবু। অথচ যেন আজই আমি নিচু হয়ে মাটিতে হাত দিয়ে তুলতে চেয়েছি। মনে হচ্ছে যেন কতকাল আগের ঘটনা। যেন গত জন্ম। হাতে কি উঠল জানি না। তারার আলোয় দেখলাম হাতে শুধু ধুলো লেগে আছে। অসিতদা ওদের হেড অফিস বম্বেতে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। বুবুও তাই চলেই যাবে। কাল জাহাজকেও চলে যেতেই হবে। সন্ধে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আর একটু পরেই বুবুদের ট্রেন ছাড়বে। যাবার আগে আমায় শুধু একবার দেখতে চেয়েছিল। কতদিন আর দেখা হবে না। অথচ আমায় না দেখলে জাহাজে কাজে সবাই ঢিলে দেবে। জাহাজ তা হলে কাল কিছুতেই সেইল করতে পারবে না। তার চেয়ে ট্রেনের জানলা থেকে আজ বুবু শুধু তারা দেখুক।

অসিতদাকে কেমন লাগে জিগেস করতে এমনি তারার দিকে তাকিয়ে বুবু বলেছিল, জান, আমার খালি মনে হয় এক একটা মানুষ এক একটা আলাদা তারা নিয়ে জন্মায়। অথচ ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে দেখলে সব তারাই কেমন এক রকম লাগে। দুটি তারার এই ধরনের মিলের মতো দুটি মানুষ নিজেদের মিল নিয়ে, সারাজীবন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে কাটায়। হঠাৎ বহুকাল পরে এদের একজন যদি আবিষ্কার করে যে তাদের দু জনেরই জন্মলগ্নের তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন আর দূরত্ব অনেক, তবু কিছুই বদলে যায় না। সব মেনে নিতে হয়, সহ্য করে নিতেই হয়।'

কিন্তু বুবু যে সত্যিই চলে যাবে এটা কিছুতেই ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নিতে পারছি না। অথচ এ ব্যাপারটা আমি যেদিন বুবুকে প্রথম চুমু খাই সেদিনই অনুভব করেছি। তা না হলে, ও বুঝবে না জেনেও কেন ওর বইয়ের ভেতর সেদিন এই লাইনগুলো লিখে রেখেছিলাম : 'As I took her roughly into my arms I felt loneliness came over me, real as the damp churchyard smell of the grass,...I felt heavy as Sunday...।'

রাত যত বাড়ছে আমার মাথা তত বেশি ভারি হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে চার নম্বর হ্যাচটা বোধহয় সত্যিই এবার হয়ে এল। পেটি সবই প্রায় সাবাড়। কিন্তু এক নম্বরের ডিপট্যাঙ্ক যে কিছুতেই ফুরোয় না। ট্যাঙ্কের মুখ এত ছোট যে একসঙ্গে বেশি মাল লাগালে কিছুতেই বেরুবে না। ফলে, চলছে তো চলছেই। আর এক রকমের মাল তো নয়। নানা রকমের নানা ওজনের মাল বেরুতে আরম্ভ করেছে। শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অফুরন্ত লম্বা লম্বা চেন। তার পর রাশি রাশি তামার ইঁট। চায়ের সময় বহুকাল পেরিয়ে গেছে। চা খেতে পাই নি। এখন দারুণ খিদে পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। জানি আর খানিক পরে খিদেও চলে যাবে শুধু ঘুম থাকবে। বেচারি ঘুম। আমার জন্যে তাকে অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে কত সুন্দর স্বপ্ন আসে। ঘুমের ওপর দিয়ে নিস্তব্ধ রাস্তায় একটা একলা বেহালা কেঁদে বেড়ায়। ঘোড়ার খুরের ক্লান্ত শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। তখন চার্লির মতো বলতে ইচ্ছে করে, ঘুমের ভেতর দিয়ে আমার মাথায় অনেক সুন্দর সুন্দর কল্পনা তৈরি হয়, কিন্তু দিনের আলোয় আমি তাদের কথা সব ভুলে যাই···। সত্যিই আমি সব ভুলে যাই কি? জাহাজে ব্লু পিটার দিয়ে দিয়েছে। জাহাজ চলে যাবেই।

বুবুর নীল আঁচল হয়ে মাস্তুলের ওপর ব্লু-পিটারটা উড়ছে। রাত প্রায় দেড়টা-দুটোয় সব শেষ। চোখের সামনে মরে গেল জাহাজটা।

সারা দিনরাত অধীর আগ্রহে যার নাড়ি টিপে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন সে আমার কাছে ঠাণ্ডা মড়া ছাড়া কিছুই না। একে একে গ্যাং, ফোরম্যান, টালিম্যান, সুপারভাইজার সবাই মড়া ছেড়ে নেমে যাচ্ছে। মড়া নিজেও কাল গঙ্গায় ভেসে চলে যাবে কতদূরে। ট্রেনটা এখনই চলে গেছে আরো দূর অন্ধকারে। দূর ছাই, সবাই পালাচ্ছে। আমার কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। কত দিন যে ট্রেনে চেপে বাইরে যাই নি। ভাবছি কাল আমি স্বাধীন। মুক্তি, অনেক মুক্তি। কাল ঠিক একটা ট্রেনে চাপব। কোথাও না যাওয়া হয়, অন্তত ব্যাণ্ডেল কিংবা বর্ধমান গিয়ে শালপাতার ঠোঙাভর্তি মিহিদানা সীতাভোগ খাব। ঠিক ঠিক ঠিক। তিন সত্যি।

চ্যাটার্জি সায়েব চেঁচিয়ে উঠলেন, না না না। আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। বুকিং নিয়ে যখন তুমি জাহাজে যাও নি, তখন আমি তোমায় অ্যাবসেণ্ট করবই।

অন্ত্যজন বলল, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যখন ছুটি নিতে চাইছি, তখন তুমি আমায় ছুটি নিতে দেবে না কেন? আমার অনেক পাওনা ছুটি জমা আছে। তুমি তার থেকে আমায় দু দিন দিয়ে দাও। আমি তো বললাম, আমার সেদিন আট-দশবার পায়খানা হয়েছে। আমার নড়বার শক্তি ছিল না। তাই যেতে পারি নি। তা ছাড়া আমি তো পরের দিনই খবর দিয়েছি।

গলাটা আর না চড়িয়ে বরং আরো ভারি অথচ কর্কশভাবে চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, দেখ মাধব, তোমার সঙ্গে বাজে বকবক করার সময় নেই আমার। তোমার যা বলার তা তুমি বলেছ। আমিও তা শুনেছি। ছুটি তোমায় আমি দেব না। এবার তুমি যেতে পার।

ফের অন্ত্যজনের রাগী গলা শুনতে পেলাম, তার মানে তুমি কি বলতে চাও মানুষের কোনোদিন অসুখ-বিসুখ করতে পারে না। কোনো অ্যাক্‌সিডেণ্ট হতে পারে না?...

একটা লম্বা মোটা কালো রঙের কাপড়ে বাঁধাই খাতা টেনে নিয়ে, তার ভেতরে একটি বিশেষ জায়গায় নিজের হাতে লাল পেন্সিলে একটি 'এ' লিখে দিয়ে, মাথা না তুলেই চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, আমি যা বলতে চাই তা এই। আমি অনেকবার বলেছি তোমার সঙ্গে তর্ক করার সময় নেই আমার। তুমি যেদিন জাহাজে যাও নি সেদিন মাসের কত তারিখ তা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। মাসের দু-তিন তারিখে মাইনে পেয়ে ডুব মারাটা যে

তোমার নতুন কিছু নয় তাও নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। সুতরাং আর কথা বাড়িও না।

অন্তুজন তার পরেও বলল, বেশ, আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তুমি বাবাকে ডেকে জিগেস কোরো। আমি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তা না হলে—

কথার মাঝখানেই তাকে থামিয়ে দিয়ে চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব। এখন তুমি যেতে পার।

এতক্ষণ চ্যাটার্জি সায়েব যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, মুখ দেখে তার বয়েস আন্দাজ করা বেশ কঠিন। মুখটা একেবারে চোয়াড়ে ধরনের। গাল ভেঙে ঢুকে গেছে। সামনের দিকের উপরের দাঁত উঁচু বলে ঠোঁট পুরো বন্ধ হয় না। কষ বেয়ে শুকনো পানের দাগ গড়িয়ে এসেছে। নাকটা বেশ খাড়া, কিন্তু উপরটা উঁচু-নিচু। দুই চোখের কোল থেকে গালের উঁচু হাড় পর্যন্ত মোটা কালি পড়ে গেছে। চোখটা বড় অথচ দৃষ্টিটা ধারালো হতে জানে। একটু উঁচু পর্দায় কথা বলার সময় গলার একটা মোটা শিরা ফুলে ওঠে। চোখের কোণে কতকগুলো লাল শিরা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারা মুখটা তখন অত্যন্ত হিংস্র লাগে। দু-তিনদিন না কামিয়ে গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরে আছে কিন্তু নতুন পাটভাঙা কড়া গিলে-করা পাঞ্জাবি আর শাদা পাজামা। আমার ভূমিকা ছিল এতক্ষণ শুধু ড্যাবড্যাবে চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার। কে এমন লোক যে চ্যাটার্জি সায়েবকে ‘তুমি’ বলছে, সেটাই ভাবতে পারছি না। আর স্বয়ং চ্যাটার্জি সায়েবের ব্যবহারটাও যেন বড় বেশি কর্কশ আর নির্মম মনে হচ্ছে। যে লোকটা সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকে শুধু শুধু অ্যাবসেন্ট করে তার দু দিনের পয়সা কেটে কি লাভ জানি না। লোকটা বেরুনো মাত্র তাই চ্যাটার্জি সায়েবকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা চ্যাটার্জি সায়েব, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াটা কি আইনের চোখে অন্যায়?

কথা হচ্ছিল চ্যাটার্জি সায়েবের অফিসে বসে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। কলকাতার সেই চির চেনা ডালহৌসির সন্ধে। চারদিকে ভীষণ পালাই-পালাই ব্যস্ততা। যেন আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে একটা টাইম বোমা ফাটবে। এ সময় ট্রামে-বাসে ওঠার তো প্রশ্নই আসে না। বাসের কোমরে বুকে পিঠে অজস্র পিঁপড়ের মতো মানুষ লেগে থাকে। এখন এদিক-সেদিক একটু ঘোরাফেরা করে, কফি হাউসে খানিক সময় পার করে, বেশ একটু দেরিতে ডালহৌসি-ঘোরা ট্রামে ওঠার সুযোগ নিতে হয়। কিন্তু সেই প্রায়-খালি ট্রামে উঠতে গিয়েও মাঝে মাঝে চমকে থেমে যেতে হয়। কারণ কন্‌ডাক্টার চিৎকার করতে থাকে উঠবেন না, উঠবেন না, এসপ্ল্যানেডে এটা লেডিজ হয়ে যাবে। একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে প্রায়ই চ্যাটার্জি সায়েবকে পাওয়া যায়। তখন ওঁর গাড়িতে একসঙ্গে ফেরা যায়। তবে উনি ডক না হয়ে বাড়ি ফেরেন না। আমার পক্ষে এই এক মুশকিল। বিকেলে জাহাজগুলোকে রাউণ্ড দেওয়া তাঁর অভ্যেস। মাঝেসাঝে মন্দ লাগে না ওঁর সঙ্গে ডকে ডকে ঘুরতে। কিন্তু সে পরের কথা। কথা হচ্ছিল বুকিং নিয়ে কাজে না যাওয়া সম্বন্ধে। আমার প্রশ্ন শুনে চ্যাটার্জি সায়েব এমন মিটিমিটি হাসলেন যে মনে হল এই রকম প্রশ্নটা উনি বহুক্ষণ আশা করছেন। উনি স্পষ্টই বললেন, ওসব ন্যায়-অন্যায়ের কথা ছাড়ো রায়। আমি তুমি দু জনেই জানি কোনটা কি। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে আমি সত্যিই মাধবকে ভালোবাসি। ওর কোনো ক্ষতি হয় সেটা আমিও চাই না। কিন্তু একটু-আধটু আর্থিক ক্ষতি করতে না পারলে কোনোদিনই ওর জ্ঞানগম্যি হবে না। আমার কথা ঠিক বুঝলে না, তাই না?

চ্যাটার্জি সায়েবের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দরজায় উঁকি দিয়ে বলল আসতে পারি—? চ্যাটার্জি সায়েব মাথা নাড়তে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে এসে বসলেন। বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি। খুব একটা লম্বা নয়। কিন্তু খুবই বলিষ্ঠ ধরনের

চেহারা। বিশাল বুক আর ভারি বেঁটে হাতের গড়ন দেখলেই বোঝা যায় উনি এককালে খুব কঠোর ব্যায়াম করতেন। মালকোঁচা দিয়ে বেশ গুছিয়ে ধুতি পরে আছেন। গায়ে একটা রঙিন খদ্দরের হাফশার্ট। ছোট ছোট করে ছাঁটা একটা চৌকো গোঁফ আর তার ওপর বেশ বড় একটা আঁচিল। উনি বসে প্রথমেই পকেট থেকে একটা মরচে-পড়া স্টেট এক্সপ্রেস টিন বের করলেন। তার ভেতর থেকে বিড়ি বার করে সেটাকে বেশ ভালো করে ধরালেন। তার পর অল্প একটু ধোঁয়া ছেড়ে ধীরে ধীরে বললেন, তুমি মাধবের ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখো ভাই। অ্যাবসেন্ট করে দিলে দু দিনে ওর অনেকগুলো টাকা মারা যাবে। তা ছাড়া সে তো সত্যিই তোমায় খবর দিয়েছিল।

সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু বেঁকিয়ে হেসে চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আপনি মাধবের বাবা হয়ে কি করে এ সমস্ত কথা বলতে পারেন। আপনি কি জানেন না মাসের তিন-চার তারিখে সে কাজে যায় না কেন। মাইনের টাকা পেলেই তো সে গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে পড়ে থাকে খিদিরপুরের এখানে-সেখানে। দু-তিন মাস টাকা কাটা গেলে তবেই যদি ওর হুঁশ হয়। না হলে দিন দিন কি অবস্থা হচ্ছে ওর ভাবুন দিকি। মদ খাওয়া খারাপ তা আমি মোটেই বলছি না। অফ-ডে কিংবা ডিউটি হয়ে গেলে খাক না যত প্রাণ চায়। কিন্তু সে কাজেই যাবে না, মাতাল হয়ে এখানে-সেখানে পড়ে থাকবে, এটা কি কথা। আরো সাংঘাতিক ব্যাপার হল ওর মদ খেয়ে জাহাজে গিয়ে হল্লা করা। এ-সব কে সহ্য করবে বলুন। জাহাজে সায়েবরা কিচ্ছু বুঝবে না। স্রেফ গলা ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেবে। সেটা তো আপনার আমার সকলের পক্ষেই অত্যন্ত অপমানের ব্যাপার। কেন যে ওরকম করে বুঝি না। অথচ রীতিমতো কাজ বোঝে ছেলেটা। অন্য কোনো ফোরম্যান না গেলে ও একাই সারা জাহাজের কাজ সামাল দিতে পারে। এই ছেলে যে

কেন এ ভাবে নিজেকে শেষ করছে কিছুতেই মাথায় ঢোকে না আমার।

মাথা হেঁট করে খুব নিচু গলায় সরলবাবু বললেন, সবই আমার ভাগ্য ভাই, সবই ভাগ্য। বাপ হয়ে আমি নিজে ওকে বলেছি যে মদ খাওয়ার ইচ্ছে হলে তুই কাজের পর বাড়ি এসে আমার সামনে বসে মদ খা। কিচ্ছু বলব না আমি। কিন্তু এ রকম ছু-তিনদিন বাড়িই ফিরবি না—এটা কি? মাথা ঠাণ্ডা থাকলে শোনে সব। তার পর ফের যা খুশি তাই করে বেড়ায়। হঠাৎ যেটা মাথায় ঢুকবে তাই করবে। তখন আর কারুর কথায় কান দেবে না।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের গলার স্বর ভেঙে গেল। ধার সেলাই করা ন্যাকড়ার রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। নাক টানতে টানতে ভাঙা গলায় বললেন, যাতে ভালো হয় তাই কোরো ভাই। আমারও আর কিছু বলার নেই। বয়েস হয়ে গেল। আর ক-টা দিনই বা খাটতে পারব! কিন্তু এর মধ্যেই যদি চাকরিটা চলে যায়, কি করে মাধব নিজের ছেলেপুলেগুলোর অন্তত ভাত জোটাবে জানি না…।

চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, অন্য একদিন ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। দেখব একবার বুঝিয়ে যদি কিছু করা যায়। আর ওর টাকা কাটার ব্যাপারটা যা ভাবছেন তা নয়। এ মাসে সত্যিই ওর টাকা কাটা যাবে ঠিকই, কিন্তু পরের মাসে ওর এই ছুটিটা আমি পাস করে দেব। তখন এই টাকাটা ও পেয়ে যাবে। তবে আমি চাই এর পর থেকে ওর ছুটির টাকা, ওভারটাইম ইত্যাদি সব কিছুর টাকা আপনি তুলবেন, মাধব নয়। কাঁচা টাকা হাতে পেলে ওকে সামলানো অসম্ভব।

চ্যাটার্জি সায়েবের কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সরলবাবু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উনি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্জি সায়েবও চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন। বললেন, চল রায়, আজ কোথাও একটু বসা যাবে। হাতে কাজ তেমন নেই। ডকে

যাওয়ারও তেমন দরকার নেই। তোমার কি ব্যাপার, আজ ব্যস্ত নাকি?

আমার সত্যিই কিছু কাজ ছিল। খানিকটা পর্দার কাপড় কিনতে হবে। একটা নতুন পাপোশ। টেবিলে পাতার জন্যে খানিকটা রঙিন প্লাস্টিকের টুকরো। ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কতকগুলো ছোট অথচ বেয়াড়া টাইপের কাজ যা প্রায় একমাস ধরে এড়িয়ে চলেছি। আসলে এই সব পাপোশ, প্লাস্টিক, পর্দা, বালতি, ঝুলঝাড়া ইত্যাদি কিনতে আমার কখনো ভালো লাগে না। তবে আজ ওগুলো না নিয়ে গেলে মিলি আমায় মেরেই ফেলবে। কাজেই চ্যাটার্জি সায়েবকে জানাতেই হল যে আজ আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। চ্যাটার্জি সায়েব তবু জানতে চাইলেন আজ না হলেও কাল পারব কিনা। বললাম, কাল নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু একটি শর্তে।

চ্যাটার্জি সায়েব হেসে বললেন, তোমার শর্ত জানা আছে। তাড়াতাড়ি ফিরবে—এই তো?

বললাম, না, ঠিক তা নয়। আপনাকে সরলবাবু আর মাধব সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। ওদের দেখে আমার ভীষণ আলাপ করার লোভ হচ্ছিল। তার পর ভেবে দেখলাম যে আলাপ হলেই যে ওরা ওদের নিজেদের কথা সব আমায় বলবে তার কোনো মানে নেই। তার চেয়ে আপনার কাছ থেকে শোনাই সোজা। কি বলেন, রাজি তো?

চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, তোমার এই ছোট ছেলের মতো গল্প শোনা রোগটা কবে যাবে বল তো রায়! এ-সব কতকাল আগের কথা। আমারই কি সব মনে আছে ছাই। ঠিক আছে, যা মনে পড়বে বলব—খুশি তো?

বললাম, না, খুশি না। যা মনে পড়বে শুধু তাই বললে চলবে না। আরো অনেক কিছু মনে করে করে বলতে হবে। এক ছটাক বাদ দিলে চলবে না।

চ্যাটার্জি সায়েব ফের হাসি টেনে বললেন, ও, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি প্রাপ্তবয়স্ক। ঠিক আছে, তোমায় একটা সম্পূর্ণ অসংক্ষেপিত সংস্করণ দেওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু।

দুঃখের বিষয় চ্যাটার্জি সায়েবকে কথা দেওয়ার পর পনেরো-বিশ দিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাই নি। অফিসেরই একটা জরুরি কাজে পরের দিনই দিল্লী চলে যেতে হয়েছিল। ওঁকে খবর দেওয়ার কোনো সুযোগই পেলাম না। ফিরে এসে শুনলাম উনি অফিস ও বাড়ি মিলিয়ে অন্তত আধ ডজন ফোন করেছেন আমি ঠিক কবে ফিরতে পারব জানতে চেয়ে। মনে হয় চ্যাটার্জি সায়েব ভয় পাচ্ছিলেন ভুলে যাবার। আমায় যা যা বলবেন ঠিক করেছিলেন তা মনের মধ্যে পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। মনে আনবার চেষ্টা করেছেন সেই সরলবাবুকে—যিনি তখন প্রায় পূর্ণ যুবক। আর সেই মাধবকে, যে তখন চ্যাটার্জি সায়েবের সমবয়সী খেলার সঙ্গী। পরে চ্যাটার্জি সায়েব নিজেই স্বীকার করেছেন যে আমার কলকাতায় অনুপস্থিতির এই ক-টা দিন উনি কেবলই ভেবেছেন ওঁর ছেলেবেলার দিনগুলো। আর বার বার মনে হয়েছে, রায় কি বিশ্বাস করবে কি দারুণ অভাবের মধ্যে সেসব দিন কেটেছে আমার। অথচ ঠিক অভাববোধটাই তখন আমার ছিল না। যেন কোনো আশাপূর্ণার বর পেয়ে পায়ের তলার সব কাঁটা ঝরা শিউলির মতো নরম হয়ে যায় ছোটবেলায়। ফিরে আসে খিদিরপুর। ডকের কোণ-ঘেঁষা, সমুদ্রগামী জাহাজের গম্ভীর ডাক দেওয়া খিদিরপুর।

জানি না কেমন করে সরলবাবুকে সরলদাদু বলতাম। আমাদের বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে ওঁদের বাড়ি যাওয়া যেত। ওঁদের বাড়ির আসল দরজাটা ছিল পাশের গলিতে ঢুকে। গলির মুখটা খুব সরু। ভেতরে ঢুকে কিন্তু গলিটা হঠাৎ বেশ চওড়া হয়ে গেছে। সেই চওড়া জায়গাটায় একটা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ছিল। ঐখানটায়

পৌঁছলেই আমার কেমন যেন মনে হত গলিটা যেন আরো একটু লম্বা হলেও হতে পারত। তা হয় নি কিন্তু। আর মাত্র গজ কয়েক গিয়ে সরলদাদুদের বাড়ির দরজার কাছেই শেষ। এটা ভাবলেই মনে কেমন একটা অস্বস্তি হত। অনেক বেঁটে লোক আছে যারা বসে থাকলে কিছুতেই ধরা যায় না। অফিসে টেবিলের ওপর থেকে তাদের সুন্দর বাড়ন্ত বলবান বুক, পিঠ, ঘাড় দেখে, সুন্দর চেহারা হিসেবে বেশ তারিফ করতে ইচ্ছে হয়। ওমা, যেই দাঁড়ানো অমনি সব খেল খতম। ওপরভাগের সঙ্গে মিল রেখে, পা দুটি ঠিক লম্বা না হয়ে হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেল। সেই লোকটাকে দেখে তখন আপনিই বলতে সাধ হয় এ আপনি কি করলেন, আপনার সম্বন্ধে যে অনেক আশা ছিল। গলিটায় মন্দিরের সামনে গিয়ে আমার ঠিক এই রকম অনুভূতি হত।

চৈত্রসংক্রান্তির চড়কের সময় মন্দিরের সামনেটায় যেন গলি ভেঙে পড়ত ভিড়ে। উপর থেকে কাঁটায় লাফ, আগুনের মধ্যে চলা, জিভের মাঝখানে কাঁটা ফুটিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করা ইত্যাদি সব চেনা খেলা দেখানো চলত। ভিড়ের মধ্যে আমরা প্রফুল্লবাবুর কোলে চেপে প্রত্যেকে একঝলক করে খেলা দেখার সুযোগ পেতাম। প্রফুল্লবাবু সরলদাদুদের উলটোদিকের চালা ঘরটায় থাকতেন। তাঁর বউ বদ্ধ পাগল। তিনি সিদ্ধেশ্বর, সোমেশ্বর দুই ছেলেকে ঠায় নড়া ধরে নিজের কাছে বসিয়ে রাখতেন। ছেলে-দুটো কাছছাড়া হলেই মরে যাবে—এটাই ছিল তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। বেচারা সিধু আর সমু। মায়ের জন্যে ওদের স্কুলে পড়াই হল না। গলি দিয়ে যাতায়াতের সময় প্রায়ই দেখতাম ওরা দরজাটা একটু ফাঁক করে জুলুজুলু চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা তখন ভয়ে দুর্গানাম জপতে জপতে দরজা পেরিয়ে পালাতাম। ভীষণ ভয় করত পাছে পাগলী বেরিয়ে আমাদের ঘাড় মটকে দেয়। শুনতাম প্রফুল্লবাবু নাকি পাগলীকে গড়গড়ার নল-পেটা করতেন তার চেঁচানি বন্ধ করার জন্যে। অথচ এমনিতে প্রফুল্লবাবু মানুষটা কিন্তু দারুণ

আমুদে আর সরল। মোটেই বদরাগী ধরনের না। চড়কের সময় ঐ ভিড়ে আমাদের কোলে-কাঁধে তুলে খেলা দেখাতেও তাঁর এতটুকু ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই।

প্রফুল্লবাবুর দরজার উলটো দিকে সরলবাবুদের বাড়িটা ছিল আমার কাছে এক আশ্চর্য দেশ। ঠিক বাড়ি যাকে বলে তা নয়। খান চারেক টিনের চালের ঘর। চালের উপর বৃষ্টি পড়লে পটপট ফটফট শব্দ হত। ঠিক একসঙ্গে কুলো পেটার মতো। মাধবের ছোট বোনটা যখন হল, আমাদের সব কুলো পিটতে ডেকেছিল। আটদিনের দিন আঁতুড়ে আটকলাই আর শিন্নি হয়। সেদিনই কুলোপেটা। উঠোন থেকে সকলে চিৎকার করে জিগেস করতাম আটকলাই বাটকলাই ছেলে আছে ভালো···। তার পর সব ছেলেরা বাতাসা আর আটকলাই পায়। এখন এই লাল ত্রিকোণের যুগে নবজাতককে আর কেউ হয়তো এ ভাবে স্বাগত জানায় না। আটকলাই খেতে আমার দারুণ ভালো লাগে। বিশেষ করে ভুট্টার শাদা বড় বড় খৈ আর গুড়ের হলদে ফুলো ফুলো মুড়কি। মাধবটা ছিল এত বোকা, যেই বললাম কুলো পেটা কাঠিগুলো নিয়ে আয়, তীর তৈরি করব, ও অমনি ছুটল কাঠি কুড়োতে। আমি সেই তালে ওর ঠোঙা থেকে খানিকটা আটকলাই ঢেলে নিতাম নিজের ঠোঙায়। মাধব বুঝতেই পারত না। সরলদাদু কিন্তু আমাদের দু জনকে সমান ভালোবাসতেন। মাধবের জন্যে যা কিনতেন আমার জন্যেও তা কেনা চাই। একবার মাধব মুনিপিসির কাছে পয়সা নিয়ে কি সুন্দর সব মার্বেল কিনেছিল। ওগুলো দেখে আমার খুব কান্না পেল। শাদার ওপর চুলের মতো সরু সরু লাল-নীল শিরা-তোলা গুলিগুলো দেখতে দেখতে আমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলাম। সন্ধের আবছা আলোয় মাধবের মুঠোর মধ্যে অনেক রঙিন কাঁচের গুলির নীল হলদে বেগুনি আর দুধে-আলতা সরোবরে ডুবে মনে হত আমি যেন কোনো কাঁচের অ্যাকুয়্যারিয়ামে তলিয়ে গেছি। আর আমার চারপাশে ঝাঁক-ঝাঁক রঙিন গোল্ড ফিস,

ব্লু-গুরামি, অরেঞ্জ-গুরামি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তখন হাতে একটি পয়সা পেতাম না। জিততাল খেলে গুলি জিতে নেবার মতো হাতের টিপও ছিল না। একবার টুসকিদি আমায় যে ক-টা গুলি কিনে দিয়েছিল সে ক-টাই পুঁজি। খেলে খেলে তার সংখ্যাও কমে গেছে আর দেখতেও একদম পচা লাগে। ওগুলো আর একটুও ভালো লাগত না। একবার আস্তে আস্তে মাধবকে জিগেস করলাম আমার দুটোর বদলে ও যদি একটা পালটাতে চায়। ও মোটেই রাজি হল না। বলল, নেপালের দোকানে আরো কত রকমের পাওয়া যায়, তুই কিনলেই পারিস। আমার তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। মনে মনে ভেংচি কেটে বললাম, আহা, কিনলেই পারিস, পয়সা যেন আমার ধরছে না! মা কখনো আমার হাতে একটি পয়সা দেন না। বাবা মাকে বারণ করে দিয়েছিলেন। কাঁচা পয়সা হাতে পেলে ছেলে খারাপ হয়ে যায়। বিড়ি-সিগারেট খেতে শেখে। সেদিন আমার কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে সরলদাতু মুনিপিসিকে খুব বকলেন। একলা মাধবকে কেন গুলি দেওয়া হল। আমায় কেন দেওয়া হল না। মাধবের মা খুব কড়া সুরে মাধবকে ধমক দিয়ে দু-একটা গুলি আমাকে দিয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন। সরলদাতুও সেখানে ছিলেন। মাধবের ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি একবার চোখ টিপলেন। তার পর আমার দিকে হেসে বললেন, ও না দিক, তুমি আমার সঙ্গে চল দাতু, আমি তোমায় ওর চেয়ে সুন্দর সুন্দর গুলি কিনে দেব। বুঝলাম সরলদাতু মাধবকে কতটা ভালোবাসেন।

সারা সকালটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরলদাতুর ভাই অমলদাতুর কাঠ কেটে খেলনা তৈরি দেখতাম। ওঁরা চার ভাই। তার মধ্যে সবচেয়ে মজার লাগত অমলদাতুকে। কত কি যে করতেন, দেখতে দেখতে আমি অবাক হয়ে যেতাম। কাঠের খেলনা তৈরি ছাড়াও আরো অনেক কিছু জানতেন উনি। বেশ ভালো তবলা বাজাতেন। ক্যারাম খেলতেন দারুণ। আর কত যে পায়রার নাম—জাত জানতেন, একটা পায়রার বই হয়ে যায়। ঘাড় পর্যন্ত

টানা ঘন ব্যাকব্রাশ করা চুল, বাঁকা গলার বড়ুয়া-কফ্ পাঞ্জাবি আর মিলের পাতলা ধুতি এবং বাক্‌স্‌স্কিনের শাদা নিউকাট—এই ছিল অমলদাতুর প্রাত্যহিক বেশভূষা। খুব শৌখীন ধরনের লোক ছিলেন অমলদাতু। অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। নিজের খেলনা বিক্রি করে তো ছাই টাকা হত। বাজার তখন জার্মানি, জাপানি খেলনায় ভর্তি। কে কিনবে ঐ সব হাতে রঙ করা গোদা গোদা খেলনা। পুঁজি মোটে একটা প্লাই উড্ কাটা জার্মানি মেশিন। সকাল থেকে সেটা চালিয়ে কাঠগুলো সাইজ করে কাটা হত। মাধব আর আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠায় দেখতাম। কখন কখন ধুলোভর্তি, কালির নীল ছোপ দেওয়া সতরঞ্চিতে বসে ক্যারাম পিটতাম। বেলা বাড়লে সরলদাতু জাহাজ থেকে ফিরতেন। খাবার সময় আমাদের কাছে ডাকতেন। নারকোল নাড়ু আর রসকরা দিতেন। মাধবটা খেত না। পালিয়ে যেত। আমার কর্পূরের গন্ধ দেওয়া রসকরা দারুণ ভালো লাগে। আমি পুরোটা গালে ভরে দিতাম। গাল ফুলে শক্ত ইঁট। মুনিপিসি গালটা জোরসে টিপে দিতেন। খুব মজার করে ডাব কাটতে পারতেন সরলদাতু। কচি ডাবের গায়ে পকেট-ছুরি দিয়ে একটা নিরেট চৌকো কিউব কেটে খুলে নিতেন। জলটা খাওয়া হয়ে গেলে ফের কিউবটা ডাবের গায়ে ঢুকিয়ে দিতেন। দেখলে মনে হত ডাবটা বুঝি কাটাই হয় নি।

অনেক অনেক জাহাজের গল্প বলতেন সরলদাতু। জন্মেছিলেন কাশীতে। মানুষ হয়েছেন লাক্ষ্ণৌয়ে। লাক্ষ্ণৌয়ে সরকারি টেকনি-ক্যাল স্কুলে বছর তিনেক পড়েছেন। মা মারা যাওয়ার পর বাবার সঙ্গে সবকটা ভাই কলকাতা চলে এল। তার পর চলল একটানা জলের পোকার মতো গঙ্গায় ঘোরা। টালিক্লার্ক হিসেবে প্রথম যখন জাহাজে পা দিয়েছিলেন তখন সরলদাতু আঠারো-উনিশ বছরের যুবক। পোর্টে তখন অতশত নিয়মকানুন ছিল না। কাজ করতে চাইলে হাজার পথ খোলা। কাজের কোনো ভাগ নেই। যার যা

খুশি করতে পারে। তবে ফাঁকি ছিল না। খাটতে হতই। খিদির-পুরের নরেন মাস্টার তখন ট্যালিক্লার্ক জোগান দেবার কনট্রাক্ট পেয়েছিলেন। উনিই সরলদাদুকে দত্তবাবুদের কম্পানিতে দিলেন ঢুকিয়ে। তার পর সরলদাদু এই জাহাজী লাইনে নিজের চেষ্টায় কত রকম কাজ যে শিখেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। জাভা থেকে তখন জাহাজ ভর্তি ভর্তি চিনি আসত কলকাতায়। ঐ সব জাভা জাহাজে প্রথম প্রথম সরলদাদু বোট ইন্‌স্‌পেক্টারের কাজ করতেন. তার পর হলেন জাহাজের প্রধান কেরানী। কিন্তু এ-সব ছেড়ে হঠাৎ উনি স্রেফ ফোরম্যানি শুরু করলেন নানা জাহাজে। শেষ পর্যন্ত তাও যখন পোষাল না, তখন দত্তবাবুদের ধরে তাঁদের বড় সুপারভাইজার হয়ে গেলেন। এতবার এখান-সেখান করা মানেই যে উনি দারুণ খামখেয়ালি প্রকৃতির মানুষ তা নয়। আসলে তখন ছিল নো ওয়ার্ক নো পে-র যুগ। ফলে, একটি পদ আঁকড়ে বসে থাকলে পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকতে হত। অথচ সরলদাদু জাহাজের অন্ধি-সন্ধি ঘুরে কাজ শিখেছিলেন বলে যে কাজ হাতে নিতেন বুক ফুলিয়ে জোরের সঙ্গে তা শেষ করতে পারতেন। সে হিসেবে দু হাতে টাকাও আনতেন সংসারে।

তখনকার দিনে শাদা চামড়ার নাবিক মাত্রেই ছিল বেজায় বদরাগী আর ছোটলোক ধরনের। ভারতীয়দের ব্লাডি ছাড়া ডাকত না। কেউ এতটুকু ভদ্রতার ধার ধারত না। ইটালিয়ান-গুলো খোলা ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে স্রেফ ন্যাংটো হয়ে চান করত। আর তাই দেখবার জন্যে কালা আদমিরা ভিড় করে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ওদের কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। জার্মানগুলো বাজার থেকে গরু এনে বিরাট বিরাট হাতুড়ি দিয়ে তাদের মাথা ফাটাত। মাংস কেটে কেটে বরফের বাক্সে ঢুকিয়ে রাখত। রোজ খানিক খানিক বার করে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলত। অধিকাংশ নাবিক ছিল এই রকম হিংস্র ধরনের এবং গোঁয়ার আর গো-মুখ্য। ওসব মার্জিত রুচি বা শিক্ষা দীক্ষার ধার ধারত না কেউ। সেই থেকে নাবিকদের

সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটি বদ্ধ ধারণা থেকে গেছে, সে ধারণাট হল, ওরা অশিক্ষিত বর্বর কামার্ত পশু। বহু যুগ কেটে গেছে। এখন জাহাজের গড়নই বদলে গেছে। রেডিও, টিভি, টেলিফোন, বার লাইব্রেরি, খেলার-ঘর, হাসপাতাল সব কিছু একটি জাহাজে। পুরোটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত। ডাঙার কাজের চেয়ে পয়সা আর ওভারটাইম বেশি। ফলে এখন বহু অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের ভালো ছেলে জলে ভাসার কাজ বেশি পছন্দ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ মার্জিত রুচির ভদ্রলোক এবং শিক্ষিত তো বটেই। তবু এখনো সমস্ত নাবিক সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলায় নি। তবে এটাও ঠিক যে ওদেরও বেশিরভাগ খুব বেশি পালটায় নি। কিন্তু তারা অধিকাংশই খালাসী। অফিসার নয়। সরলদাদুর মুখে জাহাজের এইসব নানা রকম ঘটনা শুনতে ভারি ভালো লাগত। একটা ইংরেজদের জাহাজের এমনি ঘটনা সরলদাদু এত সুন্দর করে বলেছিলেন যে মনে হচ্ছিল আমরা যেন জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে গোটা দৃশ্যটা দেখেছি।

পিকনিক নামের একটা অ্যাংলো ফোরম্যান ছিল। তার সঙ্গে একদিন জাহাজের জুনিয়ার অফিসারের কি যেন কথা কাটাকাটি হল। হঠাৎ ত্বম করে ইংরেজ-বাচ্চা মারল পিকনিককে এক ঘুষি। পিকনিক নিজে কিন্তু একজন ভালো বক্সার ছিল। হঠাৎ ঘুষি খাওয়ার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই দড়াম করে সোজা ডেকের ওপর চিৎপাত। কিন্তু তার পরেই মুহূর্তের মধ্যে উঠে রুখে দাঁড়াল ইংরেজ অফিসারের বিরুদ্ধে। এদিকে ডেকের সবাই খুব মজা পেয়ে গেল। শুধু ডেকবয় আর সেলারগুলোই নয়, স্বয়ং ক্যাপ্টেন, চীফ অফিসার পর্যন্ত মজা দেখতে নেমে এল। খুব জোরসে দমাদ্দম চা-লোডিং চলছিল জাহাজে। এই মারামারির হুজুগে সব গেল মাথায় উঠে। ক্যাপ্টেনের আদেশে তিন নম্বর হ্যাচ বন্ধ করে পুরো হ্যাচবোর্ড লাগিয়ে তার ওপর ওদের দু জনকে তুলে দেওয়া হল লড়বার জন্যে। বেশ সুন্দর একটা ফাঁকা রিং তৈরি

লোক দাঁড়িয়ে পড়ল লড়াই দেখবার জন্যে। প্রথম রাউণ্ডে পিকনিক স্রেফ দাঁড়িয়ে মার খেল। বুঝে নেবার চেষ্টা করল সায়েবের উইক পয়েণ্টগুলো। তার পর আর যায় কোথা। কি মার কি মার! ঘুষিয়ে ইংরেজ-বাচ্চাকে একেবারে ডেকে লম্বা করে ছেড়ে দিলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কালা আদমির হয়ে কিন্তু কোনো সাদা চামড়া ক্ষেপে গেল না। দু জনকে কাছে ডেকে ক্যাপ্টেন হাত মিলিয়ে দিল। সেই সঙ্গে পিকনিক আমন্ত্রণ পেল বীয়ারের। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, বাঁ চোখটা ফুলে টকটকে লাল তবু বীয়ারের নাম শুনে পিকনিকের একগাল হাসি। দু চোখে খুশি আর ধরে না। সে রাতে ব্যাটা প্রায় পাঁচ বোতল বীয়ার টেনেছিল এক দমে।

বীয়ার সম্বন্ধে সরলদাদুর যে একটা গোপন দুর্বলতা ছিল তা আমি পরে বুঝেছিলাম। অবশ্য জাহাজী লাইনে আছে অথচ বীয়ারে টান নেই এমন মানুষ ভূ-ভারতে খুব কমই আছে। মাধবের কাছে শুনতাম সরলদাদু নাকি রাত্তিরে বাড়ি ফিরে প্রায়ই দিদিমার সঙ্গে বেশ চেঁচামেচি করতেন। বেচারী দিদিমা কাঁদতেন আর মাধবের ভীষণ রাগ হত বাবার উপর। ঘুম-ঘুম মাথায় কেমন একটা ডাব-কাটা কাটারির ছায়া ভেসে আসত। মনে হত, এক কোপে বাবার মোটা মোটা হাত দুটো কেটে দেবে। তা হলে বাবা আর কোনো দিন মায়েব শাড়ি সায়া ধরে অমন হিড়হিড় করে টানতে পারবেন না। সরলদাদুর বিরাট চেহারাটার তুলনায় দিদিমার চেহারাটা ছিল এক চিলতে। খুব বেঁটে রোগা আর ছোটখাটো মানুষটি। তবে গায়ের রঙ-টা ছিল বেশ ফরসা। মাধবের ছোট বোন তানি পেয়েছিল মায়ের গায়ের রঙ আর ফুটফুটে চেহারা। আমাদের সঙ্গে রোজ তানিও যেত পদ্মপুকুরে খেলতে। ওখানে বিকুসায়েবের মেয়ের সঙ্গে ছিল ওর খুব ভাব। বিকুসায়েবের পুরো নাম বোধহয় ছিল ব্যারিস্টার বঙ্কিম ঘোষ। দু পুরুষের মস্ত বড়লোক

ওরা। পদ্মপুকুরের পাশেই বিরাট টানাবারান্দাওলা বাড়ি, প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-ঘেরা বাগান। পাঠান সৈন্যের মতো সারি সারি বিলিতি পামগাছ বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। হাওয়ায় তাদের ঝাঁকড়া মাথার চুল উড়ছে। মাঝখানে একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ি বেয়ে কত লতা আর কত রঙের সব পাতাবাহার। চারি দিকে ঘুরঘুট ছড়ানো পথ। টুকটুকে লাল একটা রেসিং গাড়ি ছিল। ট্যুরার। ভারি নিচু আর লম্বা। রূপালি অ্যালুমনিয়ামের সরু সরু শিক দেওয়া ঝকঝকে ঢাকা। গাড়িটা একটা নরম ল্যাপডগের মতো নিঃশব্দে গাড়িবারান্দার তলায় ঘুমিয়ে থাকত। বিকু সায়েব ছিলেন যাকে বলে একেবারে কড়া সায়েব। তাঁর মেয়ের নাম টুলি। টুলি ছিল বিকু সায়েবের আদুরে খুকি। এত আদরে-গোবরে মেয়ে যে কি করে ভালো হয় তা আমার কাছে আজও বিস্ময়। সেই টুলি হল তানির প্রাণের বন্ধু। ভাব তো নয়, একেবারে চুণে হলুদে জমাট বাঁধা। টুলির সখ তানির সঙ্গে পুতুলের বিয়ে দেবে। যেমন সখ তেমনি কাজ। চলল বিরাট তোড়জোড়। যত বা মিষ্টি, তত বা ঘটা। বড়লোকগুলোর ব্যাপার-স্যাপার দেখতে এত মজা লাগে। কোথাও এতটুকু খুঁত রাখার উপায় নেই। তত্ত্ব নিয়ে গিয়ে আমরা সবাই চার আনা করে পেয়েছিলাম। সুন্দর খেলার ফার্নিচার পাঠিয়েছিল বিকুসায়েবের বাড়ি থেকে। জাপানে তৈরি একটা ভারি সুন্দর দু তলা বাড়ি। বাড়িটার কথা আজও ভুলি নি। হাল্‌কা ছাই রঙের বারান্দা। ছোট ছোট লাল নীল ডুমের মালা টাঙানো। ফিকে হলুদ দেওয়াল আর সুরকির মতো লাল ছাদ। ব্যাটারিতে যখন ডুমগুলো জ্বলত তখন যে কি সুন্দর দেখাত! আমাদের সকলের কল্পনায় ছিল ঠিক অমনি একটা বাড়ি। আমি এক দুর্বল মুহূর্তে মুখ ফসকে তানিকে ঐ বাড়িটা চেয়ে ফেলেছিলাম। তার পর থেকে তানি জীবনে আর ঐ বাড়িটা বের করে নি। আমি ঘরে ঢুকলেই দেওয়াল আলমারি বন্ধ। শুধু যে রাক্ষস টাইফয়েডে তানি আমাদের ছেড়ে চলে গেল, সেই

অসুখের শেষ দিকে তানিকে অন্যরকম দেখেছিলাম। ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার মাথা ন্যাড়া করতে বলেছিল। শুনে কি কান্না তানির। কিন্তু বাধা দেওয়ার শক্তিই ছিল না। ন্যাড়া মাথা নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা নিজের মৃত চুলগুলোর দিকে এত করুণভাবে তাকিয়েছিল তানি, ভোলা যায় না। ন্যাড়া মাথায় তানিকে যেন আর চেনাই যায় না। শুকিয়ে আসা নীল মুখের মধ্যে শুধু ড্যাবড্যাবে নিষ্প্রাণ চোখ। বড় বেশি এলোমেলো আর অস্থির দৃষ্টি ফুটে উঠত মাঝে মাঝে। ভয় করত। মনে হত শাদা সমেত চোখের তারাটা যেন চোখের গর্তের মধ্যে থাকতে চায় না। আবার এক এক সময় একেবারে স্বাভাবিক। সেই দুপুরে আমায় বলেছিল, ঐ পুতুলের বাড়িটা তোমার খুব পছন্দ, না বিমলুদা? ওটা তুমি নিয়ে যেও। আমার আর চাই না।

ভালো করে দেখলাম তানির চোখ একেবারে খটখটে শুকনো। ভাবছিলাম বাড়িটা আমাকে নিয়ে নিতে বলার সময় একটুও কান্না পেল না তানির! বললাম, ধ্যাৎ, আমি নেব কেন। তুই ভালো হয়ে উঠলে সারা বাড়িটায় আকাশ-নীল রঙ করে দেব। আর ডুমগুলো পালটে নতুন ডুম লাগিয়ে দেব। তখন দেখবি কি সুন্দর লাগবে বাড়িটা!

তানি অদ্ভুত একটা ব্যাঙ্গের হাসি হাসল। বলল, ঠিক আছে তুমি রঙ কোরো। কিন্তু আমি জানি আমি আর থাকব না। মাও জানে। রোজ লুকিয়ে কাঁদে। আমি না থাকলে দাদা ঠিক ওটা বিক্রি করে দেবে। দাদা অনেকবার চেয়েছে ওটা। প্রায়ই ওর এখন অনেক টাকার দরকার। আমি কিছুতেই দেব না ওকে। তোমার কাছে থাকলে তবু বাড়িটা থাকবে।

আমি সেদিন আর একটি কথা বলতে পারি নি। সে-বাড়িটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। শুধু সে-বাড়িটা নয়। তানিদের সারা বাড়িটাই যেন কেমন করে কোথায় হারিয়ে গেল। অদ্ভুতভাবে সব বদলে যেতে লাগল। বদলে গেল মাধবটা। তানি মারা

যাওয়ার পর সরলদাছুর সব আদর গিয়ে পড়ল মাধবের উপর। মাধব সেটা খুব ভালোই জানত আর তার সুযোগ নিতে শুরু করল দারুণভাবে। প্রায়ই স্কুল পালাত আর যত সব পচা গুণ্ডা ছেলের দলে ঘুরে বেড়াত। ছুটির সময় আবার লক্ষ্মীছেলের মতো বাড়ি ফিরে আসত। একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। কে যেন একটা মাধবের মাকে বলেছিল যে সে নাকি মাধবকে পানবাজারের দোকানে দোকানে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে। নিশ্চয়ই মাধব স্কুল পালিয়ে সারা দুপুর টো টো করে বেড়ায়। শুনে মাধবের মা একেবারে রেগে আগুন। সে সময় মাধব কাছে থাকলে তাকে কেটে দু খানা করে ফেলতেন। সেদিন মাধবের সঙ্গে আমার হেমচন্দ্র পাঠাগারের কাছে দেখা। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ির দিকে আসছিলাম। ওদের গলির মোড়েই দেখলাম সরলদাছু দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখতে পেয়েই মাধবকে বললেন, স্কুল পালিয়ে খুব তো আড্ডা মেরে বেড়ানো হচ্ছে। বাড়ি ঢুকলে মা আর আস্ত রাখবে না সে খেয়াল আছে। প্রথমটায় মাধব সত্যিই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার পরেই ওর সেই ডাহা মিথ্যে কথা বলার অপূর্ব ক্ষমতাটা ফিরে পেল। এটা ওর এমন একটা অসাধারণ ক্ষমতা যে কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারে না যে মাধব বানানো কথা বলছে। বেশ গম্ভীর গলায় মাধব বলল, মোটেই আমি স্কুল পালাই না। বিমলের হঠাৎ শরীর খারাপ হল, বমি করছিল। ওকে বাড়ি পৌঁছুবার জন্যে আমি এক পিরিয়ড আগে অনন্তবাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছি।

আমার অবস্থা তখন কাহিল। মুখে তখনো সত্যর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ছোলাভাজা। চোখে-মুখেও শরীর খারাপের এতটুকু নামগন্ধ নেই। তবু, কি করি কি করি ভাবছি। সরলদাছু কিন্তু মাধবের কোনো কথায় কান দিলেন না। গলার স্বরটা নামিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে মাধবের কানে কানে বললেন, ওসব কথা এখন ছেড়ে দাও। ইতিহাস পরে শুনিয়ো। মোটেই এখন

বাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো না। মা হাড় গুঁড়ো করে দেবেন মনে থাকে যেন।

পকেট হাতড়ে সরলদাদু চার আনা পয়সা বার করলেন। বললেন, রাত্তিরের আগে বাড়ি এসো না। বিমলদের বাড়িতে থেকো। এখন যদি খিদে পায় সন্দেশ কিনে খেও—চার আনাটা রাখো।

সরলদাদুর হাত ধরে অস্ফুট গলায় মাধব শুধু জিগেস করেছিল, তুমি মাকে কিছু বলে দেবে না তো।

কোনো উত্তর না দিয়ে, মাধবের চুলে হাত বুলিয়ে সরলদাদু গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মাধব কিন্তু পরমুহূর্তে সব ভুলে গেল। নেপালের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমার হাতে একটা টান মেরে বলল, তুই একটু দাঁড়া, আমি একছুটে আসছি।

সত্যিই একছুটে মাধব ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে আমায় টেনে নিয়ে গেল মেয়ে-ইস্কুলের পাশের গলিটায়।

একটা সিগারেট টানবি বিমল? পানের সঙ্গে যা জমে না। প্যান্টের পকেট থেকে তোবড়ানো দুটো সিগারেট বের করল মাধব। আমাদের বাড়িতে মেজ জ্যাঠার খাওয়া সিগারেট একবার ছাইদানি থেকে তুলে খেয়েছিলাম। একদম জঘন্য লাগে আর বড্ড কাশি পায়। আমি খাব না বললাম। মাধব আমার কথায় কান দিল না। বলল, বা-রে, তোর জন্যে কিনলাম, এখন কচি খোকার মতো খাব না বললেই হল—মামাবাড়ির আবদার! নে নে ধরা।

আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, ঠিক আছে, দে।

আমি জানতাম ধোঁয়া গিলতে আমি ঠিক পারব না। তাই এন্তার টানছিলাম আর ফু ফু করে ধোঁয়া ছাড়ছিলাম। মাধবও যে খুব ভালো টানছিল তা নয়। তবে মাঝে মাঝে বেশ জোর টানছিল আর আকাশের দিকে মুখ তুলে নাক-মুখ দিয়ে হু হু করে ধোঁয়া ছাড়ছিল। আকাশটা অদ্ভুত হলদে আলোয় ভরা। তার

গায়ে সিগারেটের নীলচে ধোঁয়া আর মাধবের মুখ-চোখ চুলের কালো রেখা—সব মিলে সেদিনের একটা সুন্দর ছবি চোখে রয়ে গেছে। মাধব জিগেস করল, তুই নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করতে পারিস ?

ভেবে দেখলাম মুখটা বন্ধ রাখলে আপনিই তো ধোঁয়া নাক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই বুক ফুলিয়ে বললাম, কেন পারব না।

মাধব বলল, বার কর দেখি।

মাধব অবাক হয়ে বলল, তুই নিশ্চয়ই সিগারেট খাস।

আমি যেন ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিতে চাই না এমনভাবে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিলাম। বললাম. তুই আমায় কি ভেবেছিস কি। কোথাকার একটা পচা বিচ্ছিরি গলিতে আনলি। ওগুলো কি সব পড়ে আছে রে ?

মাধব বলল, সরে আয়। ওসব মেয়েদের কী সব নোংরা।

আমি বললাম, তুই কি করে জানলি।

মাধব বলল, তুই মণিকে চিনিস তো ? আমায় মণি বলেছে। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে বলল, আরে মণিকে চিনিস না, তুই একটা কিচ্ছু না।

সুবোধবাবুর মেয়ে মণি রে। এই স্কুলেই তো পড়ে। মেয়েটা দারুণ। যা বুক না—।

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার তখনো ঠিক এই ধরনের চোখ গজায় নি। বিশেষত ফ্রকপরা স্কুলের মেয়ে সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহলই ছিল না। শাড়িপরা বড় বড় মেয়েদের দেখতে আমার দারুণ ভালো লাগত। তাদের শায়া-শাড়ির ঘেরে ঠিক কোথায় কতটা রহস্য বুঝতাম না। শুধু ইচ্ছে করত ওদের সবটা নেড়ে-চেড়ে দেখি। কিন্তু এই সব ফ্রক-পরীদের সম্বন্ধে আমার কোনো আগ্রহই ছিল না। মাধবের কথায় তাই স্রেফ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সেই হলদে আকাশ, কনে-দেখা আলো, সবুজ শ্যাওলা পাওয়া গলি,

নীল ধোঁয়া সব মিলে মনটা বড় নরম হয়ে গিয়েছিল। না হলে মারতাম মাধবের পেছনে এক লাথি। সুবোধবাবুর যে মেয়েটার কথা মাধব বলল, সে মেয়েটাও ছিল তানির প্রাণের বন্ধু। মাঝখানে ওর বাবা অনেকদিন কলকাতা ছেড়ে বিহারে বদলি হয়েছিলেন। তাই ভুলেই গিয়েছিলাম ওদের কথা। ফিরে এল যখন তানি তখন নেই। তানির বন্ধু সম্পর্কেও মাধবের এই চামড়াপোড়া মনোভাব দেখে আমার বমি পায়। সেই থেকেই মাধবকে আমি মনে মনে দূরে সরিয়ে ফেলতে শুরু করেছিলাম। তবু একেবারে ওর সঙ্গ ছাড়া আমার পক্ষে একটু মুশকিলের ব্যাপার ছিল। কারণ, জাহাজ।

সরলদাদু ওকে প্রায়ই জাহাজে নিয়ে যেতেন। একদিন আমিও সঙ্গে জুটলাম। সেই আমার প্রথম জাহাজে চড়া। তখন কি একবার ভুলেও ভেবেছি যে বাকি জীবনটা আমার এই জলের দোলাতেই কাটবে। দেখতে দেখতে জাহাজে চড়াটা একটা নেশার মতো হয়ে গেল। শুধু ঘাটের জাহাজ নয়, মাঝগঙ্গার জাহাজেও চড়তে শিখলাম। বেশ মনে পড়ে মাঝগঙ্গার জাহাজ। খাড়া তারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডিঙিতে উঠতে হয়। আমি দুটো হাত যতটা বাড়ানো যায় বাড়িয়ে দু পাশের দড়ি ধরে পায়ে পায়ে নামছি। উপরের ডেক থেকে সরলদাদু চিৎকার করে উঠলেন, ওকি ওকি বিমল, এত খাড়া সিঁড়িতে দু পাশের দড়ি ধরে কেউ নামে না। পাশ ফিরে একপাশের দড়ি ধরে নাম।

তখনকার চোখটাই ছিল শুধু বিস্মিত হবার। যা দেখতাম অবাক হতাম, ভালো লাগত। ডিঙির মধ্যে মাঝিদের রান্না দেখতে দেখতে জিভে জল আসত। ছুরিতে মাছ কেটে, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর যেন কী কী সব দিয়ে ডকের জল মিশিয়ে যা বানাত তার গন্ধেই আমার অমৃত মনে হত। অথচ কাঁচা কাঠের ধোঁয়া তাকায় কার সাধ্যি। চোখ জ্বলে হু হু করে জল বেরুচ্ছে। জাহাজের ভেতরে সজ্জিত কেবিনে অফিসারদের বউ-ছেলের ছবি। বউ সেই সাবেকি

ঢংয়ে শাদা ওয়েডিং গাউন পরে ফুলের তোড়া হাতে দাঁড়িয়ে। একদিন হয়তো সায়েবের কাছে ঐ স্মৃতি ছিল খুব প্রিয়। কিন্তু দিনের পর দিন স্মৃতি রঙিন হয় না, মলিন হয়। তার পর শুধু পুরনো চুড়ি, হার বা আংটি মাদুলির মতো অঙ্গের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলা। কোথায় থাকে তখন প্রিয় স্মৃতি আর বউ। ফোরম্যান দাস বলত, ওসব প্রেম-ট্রেম অনেক দেখেছি। ওরা সাত ঘাটের মেয়েমানুষ চেখে ঘুরে বেড়ায়। ওদের আবার প্রেম ওদের আবার বিয়ে। ঘাটে একবার জাহাজ ভিড়লে হয়। যেন আশ্বিন মাসের খ্যাপা কুকুর।…

বেড সাইড টেবিলের উপরে একটা ছেলের ছবি। জানলার ফ্রেমে বসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে ছেলেটা আপেল খাচ্ছে। গায়ে তার সকালের ফিকে রোদ। চীফ হয়তো জানেই না আজও ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা। বেঁচে থাকলেও সে তার বাপকে ঠিক চেনে কিনা তাই বা কে জানে। জলের পোকারা জলে ঘুরছে অথচ ডাঙার দূরত্ব বছর দিয়ে মাপতে হয়। যখন দেখা হয় মাপে মেলে না। অনেকের সঙ্গে দেখাই হয় না।

এ-সব কথাই রোজ সরলদাদুর কাছে গল্পে শুনতাম। সে-সব আগের কালের কথা। তখন আমি হয়তো জন্মাই নি। যদিও ইতিহাসে একটুও টান নেই আমার, তবু গল্প শুনতে ভালো লাগত, মানুষজনের কথা শুনতে পেতাম। শাজাহান অথবা তাঁর তাজমহলের চেয়ে আমার বেশি জানতে ইচ্ছে করে তাজমহলের কোনো-এক মজুরের বউ কেমন করে তার স্বামীকে স্বাগত জানিয়েছিল যেদিন তাজের নির্মাণকাজ শেষ হল। কিংবা সেই শেষদিন আকাশের রঙ কেমন ছিল। সরলদাদুর গল্পে সেই আকাশ ছিল, রঙ ছিল আর ছিল কত নাম না জানা মানুষজনের কথা।

এ দেশ থেকে তখন খুব পাট, চা, ম্যাঙ্গানিজ-ওর, পিগ-আয়রন আর হর্তুকি যেত বাইরে। একেবারে পুরো জাহাজ মাল। লোকে খাটতেও পারত তখন জান লড়িয়ে। এক এক শিফট-এ একটি মাত্র গ্যাং দিয়ে একশো টন পাট তোলা তখন কিছুই না। যে

গ্যাংয়ের লোক কাজ করতে চাইত না, বা ফাঁকি দিত, তার তক্ষুণি রোজ বন্ধ হয়ে যেত। প্রত্যেক লোককে ঠিক নজরে রাখার জন্যে তখন সব ঘাট-সর্দার ছিল। আজিজ, চিন্তামণি, আলিজান এই রকম সব সর্দারের চেহারা আর ব্যবহার ভোলা যায় না। আজিজের ছিল বুক অবধি লম্বা রূপালি দাড়ি। বিশাল চওড়া বুক। পানের রসে লাল টকটকে ঠোঁট। মাথায় একেবারে নিখুঁত শাদা কাপড়ের টুপি। রমজানের সময় সারাদিন উপোসের পর রোজা খুলত নিজের হাতে কাটা ফল আর মোষের শিংয়ের মতো বাঁকা কাঁকরেল-মুড়ি দিয়ে। বন্ধ হ্যাচের উপর সবাই সারবন্দী নামাজ পড়তে বসত হাঁটু মুড়ে। শেষ চৈত্রের লাল জ্বলন্ত আকাশের পটে ওদের কালো কালো প্রার্থনার ছবি এখনো জাহাজে চোখে পড়ে।

একবার একটা জাহাজে আজিজ আর চিন্তামণির দলের লোকেরা চট, পাট, হর্তুকি দিয়ে প্রায় ১১ হাজার টন বোঝাই করে ফেলেছিল। জাহাজটা জার্মানির। একেবারে ঠাসা বোঝাই জাহাজ। জাহাজটা সেইল করার পরেই খবর এল ডায়মণ্ডহারবারের কাছেই মাডপয়েন্টে জাহাজ গেছে আটকে। জাহাজের মাল কিছুটা খালাস করে জাহাজ হালকা করতে না পারলে জাহাজটাকে আর ভাসানো অসম্ভব। সরলদাদুরা লঞ্চে করে গেলেন জাহাজের মাল খালাস করতে। জাহাজেই থাকা-খাওয়া-শোয়া। অত মাল খালাস করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। প্রায় দশদিন ওঁদের ওখানে থাকতে হয়েছিল। তখন পাট লোড হত একেবারে স্ক্রু-টাইট। মানে, উপর থেকে একটা খুচরো পয়সা ফেলে দিলে লোহার হোল্ড থেকে তা সহজেই তুলে আনা যেত। অর্থাৎ, একটা থেকে আর একটা গাঁটের মধ্যে একচুলও ফাঁক থাকত না। এই সাংঘাতিক জমাট লোডিংও ভাঙতে হল। ধীরে ধীরে জাহাজ ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেনের মুখে ফুটল হাসি।

অথচ তার আগে জাহাজের যা অবস্থা! ইঞ্জিন-ঘর পর্যন্ত জলের তলায় ডুবে। চপলা নামে পোর্টের একটা সেভিং জাহাজ গিয়েছিল

উদ্ধার করতে। চপলার সঙ্গে এই জাহাজের স্টিম পাইপ জুড়ে তবে উইঞ্চ চলল, ডেরিক ঘুরল, মাল খালাস হল। কিন্তু বেচারী চপলা একজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই গেল ডুবে। ঐ বিরাট জাহাজটাকে টেনে আনতে আনতে জলের প্রবল টানে চেন ছিঁড়ে চপলা গেল ভেসে। তার পর প্রবল ঢেউয়ের এলোমেলো ধাক্কায় ভেতরে জল ঢুকে, ভেঙে, চপলা তলিয়ে গেল। অথচ জার্মান জাহাজটা ফের কলকাতায় এসে নিখুঁত ড্রাই-ডকিং করে, ফের মাল বোঝাই করে হাসতে হাসতে দেশে ফিরে গেল। শুধু তাই নয়, বছর না ঘুরতেই আবার মাল বোঝাই করে কলকাতায় এসে হাজির। কিন্তু সেই তার শেষ আসা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে সারা দুনিয়ায়। কোনো রকমে মাল খালাসের কাজ সেরে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে বিশেষ মাল না নিয়েই জাহাজটা গেল পালিয়ে। তখন ব্যাপারটা কেউ ঠিক বুঝতে পারল না। জাহাজটা যেদিন মার্মাগোয়ায় পৌঁছল সেদিন ছিল একটা রবিবার। সেদিনই জানা গেল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এখান থেকে সরলদাদুর জীবনেও নতুন অধ্যায় শুরু। যুদ্ধের পর আর সেই টিনের চালের গরীব সরলদাদু আর সে মানুষ রইলেন না। লক্ষ্মী এল ঘরে। কিন্তু সে-সব পরের কথা। তার আগে সরলদাদুকে নিয়ে আরো একটা সাংঘাতিক ঘটনার কথা মনে আসছে বারবার।

সেদিনও আমরা দু জনে সরলদাদুর সঙ্গে জাহাজে উঠেছিলাম। ক্যালকাটা জেটিতে ছিল জাহাজটা। কি মাস ছিল ঠিক মনে নেই। তবে বসন্তকাল ছিল সেটা ঠিক খেয়াল আছে। পরিষ্কার নীল আকাশের তলায় হু হু করে লোহা নামছে জাহাজ থেকে। তখন জাহাজ বোঝাই রাজ্যের লোহা আসত কলকাতা বন্দরে। বিভিন্ন ধরনের লোহা। জয়েস্ট, চ্যানেল, টি-আয়রন, মোটা প্লেট ইত্যাদি রকমারি লোহার আমদানি। চেন সিলিং দিয়ে সব হু হু করে নামানো হচ্ছিল ওভারসাইডের বড় বড় গাধাবোটে। ঐরকম প্রকাণ্ড এক একটা নৌকাতে প্রায় দেড়শো-দুশো টন ধরে যেত অক্লেশে।

সরলদাত্থ হ্যাচের ধারেই দাঁড়িয়ে ডেকের উপর থেকে হোল্ডের ভেতরের লেবারদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে তাড়া লাগাচ্ছিলেন। আমরা হ্যাচ থেকে অনেক দূরে দুতলায় অফিসারদের ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে কেবিনের পোর্ট-হোলের কাঁচে চোখ দিয়ে ভেতরে গোরাদের কীর্তিকলাপও দিব্যি উঁকি মারছিলাম। কেবিনের ভেতরে তখন অফডিউটির নাবিকরা দারুণ হুল্লোড়ে মত্ত। টেবিলের উপরে লাল শেডে ঢাকা আলো। দেওয়ালে অনেক ন্যাংটো মেয়ের ছবি আর ক্যালেণ্ডার। অজস্র সিগারেট আর ফেনা-টলমল বড় বড় বীয়ারের গ্লাস। একেবারে আদুল গা আর শুধু ছোট্ট একফালি লিঙ্গাবরণ বাঁধা এক পাল টকটকে লাল মুসকো গোরা টেবিল ঘিরে হাসছে, চেঁচাচ্ছে আর গান গাইছে। বাইরে থেকে আমরা ঠিক স্পষ্ট কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু টুকরো টুকরো দৃশ্যের ঝিলিক। তখন প্রায় সন্ধে হয়েছে। হঠাৎ ডেকে প্রচণ্ড হৈ চৈ শুনে আমি ভয়ে সেদিকে ঘাড় ফেরালাম। মাধবের চোখ তখনো পোর্টহোলে আটকানো। দারুণ খুশি খুশি মুখে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করছে, উঃ, বড় হয়ে একবার যদি সেলার হতে পারি তা হলে দেখিস, আমি ঠিক জাহাজে করে পালাব।

আমি ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা মারলাম। ডেকে গোলমাল আর ভিড় তখন দ্বিগুণ। এত দূর থেকে আমরা ব্যাপারটার কিছুই ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলাম না। শুধু দেখছি মাথা আর মাথা। চারিদিক থেকে সবাই ছুটেছে সরলদাত্থ যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইদিকে। অর্থাৎ, দু নম্বর হ্যাচের কাছটায়। ঐ মারমুখী জনতার চীৎকার থেকে শুধু কিছু কিছু গালাগাল আর 'মার শালাকো' ছাড়া তেমন কিছু ধ্বনিও কানে আসছে না। ব্যাপারটা ভালো করে দেখার জন্যে আমরা তরতর করে আপার ডেকে উঠে গেলাম। এটাই ক্যাপ্টেনের ব্রিজ। ওখানেই একটা সারেঙের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছে শুনলাম চেন থেকে

একটা ভারি প্লেট পিছলে পড়েছে একটা লোকের মাথায়। লোকটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ হ্যাচের মধ্যেই চেপটে মরে পড়ে আছে। আর তুনিয়ার লেবার ক্ষেপে ঐ কেরানীবাবুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবারে এত দূর থেকেও চোখে পড়ল সরলদাতুর মস্ত শরীরটা ডেকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা অসহায় গুবরে পোকা উলটে থাকার মতো। তার উপর পড়ছে অজস্র কিল-চড়-লাথি। ঐ অবস্থাতেও পড়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ে উনি আপ্রাণ বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। মাধব হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে আমার বুকের উপর ভেঙে পড়ল আর বিড় বিড় করতে লাগল, আমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলবে, ঠিক মেরে ফেলবে। বিমল তুই বাঁচা, তোর পায়ে পড়ি বিমল···। নিজের বাবাকে চোখের সামনে ইঁতুরের মতো থেঁতলে মেরে ফেলছে দেখলে মানুষের মনে কতটা লাগে তা ঠিক অনুমান করাও আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু সরলদাতুকে কোনো-দিনই পর ভাবি নি। অতশত ভাববার বয়েসও সেটা নয়। ছেলে-বয়েসে শুধু কয়েকটা মুখ, কয়েকটা দেহ নিজের রাত-বালিশের মতো পরম আরামে আমাদের কাছে ধরে রাখে। তারা কে, কতটা নিজের, এ-সব খুঁটিয়ে দেখার জন্যে মন প্রস্তুত নয়। সরলদাতুকে ঐ অবস্থায় দেখে আমারও বুক ঠেলে কান্না পাচ্ছে। মাধবের মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। নিজেরও ঠোঁট কাঁপছে। পা থেকে একটা শীত উঠে আসছে সারা শরীরে। আমি স্পষ্টই জানি কিচ্ছু করার মুরোদ নেই আমার। ঐ প্রচণ্ড চড়-লাথির ঝড়ের মধ্যে আমার মতো পুচকে ছোঁড়ার এগিয়ে যাওয়াও নিছক পাগলামি। তবু হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা বিত্যুৎ খেলে গেল। এক ঝটকায় মাধবকে ফেলে আমি ভেতরের অন্ধকার করিডোর দিয়ে ছুটে গিয়ে ক্যাপ্টেনের দরজায় ঘা দিলাম। খালি গা, হাতে ধোঁয়াভরা পাইপ নিয়ে, কেমন একটা রাগী-চোখো মানুষ দরজায় মুখ বাড়াল। সেই ক্যাপ্টেন। আমি বলতে পারি না। তাই সেদিন কি যে বলেছিলাম মনে নেই। তবে 'অ্যাকসিডেন্ট', 'হেল্‌প্‌', 'কাম' এই জাতীয় কিছু

শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম। বাকিটা ইশারায়। তাতেই কাজ হল। বন্দুক-হান্টার-লাঠি নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ডেকে নেমে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যে পালাই পালাই শব্দে সারা ডেক ফাঁকা। সেই বিকট হল্লা আর দাঙ্গা থেমে গেল। বিশাল ডেকের উপর ঝুলে রইল শুধু নিস্তব্ধ নীল বসন্তের একফালি সন্ধে। ঠিক তার নিচে একটা বলিষ্ঠ মানুষের গোটা থ্যাতলানো দেহ ধুলোয় রক্তে মুখ থুবড়ে নিঃশব্দে পড়ে আছে। দৃশ্যটা ভুলতে পারি না কোনোদিন। ভুলতে পারি না ছেলেমানুষ মাধবের তীব্র অনুনয়-ভরা কণ্ঠস্বর, আমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলবে,—বাঁচা···। সরলদাদুর মুখটা কাছ থেকে কি ভয়াবহ দেখতে হয়েছিল। কপাল আর মাথার ভেতর কেটে গিয়ে সারা মুখ সরু সরু দড়ির মতো রক্তের দাগে ভরে গেছে। জামার বুক পকেটটা ছিঁড়ে নেমে এসেছে পেটের কাছে। স্ট্রেচারে করে ওরা সরলদাদুকে ভেতরে নিয়ে এল। ফার্স্ট এড্ দেওয়া হল, মুখে কাঁচা ব্র্যাণ্ডি, জ্ঞান ফেরা, আমাদের সকলের কাঁধে ভর দিয়ে ট্যাক্সিতে বাড়ি আসা—সব ভূতের গল্পের গা-ছমছম কালো গাছের ডালপালার মতো বুকের মধ্যে আবছা স্মৃতি হয়ে রইল।

হারিয়ে গেল শুধু রক্তমাংসের মানুষগুলো। সরলদাদুদের চার ভাই-বউয়ের সংসার। সেই টুসকিদি, মুনিপিসি আর তানি—। তানিটা তো আগেই মরে গেছে। অন্য সবাই কেউ মরল না বটে, তবে সবাই যেন হঠাৎ মঞ্চ থেকে সরে গেল। হারিয়ে গেল সেই কাঠের খেলনা তৈরি করা লম্বাচুল শাদা জুতোর সৌখিন অমলদাদু নামে মানুষটা। হারিয়ে গেল মাধবের গঙ্গাজলে ধোয়া ছেলেবেলা। যুদ্ধের মওকায় কপাল ফিরে গেল সরলদাদুদের। দড়ি দিয়ে ক্যামোফ্লাজিং নেট বা জাল তৈরির কনট্রাক্ট পেয়ে আর বোট ভাড়ার ব্যবসা করে রাতারাতি লাল হয়ে গেল ওরা।

কালীঘাটের শ্মশানের কাছেই সস্তায় একটা দুতলা বাড়ি কিনে ওরা সবাই উঠে গেল সেখানে। বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন সবই হল,

।কণ্ড বড় অল্প সময়ের জন্যে। বড়জোর বছর দশেকের মধ্যে আলাদিনের ভোজবাজীর মতো সবই গেল মিলিয়ে। মুনিপিসি বলতেন শ্মশানের পাশে বাড়ি বড় অলুক্ষণে। ওখানে থাকলে কারুর মঙ্গল হয় না। দিনরাত শ্মশানের কাঁচা কাঠের ধোঁয়া আর মড়া-পোড়া গন্ধে যেন দম আটকে আসে। কিন্তু অত সস্তায় দুতলা বাড়ি পাওয়ার লোভ কে-ই বা ছাড়তে পারে। মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমিও কালীঘাট যেতাম। অ্যালুমিনিয়ামের আর কাঁসার বাসনের দোকান, কত রঙের মাটির পুতুল, লাল হলদে সবুজ কালীঘাটের পট শাদা আর পঞ্চমুখী শাঁখ, পেতলের সিংহাসন— সব দেখতে দেখতে আমার পা চলত সামনে কিন্তু মাথা থাকত পেছনে ঘোরানো। ফলে, অনেকসময় মাঝরাস্তায় বসে-থাকা ষাঁড়-গরুর সঙ্গে ধাক্কা খেতাম। তাই নিয়ে একচোট মায়ের কাছে বকুনি। পঞ্চমুখী শাঁখ মা আমায় কিছুতে কিনে দেবেন না। ও শাঁখ ঘরে রাখলে নাকি লোকে ঘরছাড়া হয়। মাধবদের বাড়ি গিয়ে প্রায় কোনোদিনই মাধবকে পাওয়া যেত না। মাধব তখন বেশ উড়তে শুরু করেছে। লম্বা গোঁফটা বেশ ঘন কালো হয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। উলটো-টানা চড়চড়ে কড়া দাড়ির গাল। লেখাপড়ায় বহুকাল ইস্তফা হয়ে গেছে। হঠাৎ গান-বাজনার খুব ঝোঁক ধরেছে। গান-বাজনা শেখে। টালি ক্লার্কের কাজ পেয়েছে। রোজ জাহাজে যায়। আর কালীঘাটের অনেক নতুন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে ঠিক কোথায় যায়, কত রাতে কি অবস্থায় বাড়ি ফেরে তা সবাই যেন কেমন চেপে যেতে চায়। মাধবের মা অনেকদিনই শয্যা নিয়েছেন। রক্তশূন্যতা, আরো কি যেন সব রোগ। সরলদাদু নিজেও বেশিরভাগ সময় জাহাজে থাকতেন। ফিরতেন একেবারে টর্ হয়ে। তখন নিজেকে সামলানোই দায়! তা ছাড়া ছেলে যাতে না বাইরে গিয়ে বেশি বকে যায় তাই নিজের গেলাসে তলানি ফেলে রাখার মতো হাস্যকর শাসনপদ্ধতিতে উনি বিশ্বাসী। ভাইগুলোর সব একে একে বিয়ে

[illegible] ছেলেপিলেতে বাড়ি ভর্তি। অমলদাদু ভবানীপুরের বড়রাস্তার উপর একটা সাঙ্গুভ্যালি খুলেছিলেন। অন্য ভাইরা কেউ কেউ কাঠের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। সাঙ্গুভ্যালিতে খুব ভিড়। দারুণ জাঁকিয়ে ব্যবসা যাকে বলে। মাঝে মধ্যে আমি যেতাম। বিনাপয়সায় চপ-কাটলেট খেতাম। ছুরি-কাঁটায় খেতে খেতে নিজেকে খুব বড় বড় মনে হত। বেশ কিছুদিন সব ব্যবসাই বেশ ভালো চলল। কিন্তু তার পর আমার অজ্ঞাত কি সব কারণে ব্যবসাগুলোয় যেন তেল ফুরিয়ে আসতে লাগল। কিছুদিন ধরে কোনোরকমে ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে একে একে সব কটা ব্যবসা ফেল্ল পড়ে গেল। নিভে গেল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। ইনকাম ট্যাক্সের একটি বিরাট টাকার অঙ্ক মিটিয়ে দেবার মতো অবস্থা তখন কারুর নেই। এদিক-সেদিক ধারও রয়েছে যথেষ্ট। প্রথমে গাড়ি গেল। তার পর হাত পড়ল বাড়িতে। ধীরে ধীরে টেলিফোন, গাড়ি, বাড়ি—এই তিনরঙা সুতোর আভিজাত্যে যে অ্যালসেশিয়ান বাঁধা থাকে, বেশি টানাটানিতে সে সুতো গেল ছিঁড়ে। ওরা সবাই উঠে এল ভবানীপুরের এক ছুঁচ-সরু গলির অন্ধকার একতলায়। অজস্র শুয়োর-বাচ্চার মতো মানুষের বাচ্চায় ততদিনে বাড়ি ভরে গেছে। দেশ-গাঁয়ে তখন লাল-ত্রিকোণ চালু হয় নি। ফলে, ভবানীপুরের সেই আড়াইটে ঘরে বিস্তর মানবকের গাদি লেগে গেছে। ঐ ঘরের মধ্যেই প্রতিদিন পান আহার সঙ্গম অন্নপ্রাশন পৈতে। বিকেলে মাঝে মাঝে মুনিপিসি আসতেন খিদিরপুরে আমার মায়ের কাছে বেড়াতে। সারা বিকেল কান্না ভাঙা গলায় ফিসফিস করে মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন আর আমি বই খাতায় মলাট দিতে দিতে সব শুনতাম, এ যে কি জলকষ্ট তা কি বলব ভাই। বাড়িওলা গঙ্গাজলের পাইপটাও কেটে দিয়েছে। জিগেস করতে বললে, ভাড়াটেকে দেবার জন্যে আমার গঙ্গাজল নয়। তাই পাইপ কেটে দিয়েছি। করপোরেশান-কলের ঐ তো সরু পাইপ। টাইমে টাইমে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরোয়...উঃ এ

যে কী কষ্ট মা…। বাড়ি বাড়ি জল তুলে দেবার জন্যে পাড়ায় একটা ভারী আসে। ভাবলাম তার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করি। সে মুখের উপর বলে গেল, আমার সব রোজের খদ্দের। তোমরা তো একদিন নেবে। ওভাবে জল দেবার সময় নেই আমার। বাঁধা খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাবে। শেষে কোনো উপায় না পেয়ে পাড়ার একটা বউকে বলে ব্যবস্থা করলাম। তারা রোজ নেয়। বললাম, তোমরা জল কিছু বেশি নিও, আমরা দু জনে মিলে বেঁটে নেবখন, ভারীর পয়সাও আমরা দু জনে মিলে ভাগ করে দেব—তাতে তোমারও কিছু সস্তা পড়বে। সে বউটা রাজি হতে যেন প্রাণে বাঁচলাম ভাই। ভাবো দিকি, এই চোতমাসের রোদে কালীঘাট থেকে হেঁটে ছেলেদুটোর পৈতে দিয়ে ফিরলাম—এখন একফোঁটা জল না পেলে কি অবস্থা। দুধের বাছাগুলোর জন্যেই বেশি কষ্ট। কোথায় সেই সিনেমার পাশে টিউবেল। অতদূর থেকে সমানে বাছারা বালতি বালতি জল বইছে। আর শোবারই কি কম কষ্ট। দেখে দেখে আর পারি না। দু-একটা তক্তা টেনে বের করে দিয়েছি রাস্তার নিমগাছটার তলায়। শরীরে নিমের হাওয়া লাগা ভালো। তা ছাড়া ফাঁকায় বাচ্চাগুলো ঘুমিয়ে বাঁচে। মুশকিল এই বর্ষায়। না যায় বাইরে শোয়া, ঘরের ভেতরেও জল থৈ থৈ। এক-একবার ভাবি টালিগঞ্জের দিকে নাকি এর চেয়ে সস্তা ভাড়ায় বেশি ঘর পাওয়া যায়। কিন্তু ওখানে আবার শুনি যা মশা, চারটে বেলার পর বাইরে বসে কার সাধ্যি।

কোথাও সুস্থির হয়ে বসার উপায় নেই। নিজেও জীবনের কত জলে ঘুরলাম। ঘুরতে ঘুরতে আবার ভেসে এলাম মাধব আর সরলদাদুর কাছে। এখন যে মাধবকে দেখছি এ মাধব আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। গাল তুবড়ে, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এ মাধবকে আর আমি চিনি না। শুধু চেহারা নয়, ভেতর থেকেও মানুষের সব-কিছু যে কি ভীষণ বদলে যেতে পারে তা মাধবকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। চৌরঙ্গী দিয়ে আমারই সঙ্গে ট্যাক্সিতে

যেতে যেতে একদিন যে মাধব কেঁদে ফেলেছিল, ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে যেতে চেয়েছিল, সে মাধবের সঙ্গে এ মাধবের এতটুকু মিল নেই। মাধবের ইঙ্গিতে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম একটা প্রচণ্ড ভিড়ে ভরা বাসের পাদানিতে কোনোক্রমে হ্যাণ্ডেলের ক্ষীণতম একটু অংশ ধরে সরলদাদু ঝুলে আছেন। শরীরের সবটাই প্রায় বাইরে। বাসটা প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে তাঁকে দক্ষিণের দিকে। অনেক বয়েস হল সরলদাদুর। জাহাজের কাজে খাটুনিও একেবারে হাড়ভাঙা। তারপরেও এতটুকু আরাম নেই। এসেছিলেন হয়তো ডালহাউসিতে। এখন এইভাবে ফিরে যাচ্ছেন বাড়ি। অথচ আমরা ট্যাক্সির গদিতে গা এলিয়ে কত আরামে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ডকে চলেছি। আমি সরলদাদুর ছেলের মতো। আর মাধব তার আপন সন্তান। ঠিক পাশাপাশি চলতে চলতে নিজের ক্লান্ত বুড়ো বাপকে এই ভাবে বাদুড়ঝোলা অবস্থায় দেখলে কোন্ ছেলের ট্যাক্সির আরামে যেতে ভালো লাগে জানি না। একটা খুব বিচ্ছিরি তেতো পিল গেলার মতো সেই করুণ দৃশ্যটা গলার কাছ থেকে নিচে নামিয়ে আমি শুধু মাধবকে বললাম, জাহাজটা আর তিনঘণ্টার মধ্যে সেল করবে। ট্যাক্সিতে না গেলে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে মাধব…।

মাধব কপালে হাত দিয়ে উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। আমার কোনো কথা ওর মাথায় ঢুকেছে কিনা কে জানে। তবে ঘাড় যখন ফেরাল স্পষ্টই তার চোখে জল দেখলাম। রুমালে নয়, নোংরা আঙুল দিয়ে শুধু চোখ রগড়াল। প্রায় শিশুর মতো।

এ মাধবকে এখন আর কেউ কিন্তু খুঁজে পাবে না। এ মাধব বহুদিন আগে মারা গেছে। এখন মাঝরাত্তিরে মাতাল হয়ে ফিরে, এই মাধবই বাবার কাছে ফের মদ খাওয়ার টাকা চায়। বাপ টাকা দিতে না পারলে অশ্রাব্য খিস্তি করে। এমন-কি ঠ্যাঙাবারও চেষ্টা করে। অফিসে আমার টেবিলে এসে সরলদাদু চোখের জল

মোছেন। মুনিপিসির কান্না আর মায়ের অনুরোধে সরলদাদু আর মাধবকে আমি আমার ফার্মে ঢুকিয়েছিলাম। বাপ সেই সুপারভাইজার আর ছেলে ফোরম্যান।

কিং জর্জ ডকের বয়ায় ছিল জাহাজটা। ডেক রেলিংয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ফোরম্যান মাধব। দেখতে দেখতে ডকের এদিকটা কত বদলে গেল। নতুন নতুন খান তিনেক বার্থ তৈরি হল। অনেক পুরনো বার্থের ক্রেন আর শেড পালটে রিবার্থ বা পুনর্জন্ম হল। সবই আমাদের চোখের উপর। জাহাজে কাজের তেমন তাড়া নেই। সবই প্রায় ওভারসাইডের মাল। জুট মিল থেকে বরাবর নৌকোয় আসছে। শীত যাই-যাই বসন্তের সকাল। এখনো প্রথম রোদে দাঁড়াতে বেশ আরাম লাগে। কুয়াশা-ভরা কলকাতা। নরম কুয়াশা-ভাঙা রোদ। ডিঙি ধরে ভেসে গিয়ে জাহাজে উঠলাম। চীফের সঙ্গে কথা বলে অন্য শিফ্‌টের কাজের হিসেব আর আগামীকাল পর্যন্ত লেবার হুক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে নেমে এলাম জাহাজ থেকে। কিন্তু পরের সকালে জাহাজে উঠেই এক তুমুল ব্যাপার। প্রথমত আমার ফোরম্যান মাধব অনুপস্থিত। ফলে, যা হয়ে থাকে, ফোরম্যানবিহীন কাজে অনেক অসুবিধে আর বিশৃঙ্খলা। তার উপর চীফও নাকি কি কারণে জানা নেই, অত্যন্ত রেগেমেগে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোনো কথা নয়, ছুটলাম সোজা চীফের ঘরে। দেখলাম সত্যিই চীফ রেগে কাঁই। ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম। দিন দুয়েক আগে দ্বিতীয় অফিসার নাকি আমার ফোরম্যান মাধবকে জিগেস করেছিল যে সে রোজ জাহাজের জন্যে তিন-চারটে করে খবরের কাগজ এনে দিতে পারবে কিনা। মাধবের মাথায় তখন কেবল টাকার চিন্তা। সে হঠাৎ একটা দাঁও পেয়ে গেল। সেকেণ্ড-কে সে প্রথমেই জিগেস করলে কী রকম কাগজ তার দরকার। ভারতে অনেক রকম কাগজ পাওয়া যায়। তবে সরু কাগজের চেয়ে মোটা কাগজের দাম বেশি। জাহাজ যতদিন থাকবে রোজ তিন-চারখানা মোটা কাগজ দেওয়া বেশ খরচের ব্যাপার। এখন আগাম কিছু

টাকা না দিলে তো কাগজ আনা সম্ভব নয়। বেচারা ছেলেমানুষ সেকেণ্ড। তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিল মাধবকে বেশ কিছু টাকা। আর মাধবকে পায় কে। সেদিন রাত্তিরেই পুরো টাকাটা সে বোতলের পেছনে ফুঁকে দিল। তার পর সে-রাতে সে কোথায় পড়ে ছিল খোদা জানে। সকালবেলা কোনো রকমে চুলটোকা করে, লাল চোখ নিয়ে জাহাজে উঠল। গ্যাংওয়ের মুখেই সেকেণ্ড তাকে জিগেস করেছে কাগজ কি হল। মাধব একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে উত্তর দিল, কাগজ ? কাগজ তো আজ বেরোয় নি, নট্ পাবলিশড্ টু-ডে। বিরাট স্ট্রাইক।

এবার অফিসারের ঘাবড়াবার পালা। সে আমতা আমতা করে বলল, তবে যে দেখলাম উইঞ্চম্যান, টালিম্যান অনেকেই ডেকে কাগজ দেখছিল…।

এবারেও মাধবের অবিচলিত উত্তর, আরে, ওসব তো পচা লোক্যাল ভাষার পেপার। তুমি ভালো মোটা ইংরিজি কাগজ চেয়েছ, সে-সব আজ বেরোয় নি মোটেই। কাগজের অফিসে আজ বিরাট স্ট্রাইক…।

এর পর হতভম্ব অফিসারের মুখ দিয়ে আর টুঁ-শব্দ বেরোয় নি। তার পরের দিন থেকে মাধবও যথারীতি ফেরার। ফলে, সেকেণ্ড গিয়ে নালিশ করেছে চীফকে আর চীফ রেগে লাল। আমি চীফকে বুঝিয়ে বললাম যে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। আমার প্রতিটি লোকের চরিত্রের সততা সম্বন্ধে আমি কি বণ্ড সই করে দিতে পারি ? এটা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে তোমার কাগজের দাম যা গেছে সেটা দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তোমার অফিসারদেরও তুমি বলে দিও যে ঐরকম যখন-তখন যার-তার হাতে যেন পয়সা না দেয়—হলই বা সে আমার লোক। কিন্তু এ-সব সাবধানবাণী দিয়ে মাধবের হাত থেকে নাবালক অফিসারদের রক্ষা করা বড় মুশকিল। এ জাহাজ গেল তো অন্য জাহাজে ফের শুরু হল তার নবতর অভিযান। সেখানে আবার

সম্পূর্ণ নতুন কৌশল। কোথাকার এক নাবিককে বলেছে 'ময়না' নামে একটা খুব দামী অথচ শিক্ষিত ভারতীয় পাখি কিনে দেবে যার তুল্য ভদ্র সুন্দর শিক্ষিত পাখি দুনিয়ার কোথাও মেলে না। তবে মুশকিল হল তার দাম বেশি। সে ব্যাটা উটকো নাবিক তো পাখির গুণগান শুনেই গদগদ। সঙ্গে সঙ্গে বিশ টাকা প্লাস দু-টাকা মাধবের বক্‌শিস। পরের দিন মাধব একটা সস্তা তারের খাঁচায় একটা এক-আধ টাকা দামের রং-করা মুনিয়া এনে হাজির। বৃষ্টির সামান্য ছাটেই তার রঙ একদম চিত্তির। কিন্তু তখন আর মাধবের পাত্তা পাবে কে! কোথায় আবার ঘড়ি বিক্রি করে ডলার এনে দেবার নাম করে মাধব ঘড়ি নিয়ে ফেরার। ওর পাওনা টাকা থেকেই মাসে মাসে কেটে আমাকে সে-সব ধারদেনা মেটাতে হয়। বহুবার বহুরকমে শাস্তি দিয়েছি, টাকা কেটেছি—এমন-কি চাকরি খতমেরও ভয় দেখিয়েছি। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। যখন ভালো থাকে তখন একদম অন্য মানুষ। দারুণ কাজ বোঝে। যে-কোনো আকারের, যে-কোনো সাইজের মালের কী ভাবে স্লিং করলে কত তাড়াতাড়ি টেনে নামানো যায় তা মাধব এক মুহূর্তে স্থির করতে পারে। কথাবার্তায় অফিসারদের কাছে অতি প্রিয় ও বিশ্বাসী হয়ে উঠতে ওর সময় লাগে মাত্র ঘণ্টা কয়েক। কিন্তু সবই খেয়াল। যেদিন থেকে বোতলে হাত দেবে সেদিন থেকে চার-পাঁচ দিন মাধবের কোনো পাত্তা নেই। ঐ চার-পাঁচ দিন আর দিন-রাতের হিসেব থাকে না। সমানে বোতল, শুধু বোতল। একটু নেশা কেটে এলেই ফের শুরু। একদিন সোজা জিগেস করেছিলাম যে এ-সবের মানে কি। স্পষ্ট উত্তর দিল 'বউ'। পুরোনো কালীঘাট পাড়ার একটি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল মাধব। গোটা-কতক ছেলেপুলেও হয়েছে। কিন্তু তাতেও এতটুকু পরিবর্তন হয় নি মাধবের। বাড়ি ফিরলেই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া আর অশান্তি। বউ নাকি তার বাপ-মাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। আর মাধবের মাসের রোজগারের মোটা অংশটা নাকি সে নিজেই

রাখতে চায়, শ্বশুর-শাশুড়ি নয়। অথচ মুনিপিসির কাছে শুনি, সব দোষ নাকি মাধবের নিজের। সে মাতাল হয়ে রাত-বেরাতে বাড়ি আসে। আরো মদের জন্মে সে বউকে জুলুম করে। বউ দিতে না পারলে রীতিমতো মারধোর চলে। তার গা থেকে গয়না খুলে নিয়ে বিক্রি করতে চায়। একেবারে ছোটলোক মাতালরা যা করে ঠিক তেমনি করে বউয়ের চরিত্রের খোঁটা দিয়ে খিস্তি করে। এমনি আরো কত কি শুনি। বুঝতে পারি না কিছুতেই যে কোন্ মাধব সত্যি। সব কী রকম গোলমাল হয়ে যায়। খালি মনে হয় সত্যিই কি মাধবের এখনকার মুখের মতো ওর ভেতরের মানুষটাও ভেঙে তুবড়ে ঐরকম হয়ে গেছে? বিশ্বাস হয় না। ওর ছেলেবেলার মুখটা মনে এলে কেমন যেন মায়া লাগে। হয়তো মাঝ গঙ্গার জাহাজ থেকে ওঠা-নামার সময় এই ধাঁচের মায়া এসে যায় হঠাৎ।

অথচ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জানি এ মায়া বড় ঠক-বাজ। মাধবের উলটো দিকটার মতো বেইমান। আপার ডেকে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে হালকা 'সেভেনআপ' চুমুক দিতে দিতে জলের দিকে তাকিয়ে আছি। নিচে গ্যাংওয়ে দিয়ে সরলদাদু নেমে যাচ্ছেন। মাথায় পিছন দিকে সেই পরিচিত আঁচিল। মালকোঁচা-মারা ধুতি আর মোটা ছিটের হাফশার্ট। জামায় ক্রেনের তেল আর কালি। মনে হয় বয়েসের ক্লান্তি জামার উপর ফুটে উঠেছে। বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে বহুদিন। সরলদাদুর অল্প পেছনে মাধবও নামছে। এমন বাপ আর ছেলে যাদের কাজে, চিন্তায়, স্বপ্নে কোথাও এতটুকু মিল নেই। যতই পানদোষ থাক, সরলদাদু এখনো কাজের জগতে যেমন পরিশ্রমী তেমনি সৎ। আর মাধব বাপের মতোই খুব ভালো কাজ বুঝলেও অত্যন্ত বেইমান আর ফাঁকিবাজ। তবু ওরা বাবা আর ছেলে। ক্লান্ত বাবা। জাহাজে ওঠা-নামায় বৃদ্ধ বাবা। মনের সরলতায় ছেলেমানুষ বাবা। এমনি একটা মানুষের জন্মে সত্যিই মায়া হয় যে একটু চতুর, একটু লোভী হলে এই জাহাজী জগতে বেশ নিজের কিছু গুছিয়ে নিতেন। কিন্তু তা হল না। গার্ডেনরীচে

খোলা গঙ্গার জল কত গেরুয়া। অথচ এখানে ডকের ভেতরের জল গাঢ় সবুজ। তাতে তেল ভাসছে। তার উপর নানা রঙের জাহাজের ছায়া বড় বড় অয়েল কালারের মতো দেখায়। মার্চের দিলদার হাওয়া আর উজ্জ্বল রোদে-ভরা আকাশ। সামনে বাপ আর পেছনে ছেলে। যৌবন বার্ধক্যের কাছে চার্জ বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু এ যৌবন অবিশ্বাসী আর মেরুদণ্ডহীন। ওরা ডিঙিতে চেপে ধীরে ধীরে দূরে ছোট হয়ে গেল। এখন শূন্য গ্যাংওয়ে। গ্যাংওয়ের নিচের ধাপে এক টুকরো পাঁউরুটিতে একটা বেড়ালের মুখ। এখন মিল-আওয়ার অর্থাৎ খাবার ছুটি। কাজ বন্ধ। সমস্ত লোক নেমে গেছে। সব শূন্য, স্তব্ধ। সবুজ জলের বুকের উপর শুধু সিঁড়িটা ঝুলছে। পাঁউরুটির শাদা টুকরোর পেছনে লোভী বেড়ালের মুখের ছবি। মাথার আশেপাশে অজস্র শাদা সীগাল ঘুরপাক খাচ্ছে···।

রায় সকালে যখন চ্যাটার্জি সায়েবের দরজায় ধাক্কা দিল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। ন-টা তো হবেই। এত বেলা অবধি কোনোকালেই চ্যাটার্জি সায়েব বিছানায় থাকেন না। গতকাল রাত্তিরে বাংলোয় ফিরতে রায়ের বেশ দেরি হয়েছিল। চ্যাটার্জি সায়েবের দরজা তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। রায় খোঁজ নিয়ে জেনেছিল রাত্তিরের খাবার খান নি উনি। বেয়ারাটা সামান্য পুডিং রেখে এসেছিল ঘরে। কে জানে শরীর-টরির খারাপ হল কিনা। ভয় লাগে। কাগজের কাজেই রায়কে মাঝে মধ্যে কলকাতার বাইরে আসতে হয়। বেশি দূরের ব্যাপার নয়। কাছের বিহার বা উড়িষ্যা কিংবা অদূরের বাঁকুড়া জলপাইগুড়ি। এইভাবেই ছোটনাগপুরে এসেছে। মাত্র দিন দুয়ের কাজ, তারপরেই ফেরা। শুনেই চ্যাটার্জি সায়েবের মনটা নেচে উঠল, বললেন, কলকাতা আর সইছে না রায়। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমাকে সঙ্গে নেবে?

রায় বলল,

কিন্তু ট্রেন তো আর মাত্র ঘণ্টা খানেক পরেই। আপনি কি পারবেন তৈরি হতে? তা ছাড়া আমি যাচ্ছি কাজে। একা একা বাংলোয় বসে আপনার ভালো লাগবে কেন।

চ্যাটার্জি সায়েব সেই পরিচিত মাছি-তাড়ানো ভঙ্গিতে বললেন, আরে রাখো তোমার কাজ। যারা প্যান্ট বানায় তারা পেচ্ছাবের জায়গাও রাখে। আর তৈরি? সুইচ টিপলে আলো জ্বলতে যে সময় লাগে, আমি তাতেই তৈরি। তুমি আমায় ভাবো কি রায়, ভেতরের ওয়্যারিং এখনো সব ঠিক আছে, একটুও ড্যাম্প লাগে নি।

এরপরে আর কি বলার থাকতে পারে। অথচ ট্রেন থেকেই লক্ষ করছি চ্যাটার্জি সায়েব অন্যদিনের চেয়ে কেমন যেন আনমনা। কথাবার্তায় একটু যেন বেশি সংক্ষিপ্ত। একসঙ্গে দু দিনের কাজ সেরে নেবার তালে রায়কে একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হল। ফিরতেও বেশ দেরি হয়ে গেল। পরের দিনটা স্রেফ শুয়ে-বসে চ্যাটার্জি সায়েবের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা। একবার ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। চ্যাটার্জি সায়েবের মিষ্টি ডাক কানে এল, এসো রায়, ভেতরে এসো। ফ্লাস্কে এখনো কফি আছে, এসো একটু পান করা যাক। সকাল বেলা পান করতে তোমার আপত্তি নেই তো? বিশ্বাস কর, কিচ্ছু মেশাই নি কিন্তু, খাঁটি কালো কফি।

বাইরে ছোটনাগপুরের ফুটফুটে শীতের সকাল। আকাশে নীলের পিয়ানো বাজছে। ঘরের ভেতরটা কিন্তু আধা অন্ধকার। জানলার পর্দা সরানো হয় নি। টেবিলের পাশের লম্বা ইজিচেয়ায়টায় চ্যাটার্জি সায়েব বসে ছিলেন। গায়ে গাঢ় পাতাসবুজ র‍্যাপার। মুখ ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে একেবারে ফিটফাট।

শুধু চোখদুটো যেন বড় ক্লান্ত। মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন বয়েস বেড়ে গেছে। চোখের তলায় চোয়ালে গালে কে যেন খুব দ্রুত হাতে বয়েসর ফাউণ্ডেশান ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছে। ঠাণ্ডা ক্লান্ত কাঁটার পাশে গতরাতের পুডিংটা তেমনি না-ছোঁওয়া পড়ে আছে। বন্ধ ঘরে রাত্রিবাসে পুডিংটা যদিও শুকিয়ে গেছে, উপরের লাল চেরীটা কিন্তু চ্যাটার্জি সায়েবের মুখের থেকে বেশি তাজা আর জ্বলজ্বল করছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি এত ভাবছ রায়। তোমায় বলেছি তো আমার ভেতরের ওয়্যারিং এখনো সব ঠিক আছে। একটুও ড্যাম্প লাগে নি। আসলে গতকালের তারিখ টাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। ক্যালেণ্ডারের লাল নীল নয়, কোনো রঙ নেই এমন একটা তারিখ। তবু ওটার সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রতিবছর ওটা ভুলতে চাই, কিন্তু কিছুতেই পারি না। কলকাতায় থাকলে যদিও

সারাদিন জাহাজে ব্যস্ত থাকি, তবু সায়েবদের সঙ্গে কাজের কথা বলতে বলতে কেমন যেন কথা হারিয়ে ফেলি। ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে মুমু যেন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, এ-মা, কী বোকা তুমি বিমলুদা। ফরসা সায়েব আবার কী কথা, সায়েব কি কখনো কালো হয়? দাঁড়াও আমি সবাইকে বলে দেব। বলতে পারো রায়, মেয়েটাকে সত্যি কী করে ভোলা যায়। আমার মাসিমার মেয়ে। আমার কোনো বোন নেই, শুধু ঐ মেয়েটাই আমায় ভাই-ফোঁটা দিত। মিষ্টির ডিসটা আমার হাতে দিয়েই তার থেকে নিমকিটা তুলে নিয়ে মার ছুট। জানে আমি মিষ্টির থেকে নোনতা বেশি ভালোবাসি। খালি ঝগড়া করার ফন্দি। দেখা হলেই এ কথা সে কথার পর আমার কথার ঠিক ভুল ধরবে তার পর 'বোকা বোকা' করে সারা বাড়ি ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে। ছোটবেলায় ও আরো বেশি পাকা ছিল। ওর দাদা সমীর আর আমি ছিলাম গলায় গলায়।

বাড়িতে মাঝে মাঝে ফোন করতাম। ওদের ফোনটা একটা উঁচু তাকে তোলা থাকত। টুল টেনে নিয়ে তার উপর উঠে ফোন ধরত মুমু। ফোন ধরেই বলত, কাকে চাই, দাদকে? আমি এখন দাদাকে ডাকতে পারব না। এখানে কেউ নেই যে। আমি একা টুল থেকে নামব কী করে? তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না…।

কি- বিপদ। অগত্যা ওর সঙ্গে খানিক বকবক করতেই হত। ওর যখুনি খারাপ লাগত মাঝ পথে খট্ করে ফোন কেটে দিত। সেই মুমু একদিন বড় হল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি। বন্ধুদের সামনে মুমু বললে হাতে চিমটি দিয়ে ফিসফিস করে বলত, খালি মুমু মুমু —মমতা বলতে পার না? একবার এক ক্যাপ্টেন গিয়েছিল আমার সঙ্গে ফল কিনতে। সেটা ওর স্কুল ছুটির সময়। তাই স্কুল থেকে ওকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিলাম।

নিউ মার্কেটে বেড়াতে মুমুর খুব ভালো লাগত। বেজায় খুশি হয়ে বলত, উঃ কত্তো জিনিস, না বিমলুদা? অচেনা সায়েব

দেখে সেদিন একটাও কথা বলে নি। শুধু বার বার ঘাড় তুলে ক্যাপ্টেনের কাঁধের স্ট্রাইপগুলো গোনার চেষ্টায় ছিল। লম্বা ক্যাপ্টেনের কাঁধটা ওর তুলনায় এত উঁচু যে কিছুতেই সিটে বসে গুনতে পারছিল না। একসময় আমার কানটা ওর মুখের কাছে নামাতে ইশারা করল। কান নামাতে বলল, ধ্যুৎ তেরিকা, কিচ্ছু গুনতে পারছি না। ক্যাপ্টেনের কটা স্ট্রাইপ থাকে বল না গো…।

আমি বললাম 'চারটে'। ব্যস, সারা গাড়ি আর একটি কথা নেই। সায়েব অনেক আঙুর লেবু আপেল কিনল। মুমু আমার হাত ধরে চুপটি করে সব দেখল। একবার আস্তে আস্তে জিগেস করল, তোমার সায়েব বুঝি হাসপাতাল যাবে ?

আমি অবাক হয়ে জিগেস করলাম, কেন হাসপাতাল যাবে কেন ?

মুমু বলল, তবে এত লেবু আঙুর সব কিনছে কেন ? আমি যখন হাসপাতালে ছিলুম, মা রোজ আমার জন্যে লেবু-আঙুর নিয়ে যেত। ওর কথা শুনে আমি খুব চেঁচিয়ে হেসে ফেলেছিলাম। ও দারুণ লজ্জা পেয়ে জুতো দিয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল। আমি বললাম, সায়েবরা হাসপাতাল না গিয়েও রোজ ফল খায় তা জানিস ?

মুমুর যেন ঠিক বিশ্বাস হল না এমন একটা জুলুজুলু চোখে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা সায়েবকে বলতে সেও একচোট হাসল। তারপর সেও মুমুর মতোই প্রশ্ন করল, নর্ম্যাল হেল্থ-এ কি ভারতে কেউ ফল খায় না নাকি ?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, শসাটা কলাটা কেউ কেউ খায় বটে তবে আঙুর আপেল বাড়িতে নিয়ে খাওয়ার সাহস নেই কারুর—যা দাম। তোমার দেশে ফরাসী পারফিউম কেনার মতোই আমার দেশে ফল কেনা একটা বিলাসিতা। সায়েবের তো চক্ষুস্থির।

বহুদিনের পুরনো ইতালিয়ান ক্যাপ্টেন জ্যাকপেলো মরে

গেছে। এড্রিয়াটিক নীল জল থেকে ভাসতে ভাসতে বহুবার ঢুকে পড়েছে কলকাতার এই হুগলি নামক নালাটায়। জীবনে এতবার কলকাতা এসেছে যে নিজের দেশের থেকে তার কাছে কলকাতা কম আপন নয়। গোল পাঁচ নম্বর ফুটবল মার্কা মুখ আর ড্যাবড্যাবে চোখ। হলুদে উঁচু দাঁত আর কাতলা মাছের মতো হাঁ-মুখ। এর নাম জ্যাকপেলো। শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারতকে চিনেছিল বটে জ্যাকপেলো। তাই ভালোওবাসত এই হতচ্ছাড়া দেশটাকে। যখনই এ দেশের চোট্টামি আর অসাধুতার কথা উঠত ও সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলত, ছাখো বিমল, আমায় গল্প বলো না। ওসব সাধুতা-ফাধুতা একদম বাজে কথা। এ দেশ কেন, কোনো দেশেই কোনো ব্যাটা জোর গলায় বলতে পারবে না যে সে খাঁটি সাধুপুরুষ। মানুষেব মাথার মধ্যেই এমন সব আজগুবি ব্যাপার কাজ করে যার কথা সে নিজেও ঠিকমতো জানে না। সাধুতা বস্তুটা নিছক পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আধ লাখ টাকার লোভ দেখালে হয়তো তুমি আমি কেউই রাজি হব না, কিন্তু দু-চার লাখ? যাক, বাদ দাও ওসব কথা। পৃথিবীর সব থেকে মূল্যবান উপদেশটা কি জান? রোজ সকালে ~~অন্তত দেড় কিলো হাসতে হয়, তাতে~~ দিন ভালো যায়, হৃদরোগ ধরে না। মনে থাকবে তো কথাটা?

প্রতিবার কলকাতা ছাড়ার আগে আমার সঙ্গে নিউ-মার্কেটে গিয়ে বেশ কয়েক ডজন তোয়ালে, বিছানার চাদর কিনে নিয়ে যেত। জিগেস করলে বলত, এত সস্তায় এত ভালো জিনিস ছুনিয়ায় কেউ দেবে না তোমায়। ভারতবর্ষের তাবৎ কটন-মিলগুলো ওর নখদর্পণে। কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ—সব জায়গার কাপড়ের মিল-গুলোর নাড়ীনক্ষত্রের ইতিহাস ওর জানা। ওদের উত্থান-পতনের ইতিহাস লেখা ওর পক্ষে জলভাত। ওর কাছেই প্রথম শিখেছিলাম কোন মিলের তোয়ালের কি গুন, কোনটা মুখ মুছতে ভালো, কোনটা গা মুছতে। বেশি চিনি দেওয়া-চা কিংবা ফুল অথবা বাঘ—এর কোনটার মধ্যে 'হৃদয়' নামক পদার্থটা থাকে তা আমার জানা

নেই। তবে ক্যাপ্টেন জ্যাকপেলোর মধ্যে যে ঐ ব্যাপারটা খুব বেশি ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বেশিদিন পরে দেখা হলে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরত। আর শেষ ভয়েজে ফিরে যাবার সময় স্পষ্ট ওর চোখে জল দেখেছি। যারা বলে ইয়োরোপীয়রা কাঁদতে জানে না, তারা কিন্তু মিথ্যুক।

একটা শেষ বৈশাখের জাহাজে কাজ করছি। জাহাজটার নাম সম্ভবত 'ওল্‌গা'। আমরা বারবার ওলগা ওলগা করতে করতে *জিভ-প্যাণ্ট-শার্ট সবই আলগা হয়ে যায়। সেবার সে জাহাজেই জ্যাকপেলো এসেছিল। চড়চড়ে গরমে তখন কলকাতার গা-ফুঁড়ে* ধোঁয়া বেরোচ্ছে, প্রায় একশো আট-নয় ডিগ্রি। মাল খালাসের কাজ চলছে পুরোদমে। মুশকিল হল নানা রকম স্পেশাল মাল নিয়ে—যত রাজ্যের কেমিক্যালস্, বীয়ার, ওয়াইন আর সিগারেট। পোর্টের প্রথানুযায়ী এ-সব মাল যখন তখন যত্রতত্র হুড়হুড় করে ঢেলে দেওয়া যায় না। এগুলো নামাবার সময় হল শুধু দিনের শিফ্‌ট। তাও হেলেদুলে সুরু হয় সকাল ন-টায়। সওয়া দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা খানা-টাইম। তখন সব বন্ধ। ফের বারোটা থেকে দুপুর দুটো—ব্যস, খেল খতম। আবার পরের দিন। সময় এত কম বলেই এই প্রচণ্ড গরমে জাহাজ থেকে অনবরত শেডে নামা-ওঠা করে তাড়া মারতে হচ্ছে। ফলে, শরীরের চামড়া ভাজাভাজা আর মাংস সুন্দর বার্-বি-কিউ স্টেক। পোর্টের তরফ থেকে সাহায্যের কোনো ত্রুটি নেই। কারণ, এদিকের প্রত্যেকটা শেডের এ-এস বা কর্ণধাররা সবাই আমার বন্ধু। কলেজ ছেড়ে আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বন্দরের ধুলোয় জড়িয়ে গেছি। প্রশান্ত আর শিবেন দু জনেই পোর্টের তরফ থেকে সারাদিন আমার সঙ্গে খেটেছে, ঘেমেছে। প্রশান্ত ইংরেজি পপসং গায় ভারি দরাজ গলায় আর শিবেন গাইতে পারে রবীন্দ্রসংগীত। ওদের নিয়ে বেলাশেষের গ্যাংওয়ে দিয়ে জাহাজে উঠলাম। শিবেন প্রথম আলাপের বাঁধা ঢংয়ে জ্যাক-পেলোকে জিগেস করল এটাই ক্যাপ্টেনের প্রথম ভয়েজ কিনা।

জ্যাকপেলো খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, তা প্রায় ঠিকই বলেছ। কলকাতায় এই নিয়ে খুব কম করে বিশ-ত্রিশবার আসা হল, আর প্রত্যেকবারই মনে হয় এটাই আমার প্রথম ভয়েজ, এত ভালোবাসি আমি কলকাতাকে। তবে সত্যি করে এটাই আমার শেষ আসা। কারণ পরের বছর আমি রিটায়ার করছি। বিমাল, তোমরা ডেকে ওদের নিয়ে বীয়ার খোল, আমি একটা চিঠি টাইপ করেই এখুনি আসছি। যা-সব চেহারা করেছ, দেখে একদম বমি উঠে আসে, বেতের হাই-ব্যাক চেয়ার আর বেতের মস্ত গোল টেবিল দিয়ে ক্যাপ্টেনের ডেক সাজানো। সন্ধের শুরু থেকেই কলকাতার সেই বিখ্যাত দক্ষিণে হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল। হাওয়াইশার্টের বুকের বোতাম খুলে তাকে শরীরের প্রতিটি তৃষ্ণার্ত রোমকূপে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। শিবেন মৃদু গলায় 'নাই যে বাকি সময় আমার' গুনগুন করছে। ঠাণ্ডা বীয়ারের দ্রুত শুশ্রূষায় চোখে প্রায় ঘুম আসে। ভাবতে অবাক লাগছে, বন্দরের এই ক্রেন-ডেরিকের ভিড়ে তুমুল হুড়োহুড়ি আর ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা কেমন একটা নির্জন দ্বীপে বসে আছি যেখানে ক্লান্তিমোছা পানীয় আছে, আছে গুনগুনিয়ে ওঠা রবীন্দ্রসংগীত। জ্যাকপেলো এসে বসতে আরো জমল। তখনো একটুও ভাবি নি জীবনের ঘাটেও এটাই জ্যাকপেলোর শেষ আসা। কাজ থেকে রিটায়ার করার মাত্র একবছর পরেই খবর পেলাম জ্যাক-পেলো পৃথিবী থেকেও রিটায়ার করে চলে গেছে। অন্য কোনো ভয়েজে এই গঙ্গার খাড়ি বেড়ে হয়তো ফের আসবে কলকাতায় তোয়ালে কিনতে কিন্তু তখন ভয়েজ নম্বর আলাদা—ওর আমার দু জনেরই, ফলে কেউ কাউকে চিনতে পারব না।

এ-সবের কতকাল পরে 'চেলিনা' জাহাজে ক্যাপ্টেন জ্যাক-পেলোর ছেলে জুনিয়ার জ্যাকপেলো এল চীফ অফিসার হয়ে। খুবই অল্প বয়েস। আমার থেকে ঢের ছোট। তবে এই বয়েসেই দারুণ চালাক আর দৃষ্টিভঙ্গিটা কাঁচকাটা ছুরির মতো। কোনো কিছু সম্বন্ধেই ও কোনো আশা রাখে না। চেহারাটাও বাপের ঠিক

উলটো। রোগাপ্যাটকা শরীরে মাথা ভরা কাঁচা সোনার শাদাটে চুল, বুদ্ধদেবের মতো লম্বা লম্বা কান, গায়ের রঙটাও কেমন ফ্যাকাশে শাদা। বেশ চটপট আর পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। প্রশান্ত ওকে বলছিল পরের বার যখন আসবে তখন যেন ওর জন্যে একটা স্পোর্ট-শার্ট আনে। ছোট জ্যাকপেলো উত্তর দিল, আমি পরের বার যে আসবই কে বলল তোমায়? তোমার মাপ ইত্যাদি দিও, যদি পরের বার সত্যিই আসি তো নিয়ে আসব, কথা দিচ্ছি না কিন্তু।

প্রশান্ত বলল, তুমি না এলে তোমার কোনো বন্ধুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

একটু লাজুক লাজুক হাসির বিদ্রূপ টেনে জ্যাকপেলো বলল, না, তা কখনোই পারি না। যাকে দিয়ে পাঠাব সে তোমায় দেবে কিনা জানব কী করে? ঐ 'বন্ধু' শব্দটার তেমন কোনো দাম নেই আমাদের জীবনে। আমরা যারা ডাঙা-ছাড়া মানুষ, চিরদিন জলবন্দী, তাদের কোনো বন্ধু থাকে না। বন্ধু হয়ে যারা আমাদের কাছে-পিঠে আসে, আসলে তারা একদল পরিচিত মানুষের বেশি নয়। আর সমুদ্রই আমাদের শেষ কথা, তার পরে কথা নেই।

সত্যিই আর কথা নেই। কি কুক্ষণেই যে সমুদ্দুরে যাব ভেবেছিলাম। শুনে অবধি মুমু গোঁ ধরেছে আমাদের সঙ্গে যাবে। সমীর তো রেগে লাল। আমাদের নিজেদেরই থানেকা ঠিকানা নেই, যাব ধ্যাড়ধেড়ে বেসরকারি বাসে, সেখানে ঐ ধিঙ্গি মেয়েকে নিয়ে কে ঝামেলা পোয়াবে? মুমুর কোনো দিনই দাদার সঙ্গে সুবিধে হয় না, শেষ পর্যন্ত আমাকেই পাকড়াও করে। একটু ভালো করে চেয়ে দেখলাম মুমুটা এবার সত্যিই ধিঙ্গি হয়েছে। এখন শাড়ি পরলে আর মনেই হয় না যে ফ্রকের উপর শাড়ি পরেছে। ফরসা কপালে এখন শুধু যা লাল টিপটাই পরতে শেখে নি।

হাঁ করে বোকার মতো দেখছ কি। আমি কিন্তু যাবই বলে দিচ্ছি বিমলুদা।

মুমু তুই কি বড় হচ্ছিস না?

হচ্ছি তো কি?

তোকে নিয়ে মোটরে যেতে কত খরচ জানিস?

একটু ভেংচি কেটে মুমু বলল, আহারে, আমি যেন বলেছি ওদের মোটরে নিয়ে যেতে। আমি যদি তোমাদের সঙ্গে বাসে যেতে পারি আমায় কি দেবে বল?

বললাম, নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে দেব।

পিঠে একটা কিল মেরে ছাদে যেতে যেতে মুমু বললে, না নিয়ে গেলে, মনে থাকে যেন—।

শেষ পর্যন্ত সত্যিই সঙ্গে গেল মুমু। বাসে বেজায় ভিড়। সমীরের পাশে কিছুতেই বসল না মুমু। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, বাইরে চেয়ে ছাখ ঐ লালমুখো মানুষটা দিব্যি কেমন দূরের গাছগুলোর কাঁধে মাথা রেখে মরে যাচ্ছে।

মুমু খিলখিলিয়ে বলল, আহা, কি কবিতার ছিরি। সূর্যকে নিয়ে এর থেকে ঢের ভালো কবিতা আমার ক্লাস সেভেনের ডাইরিতে আছে।

বাস চলেছে তো চলছেই। দু পাশে চৈত্রের গোধুলি পথ করে দিচ্ছে। পেটে কিছু পড়ে নি। এককাপ চা-ও না। খড়গ্পুরে ট্রেন থামতে পড়ি-মরি করে বাস ধরবার দৌড়। রেল লাইন পেরিয়ে বাসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বাসের সব সীট ভর্তি। ভাগ্যে জুটল একেবারে পেছনের আসন। মুমুর নাগাড়ে বকবকানি সহ্য করতে হবে না বলেই সমীর বসল বেশ কয়েকটা সীট আগে আগে। চাঁদার কৌটো ঝাঁকিয়ে যে-ভাবে লোকে পয়সা চায়, বাসের পেটে খুচরো হয়ে আমরা সেইরকম ঝাঁকানি খাচ্ছিলাম। একেবারে পেছনের সীটের ওটাই মজা। শিরদাঁড়া খুলে যাবার উপক্রম। হাড় ডিগডিগে মানুষের ভিড়। সঙ্গে শুঁটকি মাছ, পানের বটুয়া আর নিমকি বিস্কুট থেকে বাচ্চা ঢাকা দেবার লাল ফোল্ডিং মশারি বাদ নেই। নেহাত নিজের জেদে এসেছে বলে সব মেনে নিয়ে মুমু

চুপটি করে বসে আনচান চাইছে। তেষ্টায় জিভ এমন পাথর হয়ে গেছে যে ঢোঁক গিলতে পারছি না। কোথায় কতদিন আগে যে চা খেয়েছি মনেই পড়ে না। মেদিনীপুরের সঙ্গে ঠিক পরিচয় ছিল না। বাংলার মধ্যেই অথচ ভাষায় কত আলাদা। ভেতরের লোকগুলো বাংলাতেই কথা বলছে কিন্তু সে বাংলার একবর্ণও বুঝতে পারা যায় না। কোলের ব্যাগটা বাড়িয়ে রেখে মুমু দেখলাম কোনোরকমে হুমড়ি-খাওয়া ভিড় ঠেকিয়ে রেখেছে। বললাম, ওদের জিগেস করব ওরা কোথায় নামবে? সে জায়গাটাই বা কতদূর?

মুমু চোখ পাকিয়ে বলল, দেখ না বলে, মেরে মুণ্ডু ভেঙে দেবে তোমার।

কোথায় যাবে গো তোমরা—ইত্যাদি দিয়ে শুধু করতে ফল উলটো হল। শহুরে গন্ধওলা মানুষদের কাছে পেয়ে ওরা আরো ঘন হয়ে এল আমাদের দিকে। চারিদিকের ঘেঁষাঘেঁষি বোটকা গন্ধে রেগে মুমু ঘাড় বেঁকিয়ে রইল বাইরে। এ-সব দূরপাল্লার বাসে কেউ কখনোই ধূমপান নিষেধ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফস করে একটা সিগারেট ধরাতেই মুমু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এবার তোমায় ওরা ঠিক চুলের মুঠি ধরে বাস থেকে দূর করে দেবে।

ওর কথার জবাব না দিয়ে শুধু ওর মাথাটা আস্তে ঘুরিয়ে কাছেই এক ভিড় বিড়ির আগুনের দিকে ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু সিগারেট টানব কি, শুকনো গলায় ধোঁয়াটা পেঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, নিচে নামছে না। এদিকে শিরদাঁড়া খুলে প্যাণ্টের তলা দিয়ে নেমে যায়-যায়। হাত তুলে ঘড়ি দেখতেও ক্লান্তি।

ক-টা বাজল বল তো?

জুনিয়ার জ্যাকপেলো জিগেস করল।

খানিকটা অবাক হয়ে আমি উলটে ওকে প্রশ্ন করলাম, তুমি নিজে ঘড়ি পর না কেন?

ঘড়ি পরতে আমার মোটে ভালো লাগে না। তা ছাড়া কি হয় ঘড়ি দিয়ে। প্রত্যেক মানুষের মুখেই তো সময় লেখা থাকে, তাই

না? আর আমাদের দেখে যে-কোনো দোকানে, টাওয়ারে, গীর্জায় স্টেশনে ঘড়ি আঁটা থাকে। একটু চোখ খোলা রাখলেই সময় ঠিক চোখে পড়তে বাধ্য। সুতরাং—

এমন অকাট্য যুক্তির পরে আমার আর কি বলার থাকতে পারে। হেসে বললাম, তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তোমার খিদে পেয়েছে এবং এটা এখন তোমার খাবার সময়। আমি আটকাব না তোমায়, তুমি স্বচ্ছন্দে খেতে যেতে পার। আমি তো ডেকে আছিই, সুতরাং ভয়টা কি তোমার।

একটা ছেলেমানুষের মতো ঝলমলে হাসির রোদে ওর মুখটা ভরে গেল। বলল যে, তোমার অনেক দয়া। কিন্তু আমি চলে গেলে এই বলবেয়ারিং কেসগুলো টালি করবে কে? আমাদের আর দ্বিতীয় ডিউটি অফিসার নেই যে।

ওকে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, ওসব কেস আর এ বেলা যাবে না। দেখছ না সব হেভি মাল দিয়ে জ্যাম আছে। উপরের ঐ হেভি-গুলো না গেলে আর বলবেয়ারিং চালানো যাবে না। তার থেকে তুমি খেয়ে এসে বরং হেভি-ডেরিক রেডি কর তা হলেই অনেক কাজ হবে।

তুমি বলেছ ঠিকই, কিন্তু খাবার যে আমার এখনো বহুত দেরি। একটার আগে কেউ খাবার দেবে না আমায়। ইতিমধ্যে অন্তত একটা বীয়ার না খেলে তো গলা শুকিয়ে কাঠ।

সত্যিই জিভ একেবারে শুকনো মাটির মতো খটখটে। কি একটা জায়গায় বাস থামাতেই দেখলাম গরম চা। ভিড়ের চোটে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু তার হাতের ধূমায়িত কেটলিটা চোখে পড়ছে।

সেই অদৃশ্য মানুষটার হাতে পয়সা চালান করতেই ইয়া মোটা কাঁচের গ্লাসে তিনটে জিভ-পোড়ানো চা জুটে গেল। ভিড় মারফত সমীরের চা-টা সামনের দিকে চালান করে দিলাম এবং সমীরের মৃদু হাসি দেখে অনুমান করলাম চা যথাস্থানে পৌঁচেছে। ভিড়ের

ঢেউয়ে আবার সমীরের দিক থেকে ভেসে এল নিমকি নামক ঠাণ্ডা ঘিয়ে-ভাজা পিচবোর্ডের টুকরো। ঝটপট শেষ করে আঁচলে মুখ মুছে চোখ গুলি গুলি করে মুমু জিগেস করে, তুমি তো এখন চায়ে ঠোঁট ঠেকালে না। বাস ছেড়ে দিলে গ্লাস ফেরত দেবে কি করে?

আমার জিভ কি তোর মতো? তোর তো টিয়াপাখি কাকাতুয়ার মতো একেবারে পাথরের জিভ। মুখের ভেতর জিভ নড়লে টক্‌টক্ শব্দ হয়। ঐরকম পাথরের জিভে ঠাণ্ডা গরম কিছুই মালুম পড়ে না। মুমু জিভ ভেঙিয়ে বলল, আহা রে, আমার জিভ কাকাতুয়ার, আর নিজেরটা কি জিভেগজা? এবার জিভ বার করলে এমন টান মারব তখন দেখবে মজা।

আমি দেখলাম চা শেষ করার আগেই বাস ছাড়বে, অথচ তাড়াতাড়ি শেষ করলে জিভ পুড়বে কিন্তু তেষ্টা মিটবে না। সুতরাং বাসের যাত্রা-সূচক গা-পেটার সঙ্গে সঙ্গে আমি চায়ের গেলাসটা যে-ভাবে পেয়েছিলাম ঠিক সেই ভাবেই ফের সেটাকে ভিড়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম। কিন্তু তেষ্টায় যখন সত্যিই ছাতিফাটা তখন বাসটা একটু থামতে হঠাৎ যেন 'শরবত শরবত' হাঁক শুনলাম। পাগলের মতো একটা গেলাস ছিনিয়ে নিয়ে মুখে দিতেই প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। মিষ্টি নেবুর শরবত। এক চুমুকেই শেষ। মুহূর্তে যেন শরীরের সমস্ত বদরক্ত জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। লোকটার সর্বতোমুখী প্রতিভাকে আশীর্বাদ করলাম প্রাণ ভরে। মুমুর মুখেও হাসি। ছোট্ট ঝকঝকে চোখ-দুটো খুশির রবিবার।

ঠিক এমনি এক খুশির রবিবারে মেজাজে ডকে গেছি। শীত চলে গেছে কিন্তু বসন্ত তখনো সাবালক হয় নি এমন-এক দো-আঁশলা মেঘ মেঘ কুয়াশা-নীল সকাল।

কুয়াশার জন্যে সূর্য উঠতেও বেশ দেরি। ওঠার পরেও অনেকক্ষণ আলোটা হিমে-ভেজা। চার নম্বর কিং জর্জ ডকের উপর সেই ভেজা রোদ মাড়িয়ে একা একা হাঁটছি। সারা শেড ফাঁকা। অসহ্য নিস্তব্ধ শেডের মধ্যে নিজের পায়ের শব্দটাও কেমন যেন বিদেশীর

মতো লাগছে। 'মারারি' জাহাজের ছ নম্বর হ্যাচের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। ওখানে ফ্লোটিং ক্রেনে হেভি লিফ্‌ট নামা দেখছি। এক একটা মালের ওজন দশ-বারো টনের কম নয়। তারের শক্তির চেয়ে বেশি ভারি একটা রোলার লাগানো হয়েছে। ফোরম্যান মিস্তির মালের নিচে মাথা গলিয়ে ওজনের মার্কা পড়ার চেষ্টা করছে, উপর থেকে আমাদের প্রাণ ধুকপুক করছে। এখন যে-কোনো মুহূর্তে ওর মাথাটা চেপ্টে একেবারে পাতলা খবরের কাগজ হয়ে যেতে পারে। নিচে থেকে বিশাল রোলারটা ধীরে ধীরে উপরে না ওঠা পর্যন্ত একেবারে নিশ্বাস টিপে রাখার অবস্থা। থাকতে না পেরে উপর থেকে মিস্তিরকে চেঁচিয়ে সাবধান হতে বললাম। অথচ মালটা বোটে নামবার আগেই ওরা সবাই অন্য মাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। প্রায় শ্মশানের চণ্ডালের মতো। হাতের মড়া আধপোড়া হতে হতে নতুন মড়ার জন্যে কাঠ সাজাবার মহড়া। ভাবছি আরো কিছুকাল গঙ্গার কোলে-পিঠে কাটিয়ে দিলে আমিও একদিন এমনি চণ্ডাল হয়ে যাব। মন্দ কী। চীফ অফিসার কোল্‌স্‌ বলছে সূর্য ডোবার পরে আর সে ভারি মাল চালাতে চায় না। ধীরেই ভালো। বেশি বাহাদুরিতে কাজ নেই। ওর মতে, Do not act in haste and repent in laisure. আসলে কিন্তু এ-সব বড় বড় কথার আড়ালে ও নিজস্ব একটা ভয় লুকিয়ে রাখতে চায়। নিজে সূর্যাস্তের পরেই কোনো মাসির বাড়ি রাত কাটাতে ছুটবে আর তখন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তো চীফ নিজেও পার পাবে না। মুখে কোনোদিনই এটা স্বীকার করবে না জানি। ঝুটমুট আমাদের খোঁচা দেবে রোজ তাড়া লাগাবে অথচ কাজ করতে চাইলে বলবে রাত্তিরে কাজ নয়।

রাগও ধরে হাসিও পায়' বললাম, তার চেয়ে এক কাজ কোরো চীফ, জাহাজে মালের বদলে মাছি ভর্তি করে নিয়ে এসো। তাতে মোটা ফ্রেটও পাবে আর হ্যাচগুলো খুলে দিলেই মুহূর্তে সব মাছি উড়ে যাবে, দশ মিনিটে পুরো জাহাজের মাল খালাসের কাজ খতম।

হয়তো অ-ভারতীয় বলেই রেগে না গিয়ে আমার তামাশায় খুব একচোট হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামতে বলল তাতে তোমাদের খাদ্য সমস্যাও খানিকটা মিটবে, প্রচুর উড়ন্ত খাদ্য পেয়ে যাবে, তখন শুধু ধর আর খাও।

আমি ধাঁ করে বলে ফেললাম, যেমন তোমরা ষাঁড়ের জিভ আর ল্যাজ খাও, ও খাদ্যটা হয়তো তার থেকে খারাপ হবে না।

কোল্‌স্‌ হাসতে হাসতেই বলল, ওগুলো খাই ঠিকই কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না যে হল্যাণ্ডে শুয়ার পুষতেও লাইসেন্স লাগে।

যাদের বংশ পরিচয় আছে শুধু সেইসব শুয়ারকেই মানুষ করা চলে, যাদের বাপ-মার ঠিক নেই তাদের পচা আলুর মতো মেরে ফেলে দেওয়া হয়। শুয়ার গরু ভেড়া ষাঁড় সব কিছু সম্বন্ধেই আমরা এতখানি সতর্ক থাকি। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমরা ল্যাজ-খুর যাই খাই তোমাদের সমস্ত মাছি-ভ্যানভেনে খাবারের থেকে তা শতগুণে পরিষ্কার।

কথাটা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। জানি অস্ট্রেলিয়ায় বা আমেরিকায় টন টন আলু গম ইত্যাদি বেশি হলে পুড়িয়ে দেওয়ার নিয়ম আছে। সুতরাং বাপের ঠিক নেই এমন শুয়ারের বাচ্চাকে মেরে ফেলা হয় এ আর বেশি কথা কি। অথচ আমার দেশে এখনো তো মানুষ ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খায়। আমরা আজও ডানহাতের বকশিস ফুরতে না ফুরতে বাঁ হাত পাতি অন্য আর একটা দেশের দিকে।

ফলে, কি উত্তর দেব কোল্‌স্‌কে? কবে পৌঁছুব, কখন পৌঁছুব ওদের মতো সবপেয়েছির দেশে কে বলতে পারে?

রাত ন-টায় কিন্তু সত্যি সত্যি কাঁথি পৌঁছে গেলাম। বাসের সবাই প্রায় নেমে যেতে বাসটা হালকা হয়ে গেল। একটু হাত-পা ছড়িয়ে নেবার জন্যে আমরা নামলাম, সমীর বসে রইল সিট আগলে। নেমেই সামনের দোকান থেকে সিঙাড়া কচুরি সন্দেশ যা পেলাম গলাধঃকরণ করলাম আর সমীরের জন্যে কিছু সঙ্গেও

নিলাম। মুমু কিন্তু স্রেফ শশা আর ডালমুট। একটা ফেরিওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে ও কি সব বকবক করছিল।

বললাম, এই তাড়াতাড়ি নে, বাস ছেড়ে দেবে।

ওতে আর একটু নেবুর রস দাও তো।

শোন, কি সব যা-তা খাচ্ছিস, যখন পেটের—

দূর ছাই, তোমার ঝালনুন নেই ?

আমি তোকে যা বলছি শুনছিস, ডালমুটে কি পেট ভরবে—

মাগো, তোমার বাদামগুলো বিশ্রী মিইয়ে গেছে।

বুঝলাম এখন মুমুকে কিছু বলতে চেষ্টা করা বৃথা। অগত্যা ড্রাইভার সায়েবের সঙ্গে আড্ডা জমাবার তাল করলাম।

বেশ মোটাসোটা মোলায়েম ধরনের মানুষটাকে প্রথম আলাপেই ভালো লেগে গেল। একটা কাপড়ের জারকিন পরার জন্যেই হয়তো বুকের ছাতিটা মস্ত লাগছে। হয়তো একটু বেশি বকে, রাস্তা সম্পর্কে হয়তো একটু বেশি জ্ঞান দেখাবার চেষ্টা, তবু কথায় আর হাসিতে এমন একটা নিশ্চিন্ত শিশুমি ছিল যা ভালো না বেসে পারা যায় না। তা ছাড়া রাস্তা সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার জন্যে ওকে দোষী করা যায় না। যে-কোনো ভালো চালকের কথা বলার ওটাই তো প্রিয়তম বিষয়। রাস্তার গল্পে রাস্তা যত দুর্গম হবে, ভয় থাকবে, বাধা থাকবে, ততই শ্রোতার কাছে ড্রাইভারের দাম বাড়বে। বললাম, আপনাকে তো রোজ এই ঝাঁকানি আর কষ্ট সহ্য করে যাতায়াত করতে হয়, তাই না ?

উত্তরে স্পেনসারট্রেসির মতো দার্শনিকসুলভ হাসি দিয়ে ড্রাইভারসায়েব বলল, উপায় কি বলুন, আসল ঝাঁকানিটা তো পেটে, সুতরাং চোখের জল বেরুলেও সইতে হয়।

একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব করে মুমুর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, যাঃ, তোর দেরির জন্যে ভালো সিটগুলো সব বেহাত হয়ে গেল।

আপনার কোথায় যাওয়া হয়েছিল মশাই ?

ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করছিলাম।

ড্রাইভারটা আবার কে ?

আসলে ভিড়ের দেওয়ালের ওপারে ড্রাইভার বলে যে একটা বস্তু আছে তা মুমু কেন, আমরাও ঠিক দেখি নি। বললাম, ঐ যে মোটা লম্বা জারকিন পরা লোকটা—

মুমুর হঠাৎ হি হি শুরু হয়ে গেল। রেগে বললাম, এতে হি হি হি করার কি হল আবার ?

তুমি বললে 'মোটা লম্বা' তাই হাসি পেল। কী বোকা তুমি, একটা লোক মোটা আর লম্বা দুই-ই হতে পারে নাকি ?

কেন ? মোটারা কি লম্বা হয় না ? না, লম্বারা মোটা হতে পারে না ?

আমি ওসব ছাতামাতা জানি না। মোটা-লম্বা শুনলে আমার হাসি পায়—ব্যাস। কোনো বইতে তুমি কখনো দেখেছ মোটা-লম্বা লেখা থাকে ?

এ ধরনের প্রশ্নের কি জবাব হয় জানি না। এখন কোনো রকমে ওকে টেনে বাসে ওঠাতে পারলে বাঁচি। বললাম, ঠিক আছে। এখন বাসে না উঠলে বাস ঠিক ছেড়ে দেবে।

তুমি যা পচা নেবুর শরবত খাইয়েছ, ম্যাগো সেই জন্যেই তো ডালমুট খেতে হল। একটু জল না খেয়ে আমি কিন্তু নড়ছি না।

কাছেই একটা টিউবওয়েলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফের মুমুর বকবকানি শুরু হল, আমি পাম্প করব, আগে তুমি খাও, তার পর আমি। স্কুলে রোজ আমি একলা পাম্প করি। সুনন্দাটা এত ন্যাকা না, একবার পাম্প করেই বলে হাত ব্যথা করছে। আমায় বলে আমার নাকি ছেলেদের মতো হাত, তাই আমি পারি। আচ্ছা, তুমিই বল বিমলুদা, আমার কি ছেলেদের মতো হাত ? এইজন্যে সুনন্দাকে একদিন এমন দিয়েছি না, আর জীবনে আমার সঙ্গে লাগতে আসবে না। যেই জল খেতে এসেছে এইসা জোরে পাম্প করেছি যে চোখে-মুখে জল ঢুকে শাড়ি-ব্লাউজ ভিজে ঢোল।

তুই পাম্প করবি না বকবক করবি।

মুমু অনেক টানাহ্যাঁচড়া করেও কিছুতেই জল বের করতে পারল না। খানিক আগে এত বীরত্ব দেখিয়ে এখন একেবারে লজ্জায় মাথা কাটা। এমন একটা বেচারা-বেচারা মুখে তাকাল যে বড় মায়া হল ওকে ঠাট্টা করতে। বললাম, তোর দোষ নেই, এটার ওয়াশারটা খারাপ আছে।

আসলে ওয়াশারটা শুকিয়ে গিয়েছিল। সামনের দোকান থেকে দু গেলাস জল ঢেলে দিতেই ওটা ফের চালু হয়ে গেল। একপেট জল খেয়ে আঁচলে সরু চিবুকটা মুছতে মুছতে মুমু বাসে উঠল। ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি গ্যাঁট হয়ে বসলাম। দীঘায় পৌঁছে গেলাম ঠিক রাত দশটায়। কো-অপারেটিভের একটা শাদা চুনকাম করা বাড়ির দু তলায় দুটো ঘর পেলাম। মুমু একা শুতে ভয় পায়। সে আর সমীর একটা ঘরে শুলো, আমি শুলাম অন্যটায়। শাদা সী-গালের পাখায় দুটো দিন সমুদ্রে উড়ে উড়ে ঘুরল। ঘরের সামনেই খোলা ছাদ। সমুদ্রের হাওয়া যেন উড়িয়ে নেবে ছোট্ট শাদা বাড়িটা। তার পর কতবার দীঘা গেছি, কিন্তু সেই শাদা বাড়িটা আর খুঁজে পাই নি। রাত এগারোটার পর আলো নিভে যায়। মুমু-সমীর ওরা আগেই শুয়ে পড়ল। বেচারী মুমু। আশি মাইলের উপর বাসের ঝাঁকুনি সহ্য করে আমাদেরই দাঁড়াবার শক্তি নেই। ওর মতো মেয়ে বলে তাই মুখের কামাই নেই। এখানে পৌঁছে আর পারে নি। কোনোরকমে খেয়েই ঘুম। একটা কাঠের চেয়ার টেনে খানিকক্ষণ একলাটি ছাদে বসে সিগারেট টানলাম। দারুণ হাওয়ায় মনে হচ্ছে তারার সামিয়ানা দেওয়া সারা আকাশটাই বুঝি এক্ষুণি ছিঁড়ে-খুঁড়ে উড়ে যাবে। এর মধ্যেই কাজের কলকাতা কতদূর চলে গেছে। এখন চোখের সামনে শুধু অস্থির শব্দময় অন্ধকারের গায়ে অবুঝ দামাল সমুদ্দুর। তার ওপারে অস্পষ্ট রেখায় জাহাজ ডক ক্রেনডেরিকের কলকাতা এখন বহুদূর। ঘরের ভেতরে তেলের কুপিটা লম্পট হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনোরকমে নিজের সতীত্ব বাঁচাতে নিভু-নিভু।

সকালে ছাদে বেরিয়ে দেখলাম ঘন ঝাউবনের সারি। তার ফাঁকে ফাঁকে খুব অল্পই সমুদ্রের শরীর চোখে পড়ে। কারুর তর সইছে না। ফলে, মুখ ধুয়েই সবাই চলে এলাম সমুদ্রের ধারে। একটা বাচ্চা ছেলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার দিদির কাঁকড়া-ধরা দেখছে। বিরাট আকাশ-সমুদ্দুরের পটে তাদের সিলিউট একটা সুন্দর স্টিল হয়ে আছে। ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে একটুও সময় লাগল না মুমুর। ঐ বাচ্চা দুটির সঙ্গে আর একটি যে বড় ছেলে এসেছে সে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে একা একা সিগারেট টানছিল। মুখ দেখলে মনে হয় আমাদের চেয়ে বয়েসে ছোট। কিংবা হয়তো একটু মাকুন্দ ধরনের, অর্থাৎ দাড়ি-গোঁফ তেমন জোরালো নয় বলে মুখটা একটু বেশি কচি লাগছে। আলাপ হতে জানলাম ছেলেটি একাই এসেছে, ঐ বাচ্চা দুটির সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। ও থাকে নাকি সমীরদের পাড়া থেকে খুব বেশি দূরে না। রোদটা চড়া হতে মুমুকে বললাম, চল এবার ফেরা যাক। বড্ড রোদ।

মুমু বলল, রোদ তো কি, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাচ্ছেন।

দূরে কয়েকটা জেলের জাল টানা দেখে সমীর মাছ কেনার লোভে আমায় টেনে নিয়ে গেল। কিছু টাটকা চাঁদা মাছ পাওয়া গেল। ফেরার সময় মুমুকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম একটা ঝিনুক দিয়ে ও বালির ওপর লিখেছে 'চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে।'

মুমুদের ঘরের তক্তাটা একটু বড়। ওটাতেই শুয়ে শুয়ে আমি সমীর ঘুম-ঘুম আড্ডা দিচ্ছি। মুমুটা একবার ফিরেছিল, ফের চটি রেখে সমুদ্রের দিকে পালিয়েছে। ওর হালকা নীল রবারের চটিতে সমুদ্রের জল আর সোনালী বালি লেগে। হলুদ ডোরাকাটা তোয়ালেটা জানলার পাল্লায়। বিছানার এককোণে মাথার কাঁটা, ব্রা, দুটো সিনেমার পত্রিকা ছড়ানো। কাল রাত্তিরে যখন তালা খুলে ঘরটায় ঢুকেছিলাম, তখন ঘরটা ছিল কত অচেনা, অথচ আজ চারদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ঘরটাতে মুমু যেন কতদিন

আছে। খানিক বাদেই মুমু এল ঝড়ের মতো। সঙ্গে সেই মাকুন্দ ছেলেটা।

বিমলুদা, বল দিকি এটা কি ফুল? তুমি বলে দিও না সুজিতদা।

ছেলেটির নাম সুজিত ঘোষ। চারুচন্দ্রে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। মুমুর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, ওটা বুনো ফুল।

মুমু খিলখিলিয়ে বলল, জানে না তবু ডাঁট মারবে। এখানে আর চালাকি নয় মশাই, এ-ফুল তুমি জীবনে দেখ নি। কাজু ফুল। আমি না জানতামই না কাজু গাছে হয়। সুজিতদা আমায় কত কাজু গাছ দেখাল। তোমরা তো কুঁড়ের ঢেঁকি। সকাল থেকে খালি ঘুমোচ্ছ। চল, এক্ষুণি দেখিয়ে আনতে পারি গাছ ভর্তি কত কাজু হয়ে আছে? যাবে?

হাই তুলে বললাম, দূর, বিকেলে দেখা যাবে।

সুজিত বলল, আপনারা ওদিকটায় যান নি, ওদিকটা কিন্তু বেশ সুন্দর!

সমীর চোখ বুজেই ঘুম জড়ানো গলায় বলল, আরে ভাই, আমরা এসেছি স্রেফ সমুদ্দুরের হাওয়ায় পড়ে পড়ে ঘুমাতে। ওসব ওঠা-হাঁটার দিকে নেই।

সমীর যতই সুজিতের উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢালার চেষ্টা করুক, সুজিত মনে হচ্ছে দমবার পাত্রই নয়। বলল, এখানে এত সুন্দর হার্ড বীচ, কত কি করা যায়। আমার ছোটমামা ইউ-কে-তে থাকেন, ওখানের কত বীচের ছবি পাঠিয়েছেন। ওখানে কত স্কোপ। এখানে এত ভালো বীচ কিন্তু কোনো ফান্ নেই। আসলে আমাদের কোনো স্পোর্টসম্যান স্পিরিটই নেই।

সুজিতের কথার মধ্যে ইংরিজি শব্দগুলোর যেখানে 'এস' আছে সেখানেই ও দাঁতে দাঁত চেপে 'এস-এইচ' দিয়ে উচ্চারণ করছে। শুনলে গা শিরশির করে। বেশ বোঝা যায় ছেলেটা একটু গবেট আছে। সমীর আবার ঐসব বিলেত-টিলেতের ফুটানি একদম পছন্দ

করে না। ভয় হচ্ছিল সমীর হয়তো এখুনি ওর মুখের উপর দু-কথা শুনিয়ে দেবে। হয়তো এখুনি জিগেস করবে লাইফ মানে কি, স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বলতে কি বোঝ ইত্যাদি। জানি সমীরের মাস্টারি করার স্বভাবটা এখনো যায় নি। কোনো রকম ফাঁকা বুলি ও একদম সহ্য করতে পারে না। যতই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে সাধারণ রকবাজ ছেলেরা একটু সবজান্তা টাইপের হয়েই থাকে, তার জন্যে এত মাথাফাটাফাটির কি আছে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। এ-সব জানি বলেই আমি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে জিগেস করলাম, তোমাদের বাড়ি কি আলেয়া সিনেমার পাশের গলিটায়? মানে মণ্টুবাবুর চায়ের দোকানটার আসপাশে কোথাও?

সুজিত বলে, ঠিক ধরেছেন তো। মণ্টুর চায়ের দোকানের ঠিক দুটো বাড়ি পরেই আমাদের বাড়ি। আপনি দোকানটা চিনলেন কি করে? আপনাকে তো ওখানে দেখি নি কখনো। আমাদের ওখানে সলিড আড্ডা চলে, সবাই মুখ চেনা—আপনাকে কিন্তু…।

আগে খুবই যেতাম, এখন আর সময় পাই না—

সুজিতকে মাঝপথে কেটে দিয়ে খানিকটা রুক্ষস্বরেই জবাব দিলাম। ছেলেটার কথা বলার ধরনটাই কেমন গা-চিড়চিড় করে। মণ্টুবাবু যথেষ্ট বুড়ো মানুষ। তাকে হঠাৎ 'মণ্টু' বলার মধ্যে নিজের চোয়াড়েপনা ছাড়া আর কি প্রকাশ পায় জানি না। তার উপর ফের সেই এস্-এইচ দিয়ে দাঁত টিপে সলিড উচ্চারণ। সব মিলিয়ে একটা মাছের শাদা কাঁটা গলার ভেতর যেন খচখচ করতেই লাগল।

আমাদের গতকালের ড্রাইভার আজ বিকেলে খালি বাস নিয়ে কাঁথি ফিরে যাচ্ছে। দীঘাটা একচক্কর ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে আমাদের বাসে তুলে নিল। বিরাট ফাঁকা বাসটায় আজ আমরা মাত্র চারজন। কত লোক ভুল করে হাত দেখাচ্ছে বাস থামাবার জন্যে। বাসের ভিতর থেকে মুমু তাদের দিকে উলটে হাতনাড়া দিচ্ছে আর হি হি করছে। একটু ঘুরে আমরা নেমে গেলাম।

ড্রাইভার সায়েব শেষ বিদায় জানিয়ে শেষ বিকেলে হারিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল এদিকে এলে আবার দেখা হবে। তবে এ-সব সমুদ্দুরের দেশে ভাইবোন নয়, অন্য কারুকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টারও আলাপ নয়, অথচ লোকটা চোখ থেকে মিলিয়ে যেতে মনে হল ওর সঙ্গে যেন কতকালের আলাপ। মাথা-দোলানি লম্বা লম্বা ঝাউবন আর উগ্র গন্ধভরা কাজুবন পেরিয়ে একটা নীল-নিঃসঙ্গ হাওয়ার ঘুরঘুর। রাত্তিরে সমুদ্রের উপর ফসফরাসের রূপালি হিজিবিজি দেখতে দেখতে ঘুম আসে। এখানে রান্নার কাজ দেখে ইয়াকুব। লম্বা ঝ্যালঝ্যালে চেহারা। গায়ে আধময়লা হালকা সবুজ শার্ট। চওড়া চোয়াল আর কপালে কিছু জটিল রেখা, নাকটা ঢালুর দিকে এবড়ো-খেবড়ো, তলায় কাঁচা-পাকা একটু গোঁফের জবর-দখল কলোনি। গলার স্বরটা ভাঙা ভাঙা। কিন্তু রাধাঁর হাতে দ্রৌপদীকে হার মানায়। বলেছিলাম ভোর-বেলায় তুলে দিতে, ইয়াকুব রাত তিনটের সময় ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সঙ্গে দিল মোটা মোটা বেশ কিছু ডিমের স্যাণ্ডউইচ। যেখানে আলো ফুটবে, বাস থামবে, সেখানেই চায়ের সঙ্গে ওগুলোর গতি করা যাবে।

আকাশের নীল থালায় শাদা জুঁইয়ের মতো একরাশ তারা। সমুদ্র এখনো ঘুমিয়ে। এখনো ভোরের হাওয়া ওঠে নি। তবু চলতি বাসের হাওয়ায় গা শিরশির করে। কালি-ধ্যাবড়া তেলের নিভু নিভু কুপিটা বুকে নিয়ে শাদা বাড়িটা ফ্যাকাশে ভোর আর শাদা তারার তলায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। হাতের কনুইয়ে তার গায়ের শাদা চুন তখনো লেগে।

মুমু দেখতে পেয়ে একটু ফিক করে হাসল। তার পর নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল। আমার খালি ঘুম আসছে আর সমীরটা পেটে খোঁচা মেরে হাসছে।

আমি ঘুমে চাইতে পারছি না আর তুমি হাসছ? তুমি তো আচ্ছা লোক?

জার্মান চীফ অফিসার বাইসেল আমার দিকে একপলক উইঙ্ক করে গতকালের রিপোর্ট নিয়ে স্পেসের অঙ্কে মন দিল।

আমি বললাম, তোমাকে ঘুমোতে কে বারণ করেছে। কাল সারারাত কোথায় মজা মেরেছ, এখন সকাল থেকে ঢুললে লোকে হাসবে না?

কাচুমাচু মুখে বাইসেল বলল, ছাখ, এই তো শেষ দুটো দিন। এর পর আবার কতকাল পরে ভালো পোর্ট পাব তা জান? মাসের পর মাস দিনরাত জল যে কি জিনিস তা তোমরা তীরের মানুষ বুঝবে না কোনোদিন। জানি, তোমাদেরও খাটাখাটনি কম নয়। আজকের দিনে কেই বা বসে খেতে পায়। কিন্তু তফাতটা কোথায় জান? সারাদিন গাধার খাটুনি খেটেও তোমরা জান যে রাত্তিরে তোমরা বাড়ি ফিরবে, যেখানে তোমার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, পরিচিত বিছানার শান্তি আছে। কিন্তু আমরা? মাস থেকে বছর গড়িয়ে গেলেও জল ছাড়া আর কিছুই দেখি না। জলের পোকার মতো আজীবন ভাসা। এই অবস্থায় একটা কিছু না পেলে তো পাগল হয়ে যেতাম। তাই স্থল দেখলেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময় দেখবে যারা ছেলেবেলা থেকে এই জলের সংসার মেনে নিয়েছে, বুড়ো বয়েসে ক্যাপ্টেন হয়ে তাদের অধিকাংশই একা একা দিনরাত মদ খায় আর রিটায়ার করতে না করতেই পট করে মরে যায়। আমি তাই ঠিক করেছি এ শালার জলের কাজ আর করব না। বিয়ে করার আগে একটা তীরের কাজ জোগাড় করতেই হবে। ব্যস, তখন এই জলের পোকা খতম। তখন আমি আবার তোমাদের মতো ভদ্দরলোক। কিন্তু কোট-টাই পরে অফিসের কাক-তাড়ুয়া হতেও যে ঝকমারি লাগে—এই তো মুশকিল। ভালো জামা কাপড় পরা সেই কবে ছেড়ে দিয়েছি। এই জলের রাজ্যে কেই বা দেখছে। এই ছোট্ট জাঙিয়া আর শাদা শার্ট পরে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে টাই কোট পরার নামে দম আটকে আসে।

আমি বললাম, ছাড়ো চাকরি। তার চেয়ে তোমার বাড়ির

বাগানে খাল কেটে জাহাজ ঢোকাও। ক্যাপ্টেন হয়ে ওখানেই রোজ ডেকে লাফালাফি করবে আর আমি তোমার সাকরেদ হয়ে মাল তুলব।

বাইসেল একটু সোনালী হাসি ছেড়ে বলল, তা হলে জাহাজের ডেকেই বেশ ফুলবাগান করা যায়, কি বল ?

আমি বললাম, ফুলগাছ কেন, তার থেকে আপেল গাছ কর যাতে করে সেই অ্যাডমের আপেল থেকে অল্ দি ইভল্স্ আর প্রোডিউস্ট।

আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়ে বাইসেল বলল, বউ তো তা হলে মেরে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে, তখন আবার যে জলের পোকা সেই জলের পোকাই থেকে যাব।

কথাবার্তার মধ্যে খাকি ফুলশার্ট পরা এক ছোকরা দরজায় খুটখুট করল। পরিষ্কার বাংলায় বলল, জল দেওয়া এবার বন্ধ করব নাকি সায়েব, টাঁকি তো ভর্তি হল।

ভাষার দুর্বোধ্যতায় বাইসেল অসহায় চোখে আমার দিকে তাকাল। ওকে বোঝালাম যে লোকটি খাবার জলের ব্যাপারে এসেছে। জল যা চেয়েছ তা দেওয়া হয়ে গেছে, আফটার এবং ফোর পিক্ ভর্তি। ডোম্যাস্টিক-এও বেশ জল আছে। সুতরাং এখন এর কি করণীয় তা জানতে চায়। বাইসেল একটিও কথা না বলে একটা চিরকুট সই করে ওর হাতে গুঁজে দিল। ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝলাম না বলে জিগেস করলাম।

বাইসেল বলল, আরে ওকে স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে একটা বীয়ার পাবার অনুমতি লিখে দিলাম। পয়সাকড়ি তো নেই। কাজ করে বকশিস চাইলে তাই বীয়ার বা দু-এক প্যাকেট সিগারেট অথবা সাবান ইত্যাদি একটা কিছু দিয়ে নগদ বিদায় করি।

বললাম, তা না হয় হল। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমায় চা নেবার একটা জায়গা দাও অন্তত। সব শেষের জন্যে তুলে রাখলে হয়তো একগাদা মাল কাট-আউট হয়ে যাবে।

চীফ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল, ঐ তো তোমাদের রোগ। কেউ সিগারেট-বীয়ার চাইছে, আবার কেউ খানিকটা জায়গা পাবার আশায় ঠিক ওৎ পেতে আছে। আর তোমরা এত বড় স্বার্থপর, খালি নিজেদের ধান্দাবাজীটা বোঝ। আমার অবস্থাটা একবারও গা কর না। এখন চা নেবার জায়গাটাই বা কোথায়? আগে চা নিয়ে তার উপর তো লোহা নেওয়া যায় না। আর ডার্টি হ্যাচ করেছি একনম্বর হ্যাচটা। ওখানে রাজ্যের চামড়া, হাড়ের গুঁড়ো শিংয়ের কুঁচো—এ-সবের সঙ্গে যে চা চলবে না তা তুমিও জান। সুতরাং?

সুতরাং আমায় তুমি যমের বাড়ি পাঠাবে—আর কি?

বাইসেল হেসে বললে, না, তোমায় ঠিক যমের বাড়ি পাঠাবার কোনো মতলব আপাতত আমার নেই। তোমার বউটা বিধবা হয়ে শেষে আমায় গাল পাড়বে। তার চেয়ে জলদি লোহা শেষ করে হ্যাচে ঠেলে চা চালাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ও তো বলেই খালাস। অথচ লোহাটা চেপে কাজ করতে গিয়ে আমায় সত্যিই প্রায় যমের দুয়ারে হাজির হতে হয়েছিল।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছি। মাথায় ফুটফুটে নীল আকাশ প্যারাস্যুট-সিল্কের ছাতা ধরে আছে। এটা মস্ত সান্ত্বনা। এই অবস্থায় একটু বৃষ্টি এলে একেবারে চিত্তির। হু হু শব্দে লোহার রেল চলছে। এক এক সিলিংয়ে প্রায় দেড় টন উঠছে। পাক্কা দু টনের ক্রেনগুলো লোহার সারস পাখির মতো ঠোঁটে খড়কুটো তোলার মতো অনায়াসে লোহা তুলে হ্যাচে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু হ্যাচের ভেতরে মাল সাজানো ঠিক হচ্ছে কিনা বোঝা মুশকিল। দু পাশের ডেকে রাজ্যের ড্রাম নিয়েছে, তার উপর উঁচু করা কাঠের পাহাড়। পা ফেলার জায়গা নেই। কোনো রকমে একটা সরু আলপথ। সেটা দিয়ে এগিয়ে আমি দু নম্বর হ্যাচে উঁকি মেরে দেখছিলাম। মাথার ভেতর কি সব আবোল তাবোল হাওয়া। কতদিন সমীরদের বাড়ি যাই নি। মুমুটা কেমন আছে। ফোনে

বলেছিল, না এলে জন্মের মতো আড়ি! আর আড়ি! আমার মরার সময় নেই। কাল সারাদিনটাই প্রায় জাহাজে কেটেছে। আজও তাই। ফিরতে রাত আটটা-ন-টা। তার পর আর দু-পায়ের উপর দাঁড়াবারও শক্তি থাকে না। ঘুমের মধ্যেও শুয়ে শুয়ে পা কাঁপে। আমি শুলে কি হবে, পা তখনো ঠিক গ্যাংওয়ে দিয়ে নামা-ওঠা করে। এ কাজে কোনো শনি-রবি নেই। দিন সপ্তা মাস বছর একই নিয়মে কেটে যায়। ঘুমের মধ্যেও বহুদূর জল-কুয়াশা পেরিয়ে বুক-ভরা জাহাজের ভোঁ ভেসে আসে, স্টিম উইঞ্চ চলার জোর জল-ঢাকা শব্দের প্রতিধ্বনি শুনি। মনে হয় হাঙর-কুমীরের মতো বড় বড় জাহাজগুলো আমার ঠ্যাং ধরে সংসার থেকে মাঝদরিয়ায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে আমায় কামড়ে কামড়ে শেষ করে ফেলছে। কিংবা হয়তো আমার গলাটা ঘাড়টা ফুলে ফুলে একদিন জাহাজের চোং হয়ে যাবে। তার পর কিছুকাল বাদে সেখান থেকে শুধু কালো ধোঁয়া বেরুবে! সব ভুলে গেছি। মানুষজন বন্ধু-বান্ধব—এমন-কি নিজের মাথার বালিশের তোয়ালের রঙটাও মনে পড়ে না। কতদিন সেই চেনা রসা রোড দিয়ে হাঁটি না। কিছুদিন আগেও বাসে রসা রোড দিয়ে রাসবিহারী যেতাম। ট্রামের ফাঁকা সিটে মাথা-হেলানো সবুজ রবিবার। আজকাল আর অকারণে কোথাও যাবার সময় নেই। বাঁচবার জাঁতাকলে পড়লে কত ঝট করে সময়ের রোড-ম্যাপ ছোট হয়ে যায়। ছেলেবেলার সমস্ত বে-দরকারি হলুদ বিকেলের পথ-ঘাট বিলকুল বাদ পড়ে যায়, থেকে যায় শুধু টাকার পথে স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া কিছু খুঁড়িয়ে চলা ধুলোর সঙ্গে। একটা প্লেনের শব্দে মাথা তুলে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল। ঠিক মাথার উপরেই দেড় টন লোহার একটা সিলিং দুলছে। আমি উঁচু ড্রামের আড়ালে থাকায় ক্রেন-ড্রাইভারটা ঠিক দেখতে পায় নি। সে শুধু সিগন্যাল-ম্যানের হাতনাড়া দেখে সিলিং নামাচ্ছে। আর সিগন্যালম্যান বহুদূরে অফিসার্স ডেকে দাঁড়িয়ে। তার পক্ষে আমায় দেখা

একেবারেই অসম্ভব। একটুও সময় নেই। চেঁচালেও দেরি হয়ে যাবে, কেউ শুনতেও পাবে না। ব্যাপারটা ওদের বুঝতে বুঝতেই দেড় টনের অতি সামান্য টুসকিতে আমার মাথাটা চেপ্টে টুথপেস্ট হয়ে যাবে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে একটু কিছু করতেই হবে। সময় এখন সেকেণ্ডের ঘোড়ায়। বাঁচতে হবেই। যে-কোনো একদিকে লাফ মারা ছাড়া উপায় নেই। হ্যাচের দিকে লাফালে দেড়তলা নিচে লোহার উপর পড়ব এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুটি-ফাটা। তার থেকে উলটো দিকে ডেকের উপর লাফিয়ে একটা সুযোগ নেওয়া যায়। ইতিমধ্যে লোহাগুলো তুলতে তুলতে যে ল্যাসিং ওয়্যারটা ধরেছিলাম সেটা ছুঁয়ে গেল। আমি টাল সামলাতে না পেরে ডানদিকের তুটো ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে গলে অনেকগুলো তক্তার ফাঁকে ঢুকে 'দ'এর মতো আটকে গেলাম—শুধু মাথাটা জেগে আছে। সিলিংটা ধীরে ধীরে মাথার উপর দিয়ে হ্যাচের ভেতর নেমে গেল। সারা দেহে কোথাও একটু আঁচড়ও লাগল না, রক্ত বেরুলো না, শুধু ডেকহুক আর ওয়্যারের খোঁচায় প্যাণ্টটা হাঁটু থেকে তু-ফালা। ততক্ষণে অনেকেই ঘটনাটা জানতে পেরেছে। ভিড় জমাবার আগেই কিছু লাগে নি বাজি-হয়ে-গেছে টাইপে হাতের ধুলো ঝেড়ে প্রায় লাফিয়ে গ্যাংওয়ের কাছে চলে এসেছি। এখুনি বাড়ি ফিরেই প্যাণ্টটা আগে পালটাতে হবে। সবাই খুব বিচ্ছিরিভাবে দেখছে। ভারি-বুক মেয়েদের বুকের দিকে তাকালে যেমন করে তারা বুকের আঁচল ঘন করে টানে, আমি কতকটা তেমনি সরমে ছেঁড়া পা-টা ক্রস করে ডানপায়ের আড়ালে লুকোবার একটা বৃথা চেষ্টা করছিলাম। তার পর ডক পেরিয়ে সোজা বাড়ি। গিয়ে দেখি আমার খাটে লম্বা হয়ে সমীর শুয়ে শুয়ে দিব্যি মনোযোগ সহকারে রেলের একটা পুরোনো টাইমটেবিলের পাতা ওলটাচ্ছে; আমি ঢুকতেই বলল, বোস, খুব দরকারি কথা আছে।

ভাবলাম নিশ্চয়ই সমীরের কোনো নতুন ব্যবসার প্ল্যান মাথায়

এসেছে। এখন তার মার্কেট কেমন, ট্রান্সপোর্ট খরচ কত ইত্যাদি নানা ঝামেলার ইতিহাস শুনতে হবে। সেই সময় একবার একটা হাই তোলারও উপায় নেই। আর সমীর যখনই কোনো গভীর ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে, তখন ওর সময় কাটাবার পরম বন্ধু হল রেলের টাইমটেবিল। তুচ্ছ একটা টাইমটেবিলও যে শার্লক হোমস্-এর থেকে কত বেশি টেনে রাখতে পারে তা তখন সমীরকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ঝামেলার ব্যাপারে সমীরকে মুখ খুলতে দেওয়ার আগে আমি তাই বেশ হালকাভাবে বলে উঠি, তোর কথা শোনার আগে তুই আমার একটা কথার জবাব দিবি?

সমীর গম্ভীরভাবে বলল, বাথরুমে একগাদা দেরি না করে যা বলার খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

একটা পাটভাঙা পাজামা পরে ওর কাছে এসে বসলাম। বললাম, ধর, মাথার উপর একটা প্লেন উড়ছে। ঠিক সেই সময় একটা লোক দুতলা থেকে ঝাঁপ মেরে নিচে পড়ল। চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত মানুষ এইভাবে অক্কা পেয়ে গেল অথচ প্লেনের লোকগুলো তখন হয়তো দিব্যি শাম্পেন প্যাঁদাচ্ছে—। ব্যাপারটা কী রকম নিষ্ঠুর মনে হয় না?

সমীর বালিশের পাশ থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে বেশ ধীরে-সুস্থে চোখে পরল। তার পর সোজা হয়ে বসে বলল, তোর মাথার দোষ আছে এ-খবরটা তো কখনো জানতাম না। দুতলা, প্লেন— এত সব বড় বড় ব্যাপারের দরকারটা কি। তোর পাশের ফ্ল্যাটেই যখন কেউ গলায় দড়ি দিয়ে বুঝতে যাচ্ছে তুই হয়তো তখন খোশ মেজাজে সিগারেট ফুঁকচিস আর শিস দিচ্ছিস। তাতে হল-টা কি? দুনিয়ার সকলের সঙ্গে সকলের কি ওয়্যারলেস যোগাযোগ আছে যে কে কখন মরছে বা মরবে তা অন্য সকলে সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবে? যত সব—। বাদ দে ওসব। মুমুর সম্বন্ধে জরুরি কথা আছে।

হেসে বললাম, মুমু আবার কোনোকালে কোনো জরুরি বিষয় হতে পারে নাকি?

সমীর বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলল, ইয়ারকি ছাড়, ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস।

তার মানে ?

সমীর বলল, তোর সেই দীঘার সুজিতকে মনে আছে ?

তা থাকবে না কেন ? দেশলাই কাঠি দিয়ে পোড়া সিগারেট-গুলো ছাইদানির ভেতর দিকে ঠেলে দিতে দিতে বললাম, কিন্তু তাকে নিয়ে তোর সমস্যাটা কি ?

সমীর হুম্ করে বলে উঠল, তার সঙ্গে সামনের সপ্তায় মুমুর বিয়ে। অথচ ছেলেটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারি না আমি। কেমন যেন মন বলছে বিয়েটা সুবিধের হবে না। অথচ এখন আর উপায়ও নেই। মুমুটা দারুণ বেঁকে বসেছে। চিনিস তো মেয়েটাকে। বিয়ে না হলে ফট করে হয়তো পটাসিয়াম খাবে। এখন বল তুই কি বলতে চাস। নিজের ঘাবড়ে যাওয়া ভাবটা সামলে নিয়ে একটু বেশি স্বাভাবিক স্বরে বললাম, এতে আবার বলার কি আছে, বিয়ে দিবি। তোর আপত্তির কারণটা যে কি তাই তো বুঝতে পারছি না। ছেলেটা সত্যিই ভালো না খারাপ তা তো তুই আমি কেউই জানি না। শুধু তোর বা আমার ছেলেটাকে ভালো লাগছে না—এটা তো কোনো যুক্তি হল না।

সমীর এতক্ষণ বসে ছিল। এবার হতাশভাবে শুয়ে পড়ে বলল, তা জানি বিমল। আমার বক্তব্যটা ঠিক তা নয়। ছেলেটার বাপ-মা নেই। সে দাদার কাছেই থাকে। কি একটা কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ত। এখন লেখাপড়া ছেড়ে কি সব মোটরপার্টস্-এর ব্যবসা করে শুনছি। ব্যবসা তো মাথামুণ্ডু। রাতদিন তো দেখি ঐ চায়ের দোকানটায় বসে আছে। আর আমি যখন থাকি না ঠিক সেই সময়টাতেই তার মুমুর সঙ্গে যত দরকার। একদিন আমার ফ্যাক্টরি স্ট্রাইক থাকায় আমি তাড়াতাড়ি ফিরেছিলাম। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধই রেখেছিলাম। হঠাৎ ভরদুপুরে বাইরের দালানে একটা মৃদু ঝটাপটির শব্দ শুনে নিঃশব্দে চাবির গর্তে চোখ

দিয়ে যা দেখলাম তা আর তোকে বলা যায় না। হাজার হোক আমার বোন তো। বাইরের লোহার স্প্রিং খাটটায় আধশোয়া হয়ে মুমু প্রাণপণে সুজিতকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। সুজিত ফিস ফিস করে কি সব বলতে মুমু শুধু ঠোঁটটা এগিয়ে দিল। তার পর উঠে পড়ে ব্লাউজের বোতাম এঁটে শাড়ি ঠিক করে দু জনে রাস্তায় নেমে পড়ল। এইভাবে দিনের পর দিন ওরা ঠিক কতটা এগিয়েছে জানা যায় না। আমি মুমুকে ডেকে স্পষ্টই একদিন বলেছিলাম। কিছুই ফল হল না। সেও সোজা আমার মুখের উপর বলে দিল, সুজিত আমায় বিয়ে করবে বলেছে। সমীরকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, তোর কি মনে হয়, সত্যিই কি মুমু ভালোবাসে সুজিতকে।

সমীর হাতের টাইম টেবিলটা সশব্দে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ভালোবাসে মানে? প্রেমে একেবারে হাবুডুবু অবস্থা।

বললাম, আমার আর কি বলার থাকতে পারে সমীর। তুই নিজে তো ভালোই জানিস। মেসো যা রাগী মানুষ শুনলে মুমুকে কেটেই ফেলবেন হয়তো। তার মেয়েটা যাতে সুখী হয় সেটা দেখাই আমাদের এখন একমাত্র প্রয়োজন। মাসি মারা যাওয়ার পর আর তো কেউ নেই ওর।

সমীর আনমনাভাবে বলল, মুমু চায় বাবাকে মোটেই না জানিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে চলে যেতে।

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম, হুঁ, তা ছাড়া তো উপায়ও নেই। প্রাণ থাকতে মেসো এইরকম সগোত্রে বিয়ে দেবেন না। বিয়ে দিলে তোকে-আমাকেই দিতে হবে। সুতরাং একটা দিন ঠিক করে ফেলি। মুমুকে বিকেলবেলা আমার এখানে এনে রাখবি। সুজিতকে সোজা রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়ার সময় দিয়ে দিবি। এইভাবেই সব ব্যবস্থা করে ফেলা ভালো। এ নিয়ে মিথ্যে ভেবে কোনো লাভ নেই।

সত্যিই ভেবে লাভ নেই। বৃষ্টির উপর কারুর হাত নেই।

জানি এই প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কাজ করা যায় না। কিন্তু জাহাজ সেল্ করবেই। সুতরাং মাল শর্ট-আউট করা ছাড়া উপায় নেই।

অতি ধীর গলায় চীফ অফিসার স্মিথ আমায় কথাগুলো বলল। কথা শুনছি কিন্তু মাথায় কিসসু ঢুকছে না। এত মাল হাতে পেয়েও তুলতে পারলাম না—এটা কি কম আফসোসের ব্যাপার। টাকা, সুনাম সব গেল। তবু শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখতেই হবে। কালো ময়নার মতো আকাশ। কোল বার্থের পাশে পাশে কালো কয়লার ছোটবড় স্তূপ। কাঁটাতারের কালো বেড়া। বেড়ার উপর ভিজে ভিজে কালো কাক। উনত্রিশ নম্বরের পিছন দিয়ে কিং জর্জ ডকে যাব ঠিক করেছি। যদিও পথটা ঘুর, কিন্তু উপায় নেই, ওদিকে ব্রিজ খোলা। কালো আকাশের পটে বেড়ার গায়ে অজস্র ঘন সবুজ রেলওয়ে ক্রিপার। তাদের বেগুনি ফুলগুলো জলের নোলক পরে মৃদু হাওয়ায় দুলছে। জুতোটা জলে ভিজে ঢোল। প্যাণ্টের তলার দিকটা কাদার ছিটেতে ভরে গেছে। থেকে থেকে সমানে বৃষ্টি আসছে। জুটের হ্যাচ একটুও খোলা রাখা সম্ভব নয়। ভিজে জুট থেকে আগুন লেগে যেতে পারে। তখন পুরো জাহাজটাই জ্বলেপুড়ে শেষ। ফলে সব হ্যাচগুলোয় চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো ছুটে বেড়াতে হচ্ছে যাতে এক ফোঁটা বৃষ্টি নামলেই সব ঠিকঠাক বন্ধ করা হয়।

প্রায় সময় চুরি করে, বৃষ্টিকে থাবড়া মেরে কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সময় পালাচ্ছে হু হু করে। তার মধ্যে আবার থেকে থেকে বৃষ্টি। সকাল সাতটায় জাহাজে উঠেছি। জাহাজ চলে যাবে বেলা দেড়টায়। সেই থেকে সমানে নিচে পোর্টের শেড আর ওপারে জাহাজের ডেকে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। এ-সেই যমে-মানুষে টানাটানি। সময় ফুরোবার আগে সব মাল তুলে নিতেই হবে। অন্তত চা আর গানিগুলো সব হয়তো উঠে যাবে। শুধু জুট কিছু থেকে যেতে পারে। বেলা প্রায় বারোটার সময় মনে হল পা যেন আর চলে না। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে জিভটা পর্যন্ত ভেতো

লাগছে। নিচে দাঁড়িয়ে শেডবাবুর সঙ্গে এক ভাঁড় চা খেলাম। নাম রাম ঘোষ। আমরা রামবাবু বলেই জানি। বেচারা রামবাবু। এক ভাঁড় চা খাওয়াতে একেবারে একগাল হাসি। শেডে সিগারেট ধরানো নিয়ম নেই বলে আমার দেওয়া চেস্টারফিল্ডটা বহু আদরের সঙ্গে বিড়ির কৌটোয় ভরে রাখলেন। ছানি কাটিয়েও চোখে আজকাল ভালো দেখতে পান না। যতবার জিগেস করি আর কত পেটি আন্দাজ চা পড়ে আছে, ততবার উনি আমার হাত ধরে টেনে আনেন আর প্রায় বিড়বিড় করে বলেন, শেডটা বড় অন্ধকার। তুই নিজে একটু দেখে নে না ভাই। জানিস তো আমি চোখে ভালো··· যা ভাই লক্ষ্মীটি।

কথা শেষ করেই দাড়ি ধরে চুমু। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগ ধরে। শেডের ভেতর চা-পেটি গোনা নিশ্চয়ই আমার কাজ নয়, তা ছাড়া অত সময়ই বা কোথা? যত রাজ্যের হতচ্ছাড়া বুড়ো হাবড়ার দল কোথা থেকে যে জোটে। মুখ দিয়ে কি একটা খারাপ কথা বেরিয়ে পড়ছিল। কিন্তু রামবাবুর মোটা চশমার কাঁচে অনেক বৃষ্টি-ফোঁটার দাগ দেখলাম। ঐটুকু জায়গায় প্রচুর জলের শিশু কিলবিল করছে। জলের রক্ত···জলের বমি···পিত্তি উঠছে কেউ খেতে পায় না ওরা। প্রায় অন্ধ, অম্লান, বুড়ো শেডবাবু ওদের বইবে কি করে, কত দিন পারবে বইতে। যে কড়া কথাটা একটু আগে মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল, তার বদলে নিজেকেই বলতে শুনলাম, চশমাটা একটু মুছে নিন না রামবাবু, আচ্ছা নোংরা মানুষ তো আপনি।

চশমাটা খুলতেই আশ্চর্য অসহায় আর করুণ লাগল রামবাবুর মুখটা। প্রায় সদ্য ঘাট-করে-আসা বিধবার মুখের মতো। তবু একগাল হেসে বললেন, আমার আর পরিষ্কার-অপরিষ্কারে লাভ কি বল্। চোখেই আর দেখি না। সব তো কেড়ে নিলেন। কোনদিন দেখবি এ-শালা জাহাজের খোলের ভেতরেই পা ছটকে ব্যাঙের মতো মরে পড়ে আছি।···

শেডের ভেতর গুণে দেখলাম আর প্রায় শ-খানেক পেটির মতো

চা-পেটি পড়ে আছে। অর্থাৎ ৫/৬ সিলিং মাল। ঝড়ের মতো উড়ে গেল। ঘড়িতে তখন বাজছে বেলা একটা। অল্প কিছু জুট ছাড়া সবই প্রায় উঠে গেল। এবার গ্যাংওয়ে তোলবার পালা। ডেরিক শোয়ানো শুরু হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা ডেরিকগুলো সব বন্ধ হ্যাচের বিছানায় বড় খোকা, মেজ খোকা, ছোট খোকা হয়ে শুয়ে পড়ছে। ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো অবস্থা…। প্রচণ্ড ঘুমের তৃষ্ণায় আমারও সারা দেহ কাঁপছে। রাত্রে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিতে যেটুকু দেরি। যাকে বলে একেবারে মড়ার মতো ঘুম।

চোখ খুলতেই মনে পড়ল আজকে মুমুর বিয়ে। বিয়ের দিন সকালটায় ছেলে অথবা মেয়ের মনটা কেমন লাগে ভাববার চেষ্টা করলাম। মেয়েরা সেদিন ঠিক কি ধাঁচের কথা ভাবে। ছেলেদেরই বা মনটা কেমন লাগে এইসব নানা কথা ভাবছিলাম। কিন্তু কিছুই মাথায় এল না। অথচ লেখকরা কী সুন্দর সব বিয়ের দিনের ছবি তৈরি করেন। 'গুড-আর্থ'-এ ওয়াংয়ের বিয়ের সকালটার কথা মনে পড়ে। নিজের শরীরটাকে বেশ করে পরিষ্কার করা। বহুকাল পরে চান। আর মনে সেই ট্রেন-এসে-গেল, ট্রেন-এসে-গেল শিহরণ। অথচ ভাবতে গেলে ব্যাপারটা আর কি এমন। সেই বুড়ো ইঞ্জিনের গল্প। জীবনভর শুধু বাঁধা লাইনে ছোটা আর ছোটা। কোনো টার্মিনাসে এসে যখন ট্রেন একদম থেমে যায়, ইঞ্জিনটা শুধু ফোঁস ফোঁস ধোঁয়া ছাড়ে, তখন আমার সব বৃদ্ধ-পঙ্গু-মৃত জ্যাঠা, কাকা মামা সব্বাইকে মনে পড়ে। বড্ড কষ্ট লাগে। অথচ কষ্ট লাগতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। যতসব বাজে বাজে রেল কাম-ঝমাঝম ছুটোছুটি। আর তার পর এই পা-পিছলে আলুর দমের গল্প। ইঞ্জিনের মতো ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ছাড়া। তবু ওয়াংয়ের বিয়ের ভোরটা বেশ লাগে। অন্তত সকালবেলায় ঘুম ভেঙেই চান করা ব্যাপারটা বেশ রোম্যান্টিক মনে হয়। মনে হয় সকালে চান করলেই বেশ সারা শরীরে কোনো অদৃশ্য পুজোর চন্দন লেগে যায়। আমি কোনোদিন সকালে চান করার সময় পাই না। সারাদিন ডকের

কত নোংরায় ঘুরতে হয়। তাই ফিরে এসে চান না করলে গা ঘিন ঘিন করে। মাসে যদি এক-আধদিন ছুটিও পাই, তখন সকালটা এত ভালো লাগে যে তার একমিনিটও নষ্ট করতে ভালো লাগে না। কোন একটা জাহাজে চীফ অফিসার ডেভিড একবার বলেছিল যে সকালে উঠে তিনটি S-এর জন্যে তার ছ-মিনিট মাত্র সময় নষ্ট হয়। এই তিনটি কি জানতে চাইলে সে সহাস্যে উত্তর দিয়েছিল সিট্, সাওয়ার, সেভ। আমার কিন্তু এই ছ-মিনিট নষ্ট করতেও অনিচ্ছা। ভীষণ কুঁড়েমি পায়। ঐসব ছুটির সকালে শুধু চুল টোকা করে বাসি পাজামায় বাসি বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক, সিগারেটে টান আর কোনো নতুন ফরাসী উপন্যাসে কোনো টকটক-ঝালঝাল ছুঁড়ির বুক পাছার হ্যাংলামিভরা বর্ণনা পড়তে ভালো লাগে। কিচ্ছু হাতের কাছে না থাকলে আরো ভালো। চুপটি করে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখ, আর যতসব পেটকাট্টি, ময়ূরকণ্ঠী চাঁদিয়াল ঘুড়িদের জীবনে কাটতে পারি নি, মনে মনে কাঁচগুঁড়োর মাঞ্জা দিয়ে তাদের সব পুট পুট কাটো…। আজ কি মনে হল জানি না, হঠাৎ ওয়াংয়ের মতো চান করতে ইচ্ছা হল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে পরিপাটি চান যাকে বলে। রোজকার মতো কাক-চান নয়। কতদিন পায়ের কড়ে আঙুলটা পরিষ্কার করি নি। ওটা যেন আমার পায়ের আঙুলই নয়। অন্য কারুর। মনেই নেই ওটার কথা। ডকে আজ তেমন কাজও নেই। তা ছাড়া একদিন ডুব মারলে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। দুপুরে অফিস তো যাচ্ছিই। চান করতে করতে মনে হল যেন আমারই বিয়ে। আমার মতো বুড়ো বর পেলে মেয়েরা কি ভাববে। মনে হতেই হাসি পেল। সেই ছড়াটার কথা মনে পড়ল।

চোখ খাও গো মা-বাপ / চোখ খাও গো খুড়ো / এমন বরে বিয়ে দিলে / তামাক-খেগো বুড়ো / …নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে / ফ্যান গালবার সময় বুড়ো / নেচে উঠেছে /…

সারাটা দুপুর আলো জ্বলা ডালহৌসি পাড়ায় কাটিয়ে একটু তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামলাম। আকাশে তখন বেশ কালো মেঘ। বাড়ি ফিরে দেখি মুমু দিব্যি চুল-টুল বেঁধে রেডি। বসে বসে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি দিয়ে আমার জাহাজী জুতোটা একমনে সাফ করছে। বললাম, জুতো ছেড়ে এবার নিজের গালটা একটু পরিষ্কার কর দেখি। আর সময় বেশি নেই। সমীরটাই বা এখনো এল না কেন, তা তো বুঝছি না। মুমু সেদিক দিয়েই গেল না। বলল, ইস্ এই জুতো পরে তুমি আমার বিয়ে দিতে যাবে? দূর করে দেবে তোমাকে সবাই।

খানিক পরেই কমল এসে হাজির। কমল ব্যানার্জি আমার ছাত্রজীবনের অন্যতম ভক্ত। কেন যে সে আজও আমায় ভালোবাসে জানি না। ফরসা বেঁটেখাটো ছেলে কমল। বয়েসে আমার চেয়ে বছর ২/৩ ছোট হবে। ইক্‌নমিক্‌সে এম-এ দিয়ে গত দু বছর স্রেফ চায়ের কাপে চাকরি খুঁজছে। দিনে অন্তত আট দশ কাপ চা ওর চাইই। ধুতি পাঞ্জাবি পরলে চমৎকার মানায়, কিন্তু পরবে না কক্ষনো। যত সব লাল-নীল জামা আর খাকি প্যান্ট। ওর ধারণা সাদা জামা-কাপড় পরলে ফরসাদের দারুণ মেয়েলি দেখায়। আমায় দেখে খুব গম্ভীর মুখে বলল, আজ বাস চাপা পড়তে পড়তে খুব জোর বেঁচে গেছি বিমলদা। আপনি হয়তো জানেন না বেকার সমস্যা সমাধানের খুব ভালো একটা প্ল্যান আছে আমাদের সরকারের। কলেজ থেকে সদ্য পাশ করা সমস্ত ছেলের ছবি ওরা সব স্টেটবাস ড্রাইভারকে দিয়ে রাখে। আর ড্রাইভারগুলো রাস্তায় ঐসব মুখ দেখলেই চোখ কান বুজে বাস নিয়ে তাড়া করে চাপা দেবার জন্যে। গত কয়েক বছরে তাতে ফল বেশ ভালোই পাওয়া গেছে। আমরা বেঁচে থাকা মানেই তো চাকরি দেবার দায়। তাই যত তাড়াতাড়ি আপদ বিদায় হয় ততই ভালো।

ইতিমধ্যে টিপটিপ বৃষ্টিটা বেশ জোরালো হয়ে উঠল। ভয় লাগল, সমীরটা এখনো পৌঁছলো না। মুমু কমলের সঙ্গে হাসি-

ঠাট্টায় মেতে আছে। বাড়ি ফেরার সময় ভেবেছিলাম ওদের জন্যে কিছু ফুল বা উপহার নিয়ে আসবো। সঙ্গে টাকাও বিশেষ ছিল না। দু-চারটে ফোরম্যান আর একে তাকে কিছু কিছু ধার দিয়ে অবস্থা বেগতিক। তবু যা ছিল, তা দিয়ে কিছু ফুল অন্তত সহজেই কেনা যেত। নিলাম না অন্য কথা ভেবে। যাদের জন্যে কেনা তাদের ট্রেন ছাড়বে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদে। তাদের কোনো ঘর-দোর নেই। কারুর আশীর্বাদ নেই। নেই কোনো শুভ কামনা। কোনো অনুষ্ঠান। সুতরাং উপহার অথবা ফুল নিয়ে তারা রাখবে কোথায়, কি-ই বা করবে। সৈনিকের হঠাৎ ছুটিতে এসে অনুষ্ঠানহীন বিয়ে করার মতো। ওয়াটারলু ব্রিজে ভিভিয়ান লে-র বিয়ের কথা মনে পড়ে। রেমার্কের গ্যাবার নামক নায়কটির সেই রঙিন ফানুসী বিয়ের রাত। মনে পড়ে। ঘন চুমুর শিশির-মধু নিয়ে কত তাড়াতাড়ি ফানুস উড়ে গেল। আবহাওয়াটা হালকা রাখার জন্যেই হয়তো কমল অনর্গল নানা মজার গল্প আর হাসির কথার খৈ ছড়াচ্ছে। এমনিতে কমল কিন্তু বেশ চুপচাপ ধরনের ছেলে। চেঁচিয়ে আমার বাহন বঙ্কিমকে চা আনতে বলতে যাচ্ছি, দেখি একডিশ গরম সিঙাড়া আর এক কেটলি চা হস্তে বঙ্কিমের প্রবেশ। কমল বলল, মুমুর অনারে আজ তুমি বলার আগেই আমি চা আর নগদ দু টাকার কলেরা আনিয়ে নিলাম। তুমি খাবে তো বিমলদা? মুমু চলে আয় এদিকে।

মুমু বললে, আগে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে রাখো। খেয়েই উঠে পড়ব। সুজিত বেশ বিয়ের আগেই ছেলে বিধবা হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে কেমন যেন বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। হাসতে গিয়েও দাঁতে হঠাৎ যেন কাঁকর লাগল। কোনো ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করে ফেলার পরে আমার মন কখনো পিছু হাঁটে না। অথচ আজ কি যে হল। কিন্তু মুমুকে সোজা কথায় কিছু বারণ করা বৃথা। তাই ঘুরিয়ে বললাম, বিয়ের দিনেও তুই খুকি থাকবি

মুমু। এতটুকু বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না তোর। আজকের দিনে কিছু খেতে নেই তোকে। বিয়েটা হয়ে গেলে যা প্রাণ চায় খাস। মুমু একেবারে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ওরেব্-বাব্বা, তুমি আবার এত সব শিখলে কবে। ঠিক আছে, তোমরা দু জন শেষ কর আমি বরং উলটোদিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। আমার নজর লাগলে তোমাদের আবার পেট কামড়াবে। কি দরকার বাবা—।

খানিক পরেই মুমু মুখ ধুয়ে সাজতে শুরু করেছে। কমলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখছি। হঠাৎ হঠাৎ দুটো একটা শিশি কৌটো নিয়ে মুমু বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখছি পাউডার, সেণ্ট, বা ক্রিমের শিশি। বেচারা মুমু। আমাদের সামনে সাজতে একটু লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আমার যে আর দ্বিতীয় ঘর নেই, যাই কোথায়। অগত্যা কমলকে টেনে নিয়ে আমরাই বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এত হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁট আসছে যে সিগারেট ধরানোও মুশকিল। দেশলাইয়ের তিন-চারটে কাঠি নষ্ট হতে কমল আমার কাছ থেকে দেশলাইটা কেড়ে নিল। তার পর একটি কাঠিতেই স্বচ্ছন্দে সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। ধরানো সিগারেটটা সে তুলে দিল আমার হাতে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আর ভিজে রিকশাগুলোর চাপা টুং টুং ঘণ্টির আওয়াজ। কখন কখন জোলো হাওয়ায় রিকশার পর্দা সরে যাচ্ছে। ক্ষণিকের বিদ্যুৎ ঝলকে দু জনের ঘন হয়ে ওঠা দৃশ্য ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমীরের জন্যে প্রতীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত উদ্বেগে দাঁড়াল। আমি কমল আর সমীর এই তিনজনের সাক্ষী হিসেবে সই দেবার কথা। সমীর শেষ পর্যন্ত না এলেও হয়তো অন্যভাবে সেটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। তবু মনটা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেল। বিয়ের পরেই রাত আটটা কতর ট্রেনে ওরা চলে যাবে কলকাতা ছেড়ে। হাতে আর খুব বেশি একটা সময় নেই। আনমনাভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজার কাছে পৌঁছুতেই একটা ঢাকা রিকশা থেকে সমীর নামল। আঃ, যেন বাঁচা গেল। বাইরে

এখনো তুমুল বৃষ্টি। বাসস্টপ থেকে এইটুকু রিকশায় আসতেই সমীরবাবুর প্রিয় তসরের ফুল শার্ট ভিজে জাব। আমায় সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে সবাই ঠিক করলে কিছু ফুল আর একটু সিঁদুর কিনতেই হবে। কমল আর সমীর গেল ঐসব কিনতে। আমি আর মুমু ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ওয়েলিংটনের বিয়ের রেজিস্ট্রেসান অফিসে। এখান থেকে দু-পা গেলেই আমাদের চির-চেনা মোড়ের মাথার সেই মুড়ির দোকান। কিছুদিন আগেও আমরা ছাত্র ছিলাম। দলবেঁধে এসে সবাই ওখান থেকে মুড়ি খেতাম। ক্যাপ্‌স্টেন ধরিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। তখন কিন্তু কেউ ভুলেও ভাবি নি যে ওর এত কাছে একদিন আসতে হবে একটি জুটির হাতে হাত মিলিয়ে দেবার জন্যে। মনটাও তখন ছিল মুড়ির মতো হালকা। অথচ এই কতকগুলো বছরের ব্যবধানে কোথায় হারিয়ে গেছে সেই উড়কি ধানের খৈ। সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমরা।

রেজিস্ট্রেসান অফিসটা অদ্ভুত। নিচে ঘড়ি সারাবার দোকান, গাড়ির কারখানা ইত্যাদি। গেট দিয়ে ঢুকতেই চারিদিকে অজস্র পুরনো টায়ার আর রবারের ছেঁড়া টিউব ছড়ানো। বৃষ্টির জলের সঙ্গে পোড়া মোবিল-পেট্রল মিশে জায়গায় জায়গায় জমে আছে। তার মধ্যে আবার পোড়া বিড়ি আর চায়ের খালি ভাঁড় ভাসছে। উপরে ওঠার সিঁড়িটা দোক্তাখোর বুড়োর কালো নড়বড়ে দাঁতের মতো। দরজায় অজস্র ডাক্তারের নামফলক। সব থেকে মজার ব্যাপার এখানের সব ডাক্তারই চোখের ডাক্তার। এ প্রায় সেই বড়বাজারের আলুপট্টি বা চালপট্টির মতো। অবাক কাণ্ড। এখানে কি একটাও দাঁতের ডাক্তার বা পেটের ডাক্তার থাকতে নেই। এর মধ্যে আবার কোথায় যে মানুষের বিয়ে হয় তা মাথায় ঢুকল না। সবাই মিলে উপরে তো উঠে গেলাম। সমীর আর কমলের হাতে মালা তোড়া সিঁদুর ইত্যাদি। সামনেই একটি চোখের ডাক্তারের অবারিতদ্বার চেম্বারে ঢুকে গিয়ে বসা গেল। শুনলাম ডাক্তার তখন তাঁর পরীক্ষা ঘরে সিনেমার কোন-এক কুমারের চোখ পরীক্ষায়

ব্যস্ত। সেটা শুনেই মুমুর ছটফটানি আর উঁকিঝুঁকি সুরু হল। ইতিমধ্যে শ্রীমান বর অর্থাৎ সুজিত এসে হাজির। ওর জন্যে অবশ্য আমাদের তেমন কিছু চিন্তা ছিল না। কারণ ও জানিয়েছিল এই অফিসারটার উলটো দিকে পার্কের কোণে এক বন্ধুর হোস্টেলে ও বিকেল থেকেই থাকবে। তবে আজকের দিনেও ওর প্যান্ট পরে আসাটা আমার মোটেই সহ্য হচ্ছিল না। হলই বা রেজিস্ট্রি বিয়ে। তবু বিয়ের দিনেও কি একটা পাঞ্জাবি পরতে মন চায় না। কি ধরনের বাঙালির মন বুঝি না। এসে অবধি সুজিত কেমন যেন অন্যমনস্ক। আমাদের হাসিতামাশায় কিছুতেই যেন ঠিক যোগ দিতে পারছে না। কি ভাবছে সেই জানে। হয়তো নতুন জীবনের দায়িত্ব নেবার ভয়। কিংবা হয়তো আত্মীয় বিচ্ছেদ। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ইচ্ছে করে ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্যেই কমলের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটু বেশি হৈ চৈ করার চেষ্টা করছিলাম। ভেতরে ভেতরে কিন্তু ঠিকই অনুভব করছিলাম, আমার সমস্ত তামাশাগুলো বুমেরাং হয়ে আমারই কাছে ফিরে আসছে, পুরনো চার্চের হলঘরে একাকী পায়রার প্রতিধ্বনির মতো। কাকে যেন একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলে রূপালী পর্দার সেই রাজপুত্তুর চলে গেলেন। ড্যাবডেবে চোখে আমরা সবাই তাকিয়ে রইলাম। উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আমাদের ডাক পড়ল। এবার সত্যিই মনটা যেন কেমন দুলছে। কে জানে মুমুটা সুখী হবে কি না। সবাই ঘরে ঢুকলাম। একটি অত্যন্ত নিরীহ ধরনের বৃদ্ধ চোখের ডাক্তারের চেম্বার। তাঁর অপেক্ষা করার ঘরে সেই চিরাচরিত প্রথায় আদ্দিকালের ছেঁড়া নোংরা হলদে একদিস্তে পত্র-পত্রিকা। চারিদিকে চোখ চশমা আর মড়ার খুলির ছবি। অদূরে সেই উলটোপালটা সাজানো ছোট বড় বর্ণমালার বোর্ড ঝুলছে। ওটা দেখলেই আমার ছেলেবেলার ট্যারা সারানোর গল্প মনে পড়ে। হাজার ট্যারা হলেও চশমা পরার ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই বাবার সঙ্গে চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমার পিসতুতো দাদার দেওয়া বুদ্ধিটা কাজে

লাগাবার চেষ্টা করলাম। 'বাবা যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে আমি বোর্ডের একেবারে শেষ লাইনের ছোট ছোট অক্ষরগুলো প্রায় মুখস্ত করে ফিরে এলাম। ফলে পড়ার পরীক্ষার সময় আমি শেষ লাইনটা বেশ গড়গড় করে পড়ে দিলাম। বাবা তো অবাক। ডাক্তারেরও প্রায় সেই অবস্থা। কারণ, যাদের খুবই ভালো দৃষ্টিশক্তি তারাও অনেকে শেষ লাইনটা পড়তে পারে না। আর তা না পারলেও কিছু যায় আসে না। তবে ডাক্তার চতুর কম না। আমায় বললেন বোর্ডটার দিকে পিছন ফিরেও যদি আমি শেষ লাইনটা পড়তে পারি তা হলেই নাকি কেল্লা ফতে। আমার চশমা লাগবে না। আমি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরেই মুখস্থ ঝেড়ে দিলাম। শুনে ডাক্তার আর বাবার সে কি হাসি। সেদিন ডাক্তার আমার বুদ্ধির প্রশংসা করে বলেছিলেন আমি নাকি জজ-ব্যারিস্টার হবো। তাঁর ভবিষ্যৎবাণীকে নিখুঁতভাবে সফল করে আমি হলাম নিছক ডকার অর্থাৎ, জলবাবু—জলের পোকা। তাও সাঁতার না জেনেই জলের পোকা।

এদিকে সময় এগিয়ে আসছে। ডাক্তারের ঘরে ঢুকেই আমি আনচান চাইছি। কি যে নেই ঘরটায়। একটা বড় নীলচে ধরনের ঘর। একাধিক চেয়ার-টেবিল আর সব টেবিলের মাথায় বই, জার্নাল, চশমা, মাথার খুলি—তারই একটার পেছনে একমাথা সাদা-চুল, একজন অত্যন্ত অ-ডাক্তার সুলভ ডাক্তার লাজুক হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার একটু গর্বের সঙ্গেই জানাতে ভুললেন না যে ঐ সিনেমার হিরোটি ওঁর অনেকদিনের খদ্দের। এবং আমাদের দেরী হওয়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আমি প্রায় ভাঁড়ামি করার জন্যেই জিগেস করলাম ঐ মানুষটি (অর্থাৎ হিরোটি) কি করেন। অত্যন্ত গভীরভাবে প্রশ্নটা করার জন্যে সবাই হেসে ফেটে পড়ল। বেচারা বৃদ্ধ ডাক্তার তো ভ্যাবাচ্যাকা। সুজিত আর মুমু প্রথমে সই স্বীকার ইত্যাদির পালা মেটাল। এরপর আমাদের তিন সাক্ষীর পালা। প্রথম সমীর সই করবে বলে কলম খুললে। ডাক্তার

আমাকে জিগেস করলেন আমি যদি দ্বিতীয় সাক্ষী হই তা হলে নিজের ফর্মটায় ততক্ষণ সুরু করতে পারি। আমি বললাম যে, আমি 'সেকেণ্ডম্যান' অর্থাৎ, দ্বিতীয় সাক্ষী ঠিকই, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর দ্বিতীয় কোনো পেন না থাকায় চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি। এবার আবার একটি হাসির রোল উঠল। ডাক্তার তাঁর নিজের কলমটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মুমু মিটমিট করে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ফিক ফিক করছে। লেখাপড়ার কাজ মিটতে চেয়ার ছেড়ে সবাই ঘন হয়ে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ ডাক্তার তখন শপথ গ্রহণ ও মন্ত্র পড়ার কাজ শুরু করলেন। এই সময়টায় সত্যি বিয়ের আনুষ্ঠানিক সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো যেন কেমন বোকা আর ছেলে-মানুষ হয়ে গেল। সব বিয়ের বুদ্ধি জড়সড় হয়ে গেল। মন্ত্র পড়া হল বাংলায়। যা বোঝার উপায় নেই এমন একটি ভাষার নাম মন্ত্র বলে জানতাম। আজই প্রথম নিজের মাতৃভাষায় মন্ত্র পড়া শুনলাম। কানকে বিশ্বাস হয় না এত মধুর লাগল। লোকে হয়তো এটাকে 'মন্ত্র' না বলে 'শপথ-গ্রহণ' বলবে। কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারি না, যদীদং হৃদয়ং মম···ইত্যাদির বদলে কেউ যদি বলে, 'আমার এ-হৃদয় তোমার হোক', তা হলে কোন্ দ্রোণাচার্যের হট্ডগ্ খাওয়ার শাপ লাগবে। দু জনের হাতে হাত মিলিয়ে দিলেন ডাক্তার নিজে। দু জনে মালা-বদল করল। সুজিতকে বলা হল মুমুর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিতে। অন্যদিন হলে মুমু হয়তো হাত ঠেলে পালিয়ে যেত। আজ কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ের মতো মাথা পেতে দিল। প্রথম দিকে মন্ত্র বলার সময় লজ্জায় গলা কেঁপে, মুখ লাল হয়ে মুমু একেবারে অস্থির। এত লোকের সামনে স্পষ্ট বাংলায় একটি ছেলেকে স্বামী বলতে কার না লজ্জা করে। সেই জন্যেই বোধ হয় মন্ত্রগুলো সংস্কৃতে লেখা। কেউ বুঝবেই না কি সব বলে যাচ্ছে দু জনে। সমীর যখন এখানের টাকা পয়সার ব্যাপারটা মেটাচ্ছিল, আমি তখন মনে মনে মুমুর ওখান থেকে সরে যাওয়া চাইছিলাম। টাকা গুণে দিয়ে বিয়ে করাটা কেমন যেন বড় বেশি ব্যবসাদারী

লাগছিল। নাই বা দেখত মুমু এ-সব। সব মিটতে সমীর ওদের দু জনাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল। আমি আর কমল পরের ট্যাক্সিতে যাব ঠিক হল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি কিছুরই দেখা নেই। অথচ সময়ও বেশি নেই। বৃষ্টির বেগ কমে গেছে। তবু তখনো টিপটিপ পড়ছে আর জোলো হাওয়া বইছে। সদ্য বৃষ্টি হয়ে যাওয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গাছগুলো থমথমে ভিজে। সারি সারি লম্বা পামগাছগুলো ঝাঁকড়া মাথায় ঘন অন্ধকার নিয়ে পিঠ সিধে করে দাঁড়িয়ে। আমরা অনেকটা দাঁড়িয়ে তবে একটা ট্রামের দেখা পেলাম। এখান থেকে ট্রামে উঠে কোনোই সুবিধে নেই। তবু যতটা এগুনো যায়। ভীষণ ভিড় ট্রামটায়। বাদুড়-ঝোলা হয়ে উঠে তো পড়া গেল। তবে বেশি দুর যেতে হল না। ইউনিভার্সিটির সামনেই একটা ট্যাক্সি দেখে ট্রাম থেকে লাফিয়ে ছুট। কিন্তু হায় আমাদের আগেই একজন লোক ট্যাক্সিটার দরজা খুলে ফেলেছে। তবু হাল ছাড়লাম না আমরা। খুব করুণ মুখে তাদের যখন আমাদের অবস্থাটা বোঝালাম তখন যেন ভোজবাজী ঘটে গেল। লোকগুলো দস্তুরমতো সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। অথচ আমরা কেউই তাদের বিন্দুমাত্র চিনি না। বুকের মধ্যে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। ভাবলাম দুনিয়াটা চিরদিন এই রকম থাকলে আমাদের মতো মহা-ছ্যাঁচোড়েরও চোখে প্রেমের অশ্রু বইত। ট্যাক্সিতে যখন উঠলাম তখন হাতে আর মাত্র মিনিট পনেরো-কুড়ি সময়। ড্রাইভারটা বিশ্রী রকম আস্তে চালাচ্ছে। তা ছাড়া রাস্তাতেও অসহ্য ভিড়। উঃ, সেই পিঁপড়ে-থিকথিক বাতাসার মতো গিজ-গিজে মানুষের চিৎপুর। অবশেষে হাওড়া ব্রিজ পার হলাম। ছুটতে ছুটতে যখন ট্রেনের কাছে পৌঁছুলাম তখন প্রায় ট্রেন ছাড়ব ছাড়ব অবস্থা। ওরা আমাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। দেখলাম মুমুরা একটা কুপে পেয়েছে। আজ ওটাই ওদের বাসরঘর। জেসপ কোম্পানির তৈরি গাঢ় সবুজ সীটটা আজ ওদের ফুলশয্যা। আমি জানলার কাছে

গিয়ে মুমুর প্রিয় সেই মুড়ি লজেন্সের ঠোঙাটা ওর হাতে দিলাম। দু-চোখে খুশির ঢেউ। আমার গলা ধরে কানের কাছে মুখ এনে মুমু বললে, বিমলুদা, কলকাতার বাইরে গেলেই আমার খুব ডায়রি লিখতে ইচ্ছে করে। একটা ডায়রি কিনে দাও না গো।

সামনের ঠেলা স্টল থেকে একটা ডায়রি কিনে ওর হাতে দিলাম। বললাম, নতুন বিয়ের পরে লোকে খাওয়ার ঘুমাবার সময় পায় না, আর তুই ভাবছিস ডায়রি লিখবি ?

মুমু কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ধ্যাৎ, অসভ্য কোথাকার—।

সবুজ বাতির সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। নতুন বর-কনে নিয়ে এবার হুস করে ট্রেন চলে যাবে কত দূর।

জলের উপর চলবার জন্যে এমনি কোনো আলোর সিগন্যাল নেই। লালবাতি জ্বেলে কেউ থামতেও বলে না। ছাড়বার আগে শুধু জাহাজের মাস্তুলে ব্লু-পিটার উড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই চলে বিজয়ার বাজনা। কলকাতার জাহাজী লাইনে একটা খুব চালু ব্যঙ্গ আছে। ব্লু-পিটার না দেখলে শিপাররা নাকি মাল পাঠায় না। এখানে জাহাজ দিনের পর দিন মালের আশায় বসে থাকে। মাল থাকলেও হয়তো তার শুল্ক বিভাগের ছাড়পত্র নেই। যেখানে কাগজপত্তর ঠিক আছে সেখানে হয়তো নৌকোসুদ্ধু মাল উধাও। সব থেকে মজা হল মালের আয়তন, ওজন, অথবা বিভিন্ন পোর্টের পর্যায়ক্রমে কখনোই মাল আসে না। যখন যা খুশি মাল এসে হাজির হল। ফলে লোডিংয়ের চূড়ান্ত অসুবিধে। অথচ এর কোনো প্রতিকার নেই। শিপাররা এই কলকাতা বন্দরে ভগবানের বাবা। বাইরে থেকে যে-সব বাঘা শিপিংম্যাগনেটদের দারুণ হাঁকডাক, বড় বড় শিপারদের কাছে তারাই আবার ছোট্ট ইঁদুর হয়ে যায়। বিচিত্র এই জলের পৃথিবী। আমরা এখানে নিতান্তই চুনোপুটি। ফলে সামান্য মাল তুলতেও আমাদের নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই একই ইতিহাস চলছে। এ-

অবস্থার আর কোনো পরিবর্তন নেই। এই প্রচণ্ড একঘেঁয়েমি থেকে অন্তত দু-এক মাসের ছুটি পেলে তাই সভ্যজগতের নিয়ম আর ব্যস্ততা থেকে বহুদূর সরে যেতে ইচ্ছে করে। মুমুদের চলে যাওয়ার পর এমনি এক জাহাজ মন্দার সুযোগে চলে এলাম পিন্টুদার ছোটনাগপুরের কোয়ার্টার্সে। এদিকে বন-বিভাগের একজন মাঝারি ধরনের কর্তা হল আমার পিসিমার ছেলে পিন্টুদা। পিন্টুদার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে মহুয়ার গন্ধভরা দিনরাতগুলো হু হু করে কেটে গেল। পুরো একমাস পরে প্রায় সরস্বতী পুজোর দিনেই কলকাতায় ফিরলাম। আমার আসবার একদিন আগেই জাহাজ উঠে গেছে। জাহাজের নাম 'সুবাং'। এক চিলতে জাহাজ। সেই চেনা ক্যাপ্টেন। আমি ঘরে ঢুকতেই বললে, এতদিন ছিলে কোথায়। ভাবলাম বুঝি মরেই গেলে। হাঁ করে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কি।

মনে হচ্ছে একটা কিছু যেন চাইছ তুমি। আমার টেবিলে যা আছে সর্বস্ব তুমি নিয়ে যেতে পার শুধু আমার বউটাকে নিয়ে যেও না। ওকে সত্যিই ভালোবাসি আমি। ওর বউয়ের ফটোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটি অবশ্যই সুন্দরী। একমাথা খাঁটি রুপোলি চুল। ভীষণ কচি কচি মুখ আর খুব ফ্রেস। মনে হয় একটুও মেক-আপ্ নেই। ক্যাপ্টেনের বিরাট চেহারার পাশে বড্ড বেশি যেন খুকি খুকি লাগে। অথচ চেহারা ভারি হলেও ক্যাপ্টেনের বয়েস বেশি না। আর মুখখানায় সব সময় এমন-একটা রাগী রাগী ভাব, যে মনে হয় এই মারে তো সেই মারে। হয়তো নাকের তলায় এক ঝোড়া গোঁফ থাকার জন্যেই এতটা ভারিক্কি লাগে। ভেতরে ভেতরে কিন্তু মানুষটা সত্যিই সরল আর ছেলেমানুষের মতো আমুদে। প্রথম যেবার ওকে দেখলাম সেবার সত্যিই বেশ সমঝে আর ভয়ে ভয়ে কথা বলেছিলাম। তার পর মাত্র ২-৩ দিনেই দেখলাম এমন মজাদার ফুর্তিবাজ লোক আর হয় না। মাতৃভাষা জার্মানি হলেও চমৎকার ইংরিজি শিখেছে। ছোটবেলায়

স্কুলের ইংরিজি বইগুলো পড়তাম আর খুব গর্বের সঙ্গে ভাবতাম ইংরিজি শিখলে বুঝি জগৎ জয় করা যায়। পরে জানলাম শুধু ইংরিজি ভাষা দিয়ে একটি ইংরেজ বাচ্চাকেও জয় করা যায় না, জগৎ তো কোন ছার। ভিন্ন মাতৃভাষার কোনো জাত মোটেই ইংরিজির ধার ধারে না। বরং বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখে। ফলে পদে পদে অসুবিধে ভোগ করতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি দয়া করে এক-আধটা ভাঙা ইংরিজি বলতে আর বুঝতে পারে তা হলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। ক্যাপ্টেন আমায় এক গ্লাস হাইনেকেন ঢেলে দিয়ে তৈরি হওয়ার জন্যে শোবার কুঠরিতে ঢুকল। স্টেরিও চেঞ্জারটা চালিয়ে বলে গেল যে তৈরি হতে তার দশ মিনিটও লাগবে না। ততক্ষণ আমি যেন ঠাণ্ডা বীয়ার সহযোগে সঙ্গীতসুধা পান করি। ও আমার সঙ্গে কাস্টমস্ হাউসে যেতে চায়। অগত্যা কি আর করা। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে ক্যাপ্টেন বলল, খবরদার আমার বউটার দিকে বেশি তাকিও না কিন্তু। জান, বউটার আবার বাচ্চা হবে। বাচ্চাটা আমারই অবশ্য। একটা ছেলে আছে। এবারেরটাও ছেলে হবে। তার পরে একটা মেয়ে। ব্যাস খতম। আমি দুটো ছেলে একটা মেয়ে চাই। ঠিক তোমাদের পরিবার পরিকল্পনার পোস্টারের মতো। 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার…।' এই তিনটে হয়ে গেলেই বউয়ের সব ফাঁক-ফোকোর একদম সীল করে বন্ধ করে দেব! সেটাই ভালো না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এটা তোমার হ্যামবার্গের স্যুপার মার্কেট পেয়েছ নাকি। যা চাইবে ঠিক তাই তাই পেয়ে যাবে। ক্যাপ্টেন বেশ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলল, দ্যাখ, বাড়িতে আমি যা যা খেতে চাই আমার বউ নিজে হাতে ঠিক তাই তাই একেবারে নিখুঁত রেঁধে দিতে পারে। বাইরের জিনিস দিয়ে যে সুস্বাদু রান্না তৈরি করতে পারে, নিজের পেটের ভেতরে নিজের শরীরের উপকরণ দিয়ে এই সামান্য ইচ্ছেমতো রান্নাটুকু সে করতে পারবে না এটা তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বল?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ভেতরে চলে গেল। আর ঠিক দশ মিনিটে একেবারে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো। সগু ইলেকট্রিক শেভার ঘষে সারা গালটা টকটকে লাল করে ফেলেছে। তার উপর এন্তার ওল্ড্ স্পাইস ঢেলে গন্ধে একেবারে মৌ মৌ করছে। ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজের বুকিংয়ের কাজ সারতে অফিস চলে গেলাম। তার পর চান খাওয়া সেরে ফের জাহাজে চলে এলাম। রাত পর্যন্ত থেকে যেতেই হল।

প্রচুর গানি এসে গেছে। হু হু শব্দে কাজ চলছে। কাল জাহাজ চলে যাবে। মাঝ গঙ্গায় জাহাজ। তাই গানি-ভর্তি নৌকো ঠিক হ্যাচের কাছে ভেড়ানো বড় মুশকিল। কারণ জলের টান বড় বেশি। ভাঁটার সময়ে টান কমলে একেবারে প্ল্যান করে প্রতিটি হ্যাচের কাছে অতন্ত দু-তিনটে করে নৌকো ভিড়িয়ে রাখতে হয়। একটির মাল খালি হলে তার পাশেরটিকে টেনে এনে ঢুকিয়ে দিতে হয়। জোয়ার এসে গেলে তখন আর কিছু করার নেই। হ্যাচের নিচেই নৌকো না থাকলে তখন হাজার মাথা খুঁড়ে মরলেও কোনো উপায় নেই। মাঝিরাও ঠিক সাহস করে না। কারণ, প্রবল জলের টানে তখন সে নৌকো কোথায় ভেসে যাবে কেউ জানে না। এই সবের জন্যে কাল দিনে কোথায় কি কাজ হবে তার হিসেব করে রাত্তিরেই যাতে নৌকো ঠিকমতো ভেড়ানো থাকে তার ব্যবস্থা করে জাহাজ থেকে নামলাম।

জাহাজে আসার জন্যে পরের দিন ভোরে ফের ডিঙিতে উঠেছি। মনে হচ্ছে গঙ্গার বিরাট বুকের উপর মাঘ মাসের সুন্দর আলোর ডিঙিতে সারা ভোরটাই যেন দুলছে। নাবিকদের শাদা টুপির মতো গঙ্গার মাথায় ভারি কুয়াশার টুপি তখনো খোলা হয় নি। কুয়াশার ওপারে দূরে হাওড়া ব্রিজের কঙ্কালটা কোনো অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর কঙ্কালের মতো অস্পষ্ট রেখায় ফুটে আছে। আমার ডিঙির ঠিক পাশ দিয়ে একটা ঢাউস স্টিমার চলে গেল। বড় বড় ঢেউ ডিঙিটাকে উপর নিচে ছুঁড়ে লুফে ভয় দেখাল। আমি

তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাঁশটা চেপে ধরে রাখলাম। শামুক-গুগলি-সমেত ছোট্ট একটা শ্যাওলার দ্বীপ পাশ দিয়ে ভেসে গেল। জাহাজে উঠলাম। তার পর সারাটা দিন মাঝিদের সঙ্গে চেঁচিয়ে গলা প্রায় বসে যাবার জোগাড়। মাল শেষ হতে হতে বেলা ১টা বেজে গেল। কোনো রকমে তখন নিজের ক্লান্ত ক্ষুধার্ত শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে ফেরার ডিঙিতে উঠলাম। ডিঙির চারি দিকে তখন উচ্ছল ঢেউয়ের হাসি-তামাশা মোটেই ভালো লাগছিল না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। পাড়ের কাছে এসে অন্য একটা দৃশ্য দেখে সারা মনটাও ভেঙে পড়ল। একটা মৃত সরস্বতীর খড়ের কাঠামো গঙ্গা মাটির উপর উলটে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। একদিন কত আড়ম্বরে পুজো পাওয়া সেই চন্দনচর্চিত শুভ্রবসনার আজ কী করুণ মরণ। এ দৃশ্যের জন্যে মনটা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বাইরের অবাঞ্ছিত দৃশ্যগুলো চোখের সামনে আসার আগে যদি ভদ্রতার খাতিরে একটা নোটিশ দিয়ে আসত। এমন সুন্দর চাঁদ-মালা-দোলা হাওয়ার সকালে কাদার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে-থাকা একটা সরস্বতীর কঙ্কাল দেখতে কার আর ভালো লাগে। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না বলে কোনো ঘটনাই থেমে থাকবে না। বাড়ি ফিরেই সমীরের লেখা একটা চিরকুট পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব ক্লান্তি এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে, ফের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। কাগজটায় মাত্র দু-লাইনে লেখা ছিল, মুমুর অবস্থা ভালো নয়। এখুনি সুজিতদের বাড়ি চলে আয়। আমি ওখানেই থাকবো।

কিছুদিন আগেও মুমুকে দেখেছি গড়িয়াহাটার মোড়ে। একটা বুক-স্টলের সামনে একঝাড় শাদা রজনীগন্ধার পাশে ওর উজ্জ্বল দুধ-দাঁত হাসি। সঙ্গে কে এক বান্ধবী ছিল। আমায় দেখতে পেয়ে মুমু তাকে প্রায় ভুলেই গেল। আমার সঙ্গে হুড়হুড় করে গল্প সুরু করে দিলে আমি আড়চোখে মেয়েটাকে দেখছিলাম আর ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটা প্রচণ্ড ক্ষেপে যাচ্ছিল। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারছিল না, শুধু একটা

রজনীগন্ধাকে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল। মুমুর সেদিকে খেয়ালই নেই। কোন একটা বিয়েবাড়িতে কে যেন ওকে সুজিতের দিদি ভেবেছে, আসলে ও মোটেই অতটা বুড়িয়ে যায় নি। ওর ননদের দেওর ওর ঠিক কে হয় বলতে পারে নি বলে নাকি কারা সবাই খুব হাসাহাসি করেছে। কোথাকার দীপ্তি মাছ-মাংস খায় না, অথচ নেমন্তন্নবাড়ি গিয়ে ভেজিটেবিল চপ ভেবে নাকি দিব্যি মাংসের চপ খেয়ে তারপব কি কেলেঙ্কারি। শান্তির আলজিভ নেই অথচ কি চমৎকার কথা বলতে পারে। আর বালিশে বা চৌকাঠে বসলে পেছনে ফোড়া হয় বলতে অমিতাদির সে কি হাসি। এই রকম অনর্গল বকবকানি যেন থামতে চায় না। শেষে ওর চরম অস্ত্রটি ছাড়ল যাতে আমি নির্ঘাত রেগে যাই বলল, এবার তুমি একটা বিয়ে কর বিমলুদা, কেমন। আমার হাতে এখন অনেক পাত্রী আছে। যদি রাজি থাক তো বল—।

এমন একটা বড়পিসিমার্কা গলায় পাকা গিন্নির মতো কথাটা বলল যে রাগের বদলে আমি হো হো করে হেসে ফেললাম। বললাম, বড় পাকা হয়েছিস না? বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস নাকি। আমি বয়েসে তোর চেয়ে কত বড় সে খেয়াল আছে। একটি চাঁটি খাবি।

মুমু ঘাড় দুলিয়ে বলল, না, চাঁটি নয়। অনেকদিন তুমি মুড়ি লজেন্স খাওয়াও নি। আজ খাওয়াতেই হবে।

কাছেই একটা দোকান থেকে ঠোঙাভর্তি মৌরি-দেওয়া মুড়ি লজেন্স কিনে দিলাম। মুমু হাসতে হাসতে হাত পাতল। শুধু সুজিতের কথা উঠতে মুমু কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল।

ওর কথা আর বোলো না। ওকে আর আমার একটুও ভালো লাগে না। নিজের ছেলেপুলে পছন্দ হয় না বলে আমাকেও যেন সেটা মেনে নিতেই হবে। আমার নিজের পছন্দ-অপছন্দ বলে বুঝি কিছু থাকতে পারে না। মোটামুটি একটা ভালোই চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু বেশি খাটুনি বলে বাবুর চাকরিটা পছন্দ হল না।

একপাল ছেলের সঙ্গে দিনরাত বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে এদিক সেদিক কোথা কোথা ঘুরে খুব ব্যস্তসমস্ত ভাব করে, যেন দিগ্বিজয় করে এলেন। অথচ আমি যদি একদিন একটু ফল কিনে আনতে বলি অমনি বাবুর মুখ হাঁড়ি। আমি ফল খেতে ভালোবাসি এটা কি দোষের? আমি বললাম যে ও যদি আনতে না পারে আমি দাদাকে খবর দিলে দাদা নিশ্চয়ই ফল দিয়ে যাবে। তাতে আবার বাবুর এমন আত্মসম্মানে লাগল যে তিন দিন আর আমার সঙ্গে কথাই বলল না। আমারও ভারি বয়ে গেছে সেধে সেধে কথা বলতে। আমিও কথা বলি নি। ঠিক করি নি বিমলুদা—

বললাম, আর দেরি করলে এবার তোর বন্ধু চলে যাবে সেও জীবনে আর তোর সঙ্গে কথা বলবে না। মুমু চমকে উঠে মুখে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এমা, কি বিচ্ছিরি হল, চিত্রার কথা আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। চললাম বিমলুদা। তুমিও তো আমাদের ভুলে গেছ। একদিন এস না বাবা…।

মুমুকে আমি সেই শেষ বারের মতো পায়রাপায়ে উড়ে পালাতে দেখেছিলাম। সেদিন কিন্তু মুমুর সেই চিরচেনা ছেলেমানুষি আর চঞ্চলতা সত্ত্বেও ওর চোখের কোণে কালি দেখে মনে মনে চমকে উঠেছিলাম। আজ ট্যাক্সি করে মুমুদের বাড়ি যেতে যেতে একে একে সব মনে পড়ছে। কাঁচ নামিয়ে দরজায় মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলাম। মাথার চুলের মধ্যে হু হু হাওয়া। বুকের মধ্যে হাওয়ার মতো দ্রুত দৃশ্যপট পালটে যাচ্ছে। সেই টেলিফোন ধরা ছোট্ট মুমু। সায়েবের সঙ্গে ফল কিনতে যাওয়া মুমু। দীঘায় মুমু। বিভিন্ন মুমু ঝাঁক ঝাঁক পায়রা হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আজও তাই পায়রার ঝাঁক ওড়া দেখলে মন খারাপ হয়ে যায় আমার। সহ্য করতে পারি না। আমি যখন পৌঁছুলাম তখন আর বিশেষ কিছুই করার নেই। নিজের ছেলেপুলে পছন্দ হয় না বলে আমাকেও যেন সেটা মেনে নিতেই হবে? না, মেনে নিতে সত্যিই পারে নি মুমু।

তবু জোর করে তাকে সেই বাচ্চা নষ্ট হওয়ার ওষুধটা খেতেই হয়েছে। তার পর তিনদিন সমানে শুধু রক্ত আর রক্ত। ডাক্তার যখন এসেছে তখন সবকিছু হাতের বাইরে চলে গেছে। প্রথম ক-দিন বাবার ভয়ে দাদাকেও জানাতে ভয় পেয়েছে। শুধু মুখ বুজে একা একা সবকিছু সহ্য করার চেষ্টা করেছে। যখন আর পারে নি তখন মরীয়া হয়ে নিজেই স্যুটকেস গুছিয়েছে। আধখানা গোছানো স্যুটকেস মেঝেতে তেমনি খোলা পড়ে। মুড়ি লজেন্সগুলো কিন্তু নিতে ভোলে নি। শুধু হাত কেঁপেছিল বলে হয়তো শাদা পাট করা সায়ার ভাঁজে ভাঁজে লাল, নীল, বেগুনি কান্নার মতো মুড়ি লজেন্সগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। গলা অবধি সবুজ চাদর টানা। ঠোঁট, আঙুলের ডগা, কপাল একেবারে রক্তশূন্য শাদা। কপালে তখনো শেষ দুপুরের একটু রোদ লেগে আছে। বোকা মেয়ে কোথাকার। একটু রোদ লেগেছে তো হয়েছে কি। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। আমাকে আবার ঠাট্টা করে বলা হয়েছিল চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে, ডালিম ফেটে পড়ে। নিজের বেলায় দোষ নেই বুঝি।

রাত্তিরে একা শুয়ে শুয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল, ভালো হবে না বলছি মুমু শীগগির উঠে পড়। কিন্তু বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারি না আমি। চোখ-দুটো আমার বড় বজ্জাত। সারাদিন আমার কথা মেনে ফোরম্যানি করবে, কিন্তু রাত ডিউটি দিতে কিছুতেই রাজি নয়। সময় হলেই ঠিক ঝানু দোকানদারের মতো রোলার শার্টার নামিয়ে দেবে। আর সেই সময় ব্রেনকে শিখিয়ে দিয়ে যাবে বার বার একটি কথা বলতে, মনে থাকে যেন, কাল কাক ডাকলেই ফের ডিঙিতে চড়তে হবে…পুরনো গঙ্গা…। তা ছাড়া মুমুটা বড় বেইমান। ওর জন্যে অন্তত রাত জাগব না। ওর জন্যে কাঁদব না। কিচ্ছু করব না। একবার আমায় বলেও গেল না। আসলে আমার মনে হয় যারাই মরে, তারাই বিশ্বাসঘাতক। জ্যান্তগুলোকে দিব্যি কলা দেখিয়ে পালায়। ঘুমের মধ্যে গঙ্গায় জোয়ার এলো। জল ফুলে ফুলে আমার ডিঙি আকাশ ছুঁই ছুঁই।

মুমু হাত বাড়াল। আমি কিন্তু ঢেউয়ের দোলায় সে হাত কিছুতেই ধরতে পারলাম না। মুমু আমায় তুয়ো দিয়ে হারিয়ে গেল। আমি খুব চেঁচিয়ে কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু তার আগেই হুড়হুড় করে জল নেমে যাচ্ছে। বুঝলাম গঙ্গার কাজ হাসিল হয়ে গেছে। সকালবেলার মরা সরস্বতীটাকে ডাঙা থেকে নিজের বুকের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। এখন ডাঙার গঙ্গামাটির উপর কোনো প্রতিমার চিহ্ন নেই। সব সাফ হয়ে গেছে।

আচ্ছা, হঠাৎ তুমি কোথায় সরে পড়লে বল তো? আমি উপরের ডেকে দাঁড়িয়ে তখন থেকে দেখছিলাম তুমি নিচে শেডের কাছে ঘুরঘুর করছ। খালি ভাবছি এবার নির্ঘাত উপরে উঠবে। কোথায় কি। হঠাৎ দেখি তুমি কোথায় সরে পড়েছ। কোথায় পালিয়েছিলে বল তো।

ইটালিয়ান জাহাজের ক্যাপ্টেন মার্সি প্রশ্ন করল চ্যাটার্জি সায়েবকে। চ্যাটার্জি সায়েব উত্তর দিলেন—গায়ের এই মোটা পুলওভারটা খুলতে শেডের মধ্যে ঢুকেছিলাম। অফিসে একটা মিটিং ছিল বলে গলায় একটা টাইও বাঁধতে হয়েছিল। অথচ বাইরে এই প্রচণ্ড রোদে এতসব কি পোষায়।

মার্সি হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, একটা পুলওভার আর টাই ছাড়বার জন্যে তুমি শেডের মধ্যে সেঁদিয়ে গেলে। কোনদিন শুনব প্যাণ্ট ছাড়বার জন্যে তুমি চাঁদে চলে গেছ। এত কি লজ্জার ব্যাপার আছে, এখানে তো কোনো মহিলা নেই।

বাঁ-হাতটা আলতো করে মাথার চুলে বুলিয়ে চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, মহিলা? মহিলা এখানে কেন, আমার জীবনেই নেই। আচ্ছা, বল তো ক্যাপ্টেন মানুষ খাটে কিসের জন্যে। একটা অভাবহীন নিশ্চিন্ত জীবন, মেয়েমানুষ, কিছু দুধের খোকা-খুকি আর বেশ মাইলের পর মাইল আরাম। এইজন্যেই তো যত কাজ করা যত খাটাখাটুনি। অথচ আমার এমনই পোড়াকপাল এ-সব কিছুই জুটল না। তবু যে কোত্থেকে এত লজ্জা তা আমিও বুঝি না।

মাসি বলল, বুঝে কাজ নেই তোমার। তুমি যেমন পাজি তেমনি সিনিক্। নিজের ছেলে-বউ ঘরসংসার সম্বন্ধে কেউ এ-ভাবে কথা বলতে পারে কখনো শুনি নি। তোমার সত্যিই কি কোনো ঘরসংসার নেই? থাক কোথায়?

'ঘরসংসার' 'থাক কোথায়' এ-সব কথা আমারও প্রায়ই মনে হয়। আজীবন কত ঘাটের জল খেয়ে যে ঘুরে বেড়াচ্ছি তা মাসিকে বোঝাই কি করে। শেষমেস ভেবেছিলাম দত্ত বাড়িতেই বুঝি আমার ঘাট পাব—শেষ আশ্রয়।

কিন্তু ডালপালাওলা কত মানুষজনের সঙ্গে শেকড় জড়াজড়ি করা এ বাড়িটাও একদিন ছাড়তে হল। বুকের মধ্যে ঘুরন্ত প্রপেলারে সমস্ত জল তোলপাড় হয়ে উঠেছিল সেদিন…বার্থ ফাঁকা করে জাহাজ বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার ঘরটা ছিল পুরনো বাড়ির দোতলায়। পাশেই দুটো পড়ার ঘর। বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়ত। দারুণ জমজমাট বাড়ি তখন। আসল বড়মানুষি কাকে বলে তা দত্তবাড়ির মতো মস্ত স্টিভেডোর বাড়িতে না থাকলে কখনো জানতে পারতাম না। নতুন বাড়ির নিচের তলায় প্রায় তিন-চারখানা বৈঠকখানা ছিল। সামনের দিকটায় খানিকটা সিমেণ্ট-বাঁধানো উঠোন। তার ধারে ধারে জমি ছাড়া ছিল। তাতে অজস্র পাতাবাহার আর সরু লিকলিকে পামের সারি। মাঝখানটায় মাটিতে পোঁতা লাল সিমেণ্টের পাড়-দেওয়া কতকটা হার্ট আকারের একটি জলাশয়। তার মধ্যে শৌখিন রঙিন মাছের চলাফেরা। তার গায়ে গায়ে কাস্ট-আয়রনের নকৃশা-তোলা লম্বা বেঞ্চের মতো কিছু ভারি ভারি চেয়ার। কর্তারা বিকেলে উঠোনে পায়চারি করতেন। মাঝে মাঝে লোহার চেয়ারে বসে বড় বড় পিচকিরি দিয়ে গাছে জল দেওয়া দেখতেন। সামনের বৈঠকখানায় মেঝে জোড়া শাদা চাদরঢাকা ঢালাও গদি আর তাকিয়া। গদির উপর দু পাশে দুটি বড় ক্যারামবোর্ড। তার ঘুঁটিগুলি সব হালকা পাথরের। আর স্ট্রাইকারগুলো হাতির দাঁতের। মাঝখানে কিছু

তাসের বাণ্ডিলও পড়ে থাকত। সারাদিন খটাখট ক্যারামের শব্দ অথবা তাস ফেটানোর ফটফট। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল বাড়ির লোক এখানে যত খেলত, পাড়ার লোক খেলত তার চেয়ে বেশি। গোটা তালতলার লোকের এটাই ছিল বৈঠকখানা। বন্ধুর বন্ধু, তার বন্ধু, এইভাবে রোজ আসা-যাওয়ায় সবাই সবাইয়ের দাদা-কাকা-মামা হয়ে উঠত খুব অল্প সময়ে। সেই বৈঠকখানারই কড়িকাঠ থেকে লম্বা লম্বা লোহার শিকে অজস্র পাখির খাঁচা ঝোলানো থাকত। কেউ কিন্তু পাখি দেখতে পাবে না। শুধু তাদের কিচিরমিচির শুনতে পাবে। কারণ এ-সব দামী বিলিতি পাখির চোখে সূর্যের আলো-লাগা নাকি দারুণ খারাপ। তা ছাড়া এ-সব পাখিরা নাকি এত মানুষজন দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারে। তখন তাদের প্রাণপাখিও নাকি ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতে পারে আচমকা। ফলে, প্রত্যেকটি খাঁচা শাদা থানকাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হত। আর সারাদিন ধরে চা বৃষ্টি হত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা আসত বিরাট সিলভারের কেটলি ভরে। নতুন বাড়ির দোতলায় ছোট্ট জলছাদের কুটরিতে দুটি বড় বড় তোলা উনুনে ডেকচি করে গরমজল ফুটত চব্বিশ ঘণ্টা। প্রথম দেখলে মনে হতে পারে হয়তো বাচ্চাদের স্নানের জন্যে গরম জল ফুটছে। রাজ্যের চাকরদের ভিড় লেগে থাকত এই ছাদটায়। সব সময়ই দেখা যেত তাদের কেউ না কেউ পালা করে নিজেদের কলাই-করা গেলাস ভর্তি করে চুমুক দিচ্ছে চুকচুক। ঐ ছাদের সঙ্গেই আর একটা উঁচু নির্জন ছাদ ছিল। সেখানে ছিল সেজবাবুর নাড়ুগোপাল ছেলে বিজনের পায়রার খোপ। কত রঙের কত বাহারি পায়রা যে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। বিজন আর আমি এক-সঙ্গে তখন বঙ্গবাসী কলেজে পড়তাম। বিজন তখন আমার গলায় গলায় বন্ধু। রোজ বিকেলে দু জনে চায়ের কাপ হাতে ঐ পায়রার ছাদে আড্ডা হত। যদিও একটু বেশি বাবু ধরনের ছিল বিজন, তবু ওর মনটা ছিল খুব নরম। ওকেও সবটা দোষ দেওয়া যায় না। বেশি বয়েসের ছেলে বলে সেজমা ওকে এমন মাথায় তুলেছিল যে কোনো-

দিনই ওর আর হাত পা গজাল না। বিজন চিরকাল কোলের খোকাটি থেকে গেল। সেই বিজনের যেদিন ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল সেদিন থেকেই তার কালবেলা শুরু। কিছুদিনের মধ্যেই বিজন লেখাপড়া ছেড়ে, যেন হঠাৎ সাবালক হবার জন্যে ঝট করে জাহাজী কাজে ঢুকে পড়ল। কাজ তো কলা। শুধু সকাল বিকেল পাঁচ-জনের দলে একটু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে আসা। আসলে বড় সুব্রতবাবু ও মেজ হরেনবাবু—এঁরাই সব কাজ দেখতেন। বিজন তাঁদের সঙ্গে গিয়ে অন্য কেবিনে বসে একটু কফি সিগারেট খেত আর কিছু বিদেশী কস্‌মেটিক্‌স জাতীয় এটা সেটা পকেটস্থ করে কপালের ঘাম মুছে বাড়ি ফিরত। সেটাই ছিল ওর 'বড্ড কাজের চাপ'। সুব্রত-বাবুর দিনকালে উনি কুলিদের সঙ্গে জাহাজের লোয়ার হোল্ডে নেমে নিজের হাতে গানি খালাস করেছেন। তখনকার দিনে সারা দুনিয়াতেই মানুষের মজুরির দাম কম ছিল। ফলে, কেউ সেটা খুব একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। সে-সব দিনে সুব্রতবাবুর নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকত না। কতদিন এমন গেছে যে জাহাজ ফিনিশিংয়ের চাপে সুব্রত দত্ত সারা রাত বাড়ি ফেরার সুযোগ পেতেন না। আর বাড়িতে তখন রাতের পর রাত চোখে ভাবনা চিন্তার হ্যারিকেন জ্বেলে নতুন বউ বড়মা শোবার ঘরে একা। দুটি সন্তান ওঁর। বড় ছেলে সুনীলদা আর মেয়ে রুণা। আই. এস. সি. পাশ করেই বাবার সঙ্গে জাহাজে ঢুকেছিলেন সুনীলদা। বেশ শৌখিন চেহারা ছিল সুনীলদার। লম্বা একহারা চেহারা। গায়ের রঙ হলদে ধরনের ফর্সা। মাথায় পাতলা বাদামী চুল। আর মুখটা একটু মেয়েলি, প্রায় বড়মা বসানো। বড় বড় চোখ আর লম্বা কালো চোখের পাতা। এত নরম নরম মুখ আর চেহারা যেন ঠিক জাহাজের কাজে মানায় না। শুধু মুখই নয়, সুনীলদার স্বভাবটাও ছিল বেশ নরম। অথচ জাহাজের কাজ সুনীলদা ভালোই বুঝতেন এবং খাটতেও পারতেন মোটামুটি ভালোই। কিন্তু অনেকেই ওঁর ঐ নরম স্বভাবের সুযোগ নিত। একটুতেই মাথায় চড়ে বসার চেষ্টা

প্রতিকার করার চেষ্টা তাঁর সাধ্যে কুলতো না। আসলে জাহাজের এই ছ্যাঁচড়া টাইপের কাজে একটু তম্বি, একটু কড়া হুমকি দেখাতে না পারলে কাজ হাসিল করা বেশ শক্ত। তবু সুনীলদা বুদ্ধিমান ছেলে বলে সবদিক ম্যানেজ করে নিতে পারতেন।

মেজবাবু হরেন্দ্রচরণই ছিলেন দত্ত পরিবারের সবচেয়ে ঘোড়েল ও ধুরন্ধর এবং যাকে বলে গণ্ডারের চামড়ার মানুষ। স্ত্রী মারা গেছেন বহুকাল। একটিমাত্র মেয়ে তাঁর, নাম সান্ত্বনা। বয়েসে আমাদের চেয়ে কিছু বড় বলে আমরা সন্তুদি বলেই ডাকতাম। তবে বয়েসের তুলনায় চিরকালই সন্তুদি অদ্ভুত এঁচোড়ে পাকা আর বুড়োটে। মোটাসোটা কুমড়োপটাস চেহারা। ঘাড় বা গলা বলতে কিছু নেই। মুণ্ডুটা প্রায় পিঠের উপরেই বসানো। মুখটা একদম একটা কাঁচা ঘুঁটে। বাড়িতেই মাস্টার রেখে কী সব লেখাপড়া করত এবং ওর নিজের ধারণা ছিল যে এত বিদ্যে-বুদ্ধি খুব কম মানুষেরই থাকে। পরীক্ষা-টরিক্ষা দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করে নি সন্তুদি। ওর ধারণা চেষ্টা করলেই নাকি বি.এ-এম. এ. পাশ করা ওর পক্ষে তেমন কিছুই নয়। আমি পড়াশোনা মোটেই করতাম না, শুধু পরীক্ষার খাতিরে যেটুকু না করলে নয় সেটুকু। তাতেই ছিল সন্তুদির যত রাগ আর হিংসে। আমরা হয়তো তালতলা স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ছানু দত্তর টিমের মারপিটের খুব গরম গরম আলোচনা করছি, সেখানে হঠাৎ সন্তুদির আবির্ভাব। এসেই হঠাৎ 'মানবতা' 'ঐক্য-টৈক্য' ইত্যাদি ফাঁকা বুলির নেহেরুসুলভ বক্তৃতা ঝেড়ে চলে গেল। কিংবা জন্মাষ্টমীতে মাছ খেলে শাস্ত্রে লেখা আছে কি কি পাপ হয়—সে সম্বন্ধে আমাদের একটু জ্ঞান দিয়ে সরে গেল। শাস্ত্রটা যেন বাটা কোম্পানির শো-কেস। থরে থরে সব পাপের জুতো সাজানো। ঠিক ঠিক পাপের সাইজমতো এক-একটা গলিয়ে নিলেই হয়ে গেল।

সেজবাবু কেষ্টচরণ এক অদ্ভুত লোক। জীবনে জাহাজী কারবারের ধারে-কাছে যান নি। নিজে কি এক গাড়ির পার্টসের

দোকান করেছিলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকার লোকসান দিয়ে তার গণেশ উলটে গেছে। তার পর থেকে তাঁর সেই যে শুয়ে বসে দিন কাটছে তার আর রেহাই নেই। তার মানে কিন্তু এই নয় যে ওঁর নড়তে-চড়তে আঠারো মাসে বছর। বরং ঠিক উলটো। কৃষ্ণচরণবাবু মানুষটা একটু বেশি চটপটে। সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে স্নান সেরে দাড়ি কামিয়ে একেবারে রেডি। নাক চোখ মুখে কোথাও এতটুকু ভোঁদামির লক্ষণ নেই। সরু ছোট্ট চিবুক, তীক্ষ্ণ অথচ ছোট্ট নাক, পাতলা ঠোঁট। সব মিলে বেশ বাবু বাবু মিষ্টি ধরনের। সকাল-সন্ধ্যে নিয়ম করে বেড়ানো চাই। বাইরে বেরুবার একটি পেটেন্ট পোশাক ছিল তাঁর। সার্কস্কিনের শাদা প্যান্ট আর শাদা গলাবন্ধ কোট। পকেটে কাশীর মিষ্টি সুপুরির ছোট্ট একটি রুপোর ডিবে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় খাওয়া-দাওয়া শেষ।

ছোট এলাচের গুঁড়ো-দেওয়া একখিলি পাতলা মিঠে পান মুখে দিয়ে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত দিবানিদ্রা। এই ঘুমের সময়টুকুতে শীত-গ্রীষ্ম সব সময় জানলার কাঠ বন্ধ, বারান্দার চিক ফেলা—সব একেবারে দিনদুপুরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠিক তিনটে থেকে চায়ের তোড়জোড়। চারটের মধ্যেই ধর্মতলা গিয়ে সেখানেই গাড়ি রেখে নানা দোকানে টহল দিতে দিতে নিউমার্কেট পর্যন্ত এক চক্কর হাঁটা। তার পর সন্ধ্যের মধ্যে আধঘণ্টার জন্যে বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে কে কেমন আছে খোঁজখবর নিয়ে সোজা বাড়ি। ফিরে এসেই স্নান। স্নানের পর ফর্সা ধুতি-গেঞ্জি পরে, পায়ে নরম কালো চামড়ার ঢাকা চটি লাগিয়ে সামনের উঠোনে একটু পায়চারি। রাত আটটার মধ্যে পাতলা মাছের ঝোল দিয়ে সরু আলো চালের ভাত খেয়ে একেবারে বিছানায়। প্রতিদিন এই এক রুটিন। এর একচুল এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই কখনো। এত নিয়মে নড়াচড়া আর এই ফর্সা তুলতুলে চেহারা দেখলে মনে হয় বাড়িতে ভাজা একটা বেগুনি খেলেও হয়তো ভদ্রলোক মারা যাবেন। ছেলের কর্মজীবন সম্বন্ধে

সন্দেহ ছিল বলেই বোধ হয় কর্তাবাবু, অর্থাৎ, তিন ভাইয়ের পিতৃদেব ব্রজচরণবাবু এই সেজ ছেলেটিকে আলাদা করে তিনটি বাড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে মাস গেলে শুধু বাড়ি ভাড়া থেকেই সংসার চলে যাওয়া উচিত। জাহাজী ব্যবসা থেকে নিজস্ব শেয়ারের প্রাপ্যটুকু তো ছিলই, তা ছাড়া মাসে মাসে বাড়ি ভাড়ার টাকাও জমত নিরাপদে। ফলে তিন ভাইয়ের মধ্যে সেজবাবুর অবস্থাই ছিল বেশি জমাট। আর এই জমাট অবস্থার মধ্যে থিতিয়ে থেকে থেকে সেজমা একটি দেখবার মতো চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। স্বামী সেজবাবু আর ছেলে বিজন ছাড়া তাঁর কাছে সারা দুনিয়াটা নানা জীবাণুতে ভর্তি যাদের বাঁচা মরায় কি বা এসে যায়। যতদূর সম্ভব সংসারের ঘাড় ভেঙে যা পাওয়া যায় তা-ই সই টাইপের মানুষ উনি। সংসার থেকে ঝি-চাকরদের মাস মাইনে দেওয়া হত। ফলে, সেজমার দরকার না হলেও, যেহেতু সুব্রতবাবুর বড় সংসারের জন্যে তিনটি লোক আছে, উনিও জোর করে তিনটি লোক রেখেছিলেন।

বাইরে থেকে ফিরে বিজন এসে দাঁড়ালেই অত্যন্ত সুশিক্ষিত কুকুরের মতো একটি চাকর এসে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ত জুতোর ফিতে খোলার জন্যে। আর একটি তার গায়ের কোট খোলার জন্যে বকের মতো অপেক্ষা করে থাকত। দু জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিজন কোনো সদ্যমুক্ত মার্কিন ছবির নায়কের মতো বারান্দার দিকে উদাস দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকত। সেজমার কড়া অর্ডার ছিল ছেলে যেন কখনো হেঁট হয়ে জুতোর ফিতেতে হাত না দিয়ে ফেলে। বিজনের তখনকার অবস্থা দেখে সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে সেই চলতি গল্পটা মনে পড়ত। সিরাজ নাকি কোনো-এক যুদ্ধে হেরেছিলেন স্রেফ তাঁর জুতো পরিয়ে দেবার কোনো লোক কাছে ছিল না বলে। লেখাপড়া যখন বিজনের হল না তখন নিজেদের কাজে ঢোকা ছাড়া আর গতি কি। অথচ আমার তখনো লেখাপড়া চলছে। এবং হয়তো একদিন পাশ-টাসও করব—

এটাই ছিল সেজমার একমাত্র দুশ্চিন্তা। জনে জনে বলে বেড়াতেন, ছেলেটার লেখাপড়া কিস্সু হবে না, শুধু শুধু এ বাড়ির অন্ন ধ্বংসাচ্ছে। আর দিব্যি টেরি বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়েস থাকতে থাকতে যা হোক একটা কাজে ঢুকে যা, তা না। আবার বলতে গেলে কী অবজ্ঞার হাসি।

অথচ আমার কাছে বলতেন, তা তুই লেখাপড়া নিয়ে আছিস, ভালোই। তোর তো আর বাপ-চোদ্দপুরুষের ব্যবসা নেই যে হেলে-দুলে দিন কাটাবি। নিজের আখেরটা গুছিয়ে নেওয়াই ভালো। এই ছ্যাখ না, এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে সান্তু দিনরাত বাপের মটর চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমার বিজু সকাল থেকে খেটে খেটে আধখানা হয়ে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত আপিস থেকে তার একটা নিজস্ব গাড়ি হল না। সেজবাবুর গাড়ি নিয়ে তো টানাটানি করা যায় না। উনি সময়ের মানুষ। ওঁর পক্ষে একদণ্ড গাড়ি ছাড়া চলে না।

দেখতে দেখতে বিজনের একদিন বিয়ের সব ঠিক। বিরাটপুরের মস্ত জমিদার বাড়ির মেয়ে। বিজনের বিয়ের পুরো বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। শুধু খামচা খামচা মনে পড়ে।

পাকা দেখার দিন মেয়ের বাড়িতে যা যা খাওয়ানো হয়েছিল তার একটা ষোল পৃষ্ঠার বই ছাপা হয়েছিল। তাতে দুনিয়ার তাবৎ খাদ্যবস্তু তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল হৃদ্‌যন্ত্র, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উপর কার্যক্ষম অনেক কবিরাজি, দুষ্প্রাপ্য শেকড়-বাকড়ের আচার এবং মোরব্বা। অর্থাৎ, এত সব খাওয়ার পরে যাতে বায়ু-পিত্ত-কফ ত্রিবিধ দোষ থেকে কোনো শারীরিক হানি না আসতে পারে। অনেক আদরের বউমা হয়ে আশা এল দত্তবাড়িতে। এই আশা খোলা বারান্দা পেরিয়ে ঘরে আসার সময় একটি ঝি তার মাথায় ছাতা ধরে থাকত। কড়া রোদের ঝাঁঝ লেগে বউ-দিদিমণির যদি মাথা ধরে যায়। একবার সখ করে কচি মটরশুঁটির সবুজ খোলা ছাড়াতে গিয়ে আশার হাতে নাকি এমন ফোস্কা পড়েছিল যে আশার মা সেই

বেহালা থেকে ডাক্তার নিয়ে ছুটে এসেছিলেন। এ-সব আমায় একদিন রুণা বলেছিল। রুণা মানে সুনীলদার ছোট বোন, সুব্রত-বাবুর মেয়ে। দত্তবাড়ির বহু মানুষের বিশাল অন্ধকার বাঁশবনে ঐ মেয়েটাই একমাত্র জোনাকির মতো জ্বলে বেড়াত। গায়ের রঙ মোমের শিখার মতো উজ্জ্বল-নরম। চেহারাটা একটু রোগার দিকেই। মুখটা ভারি মিষ্টি। না-ফোটা চাঁপার কলির মতো তীক্ষ্ণ রেখায় বাঁধা দেহ। রঙিন কামনার বুদ্বুদ ওর মুখের দিকে তাকালেই ফুট করে ফেটে যায়। মনে হয় এ-মেয়ে পুরুষকে ওর বুকের গভীরে মা-পাখির মতো আগলে রাখবে। হয়তো ওর মুখের কোথাও বা ঘাড়ের ঝোপে কিছু কিছু আন্তরিক চুমু লুকিয়ে রাখা যায়, তার বেশি না। মনে মনে ভাবলেও এ-সব কথা কিন্তু আমার কল্পনাতেও ঠাঁই পেত না। রুণারা এত দূরের জেটপ্লেনের আলো আর তুলনায় আমি এমনই এক গঙ্গা ফড়িং যে এ রকম ভাবাটা নেহাতই পাগলামি। এ-সব অর্কিডের জাতই আলাদা।

আচ্ছা, তোমার দেশের মানুষে মানুষে বড় গরমিল, কেন বল তো? শিখগুলো গোঁফ পাকিয়ে, বুক ফুলিয়ে মিলিটারি, পার্সি আর মাড়োয়ারিরা কোটিপতি ব্যবসাদার, মাদ্রাজিরা বড় বড় অফিসের একাউন্‌টেণ্ট বড়বাবু। এ রকম ভাগ ভাগ ব্যাপার কেন। সবাই সব কাজ শিখবে, সব কাজ করবে তবেই তো দেশের উন্নতি। আমার নিজের আবার শিখগুলোকে খুব ভালো লাগে। ওরা লোক বেশ ভালো—তাই না?

ইটালিয়ান ক্যাপ্টেন মার্সি প্রশ্ন করেছিল বেশ সরলভাবেই। উত্তর দেব কি, প্রশ্ন শুনে আমার পেট ফেটে হাসি পাচ্ছিল। বললাম কে তোমায় এ-সব বললে। এর ঠিক উলটোটাও তো হতে পারে। তুমি হয়তো আঙুল গুনে একটা মিলিটারি শিখ, একটা পার্সি আর একটা মাদ্রাজি দেখে থাকবে। অথচ এই কলকাতা শহরে কত শিখ যে বাস-ট্যাক্সি চালায়, কত মাড়োয়ারি যে আজীবন বাঙালির বাড়ির দারোয়ান হয়ে জীবন কাটায় তার খবর রাখ? প্রত্যেক

শিখই যে খুব বীর এবং ভালোমানুষ তাও বলা যায় না। তবে ওদের বেশির ভাগই খুব খাটিয়ে। ভিক্ষে-টিক্ষে করা ওরা মোটেই পছন্দ করে না।

মার্সি বলল, তাই বুঝি? আমি কিন্তু তোমায় এ-সব বিভিন্ন জাত-টাতের কথা ঠিক বলতে চাই নি। আমার দেশের ছেলেমেয়েরা ভারতীয় মানেই জানে গোঁফ-দাড়ি-পাগড়ি বাঁধা একটা জাত। আসলে আমি তোমায় যা বলতে চাই সেটা হল তোমার দেশের কাজের শ্রেণীবিভাগ। আর একটি ব্যাপারও আমার কাছে দারুণ দৃষ্টিকটু। সেটা হল, তোমার দেশের বড়লোকদের মেজাজ। তোমার দেশের বড়লোকগুলো এমন-একটা ভাব করে যেন সারা দেশে তারাই একমাত্র মানুষ, বাকি প্রাণীগুলো যেন সব পিঁপড়ে-আরশোলার সামিল। এমনটা কেন হয় বলতে পার?

বললাম, আসলে হয়তো বড়লোকগুলো গরীবদের ভয় পায়। ঘৃণাটা অনেক সময় নিজের মনের ভয় বা অজ্ঞতা ঢাকবার একটা ছল। ঐ সব পেটপড়া, পাঁজরাসার, ঘেয়ো মানুষ আর মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের জীবনটা বরফের দেশের পেঙ্গুইনদের মতো বড্ড অবাস্তব লাগে। তুলনা করতে ভয় পায়। গরীব-বড়লোকে এতটা দুস্তর ফারাক হয়তো দুনিয়ার আর কোনো দেশে নেই। তা ছাড়া আমার দেশের বড়লোকগুলোর হয়তো ধারণা যে গরীব মানেই কমিউনিস্ট—ওরে বাব্বা, কমিউনিস্ট থেকে তফাত যাও। এইরকম নানা ব্যাপার-স্যাপার।

মার্সি বলল, তোমার দেশে আবার কমিউনিস্ট কি। না খেয়ে খেয়ে তো ওদের দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। লাল ঝাণ্ডা তুলতে গিয়ে নিজেরাই উলটে পড়ে যাবে। এ দেশের উন্নতি হতে আরো শ-দুয়েক বছর কেটে যাবে। এখানে সব কিছুই আজব। অর্ধেক লোক দেখি চারিদিকে অকারণে ঘোরাফেরা করছে। পথে-ঘাটে লোকের শেষ নেই। মন্থরগতিতে এদিক-সেদিক কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। এক একসময় জিগেস করতে ইচ্ছা করে, এত ধীরে-সুস্থে হেলে-দুলে

কোথায় চলেছ হে তোমরা, কেন যাচ্ছ। আমার স্থির বিশ্বাস ওরা নিজেরাই হয়তো সে প্রশ্নের উত্তর জানে না।

ক্যাপ্টেনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, আমার দেশের জনসংখ্যা যে কী বিরাট, কী ভয়াবহ এখানের বেকার সমস্যা—তা যদি জানতে সায়েব। তারা সব যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কি। তাই নানা ধান্দায় এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা।

মার্সি বলল, কিন্তু যারা কাজ করছে তারাও তো তেমনি। অফিসের চেয়ারে বাবুর ব্যাগ আছে, বাবু নেই। জাহাজের হোল্ডে দিনরাত যখনই সুযোগ পায় চট পেতে দিব্যি ঘুম দিচ্ছে। কিংবা বোঝাই ছেড়ে ওর্-এর ছোট ছোট ঢেলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিব্যি নিজেদের মধ্যে খেলা চলছে। এ-সবের মানে কি? এরা কাজ কতটুকু করে, কখন করে, কিছুতেই বুঝি না। আর দিনের পর দিন এত সময় নষ্ট হলে একটা দেশের উন্নতি হয় কি করে?

আমি রহস্য করে প্রসঙ্গটা হালকা করার জন্যে উত্তর দিলাম, এ-সবের নামই ইণ্ডিয়া। ওরা দেশের জন্যে কাজ করে না। পেটের জন্যে কাজ করে। অতি অল্পেই ওদের পেট ভরে। আর পেট ভরলেই ওরা ঘুমোবে, খেলবে, হাসবে। ব্যাস, আর কিছু নেই।

বেশ কিছুদিন ধরে এই ইটালিয়ান জাহাজটা কাজ করছে। সেই প্রাচীনকালের স্ট্র্যাণ্ড রোডের জেটিতে বার্থ পেয়েছে। জাহাজ ভর্তি লম্বা লম্বা লোহা আর লোহার প্লেট। এ-সব মাল নিয়ে এই ভাঙা পুরনো সরু ধ্যাড়ধ্যাড়ে জেটিতে কাজ করা প্রচণ্ড মুস্কিল। শিফট্ শুরু হওয়ার অন্তত ঘণ্টা খানেক বাদে কাজ করার শ্রমিক আসবে। তার পর আরো পনেরো-বিশ মিনিট লাগে কাজ আরম্ভ হতে। ওদের উপর আমাদের জাহাজীবাবুদের কোনো এক্তিয়ার নেই। তবু দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে জিগেস করতেই হয় যে এত দেরী কেন? উত্তরে বোঝা যায় দোষটা পুরো ওদের নয়। দূরে বুকিং অফিস থেকে হেঁটে আসতে বহু সময় যায়।

এ নিয়ে শুধু যুক্তি তর্ক আলোচনাই সার। সারা দেশ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, আর মাঠে মাঠে, অফিসে-বাড়িতে রাজ্যের লোক শুধু কথা বলছে আর চিঠি লিখছে। ফলে এ দেশে চলে না কিছুই। যদি বা কোনোরকমে জাহাজের কাজ শুরু হল, এক শিলিং লোহার চাদর জেটিতে নামানো হল, দেখা গেল সেগুলো নিয়ে যাওয়ার ট্রেলার নেই। সব ছোট ছোট তিন টন বা পাঁচ টনের ট্রেলার। তাও আবার কয়েকটার টায়ার ফেটে অচল। ইতিমধ্যে প্রায়ই আবার ট্রেলার থেকে প্লেটগুলো নামবার ক্রেনটা যায় বিগড়ে। তখন সমস্ত ট্রেলার জোড়া হয়ে পড়ে থাক ইয়ার্ডে। জাহাজের মাল জাহাজেই ঝুলতে থাকে। সারাদিন কেবল ছুটোছুটি। শুধু তেল দেওয়া। মধু ঢালা। মুখের ফেকো উড়িয়ে চেঁচামেচি। দিনে কতবার যে জাহাজ থেকে জেটি, জেটি থেকে জাহাজে ছুটোছুটি করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। বছরের পর বছর এমনি চলে। জাহাজের বিদেশী অফিসাররা এ-সব কাণ্ডকারখানা দেখে হাসে। জঘন্যভাবে বিদ্রূপ করে। এজেন্টের সায়েবরা এসে আমাদের উপর চোখ রাঙায়। মাত্র একদিনে একটা শাদা শার্ট ঘামে-তেলে শরীরের সঙ্গে লেপটে সাবাড়। বগলের তলায় এমন জঘন্য ছোপ ধরে যে জন্মে ওঠানো যায় না। আমরা তখন সম্পূর্ণ এক অন্য জগতের মানুষ। এ জগতের সবটাই কালো নোংরা দুর্গন্ধ এবং নির্মম অপচয়ে ভরা। অন্ধকার কালো কালো শেড, অজস্র জাহাজের ফানেল ক্রমাগত ফুঁ-দিয়ে ভক্‌ভক্‌ কালো ভুসো ওড়াচ্ছে, কাদা, নুনমাখা কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধময় জল গড়াচ্ছে, পচা গম আর উৎকট গন্ধ-ভরা পচা হাড়ের গুঁড়োয় লক্ষ লক্ষ মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। এই হল বর্তমান ডকজীবীদের সাধের জগৎ। এখানে বসে মেট্রো লাইটহাউস অথবা পার্ক স্ট্রিটের আলো-ঝলমল-জীবন কেমন স্বপ্নলোকের মনে হয়। আলিপুর, নিউ-আলিপুর, পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণাঞ্চল, চৌরঙ্গি অথবা লেকপাড়ার সুন্দর আলোকিত বাতাসী ফ্ল্যাটে পুত্রকন্যা-সমন্বিত সুখী পরিবারের দৃশ্য এখানে বিলিতি ছবি। কুকিং রেঞ্জের

হিট্ কণ্ট্রোলটা ঠিক কতটা ঘুরিয়ে রাখলে স্টেকটা হাফ-ডান্ না হয়ে ওয়েল-ডান হতে পারত—এই ভেবে যে-সব নিতম্বিনীরা কাঁদো কাঁদো, তাদের কাউকেই চিনতে পারা যায় না এখান থেকে। সেই জন্যে আমাকেও এতদিন আমি ঠিক চিনতে পারি নি। বহুকাল পরে এক নরম লাল রোদের বিকেলে বিজনের পায়রার ছাদে উঠেছিলাম ওকে সেই চিঠিটা দেবার জন্যে। দার্জিলিংয়ের হোটেল থেকে জানাচ্ছে যে ঘর পাওয়া যাবে। চিঠিটার জন্যে সত্যিই বিজন বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। চিঠিটা আমার জামার পকেটেই ছিল। জানতাম না যে ছাদে আশাও ছিল। আমি চিঠিটা বার করতে বিজন খুব আগ্রহের সঙ্গেই হাত বাড়াল। আশা এগিয়ে এসে হঠাৎ বিজনের হাতটা মৃদু টানে সরিয়ে দিয়ে বলল, আপনি চিঠিটা ঐ ফুলের টবটায় রেখে দিন, ও পরে নেবেখন।

ক্ষমতার অতিরিক্ত বেশি ভারি কোনো মাল ওঠাতে চাইলে, বোবা ক্রেনের বুকে যে তীক্ষ্ণ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সতর্কধ্বনি বেজে ওঠে, নিজের বুকে তেমনি একটা নিঃশব্দ যন্ত্রণাধ্বনিতে সজাগ হয়ে উঠলাম আমি। নিজের অজান্তে শিউরে দু-পা পিছিয়ে গেলাম। গায়ে সেই বগল-হলদে শার্ট, পকেটে-কলারে-পেটে ক্রেন থেকে চুঁসিয়ে-পড়া বড় বড় কালো তেলের ফোঁটা। হ্যাচের কোমিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-ভরা তেল-কালি আর কনুইয়ে লাল মরচের গুঁড়ো। কপালে ফানেল থেকে বেরিয়ে আসা একরাশ কালো ভুসো। সব মিলে আমি সেই নোংরা, অস্পৃশ্য বাংলার ডকজীবি। আমার হাত থেকে চিঠি নেওয়ার সময় যদি বিজনের হাতের ঠেকাঠেকি হয়ে যায়। তার থেকে যদি কোনো জঘন্য ছোঁয়াচে রোগ ধরে বিজনের। চিঠিটা ফুলের টবের উপর রেখে দিলাম। টবের কালো মাটির উপর অসম্ভব তাজা, ধবধবে শাদা একটা ডবল পাপড়ির বেলফুল ফুটে আছে। বিজন আর আমি কোনো এক সজল সন্ধ্যেতে মৌলালীর রথের মেলায় কিনেছিলাম ঐ স্বপ্নের শাদা ফুলগাছ যাতে আজীবন শাদা ফুটে থাকে? হায়রে।

নিচে নামবার আগে আকাশটা দেখলাম তখনো কী নরম লাল আভায় ভরা। কত অজস্র রঙ-বেরঙের ঘুড়ি উড়ছে সে আকাশে। শিগ্‌গিরই বিশ্বকর্মা পুজো। নেমে এসে সেই চায়ের ঘরের সামনে একপলক দাঁড়ালাম। সেই ঘর যেখানে বিশ্বকর্মার আগুন জ্বলছে দিনরাত। প্রথামতোই রঘুয়া চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। চুমুক দিতে দিতে উপর থেকে চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম।

কি আক্কেল তোমার, ঐ কেলে নোংরা হাত থেকে চিঠিটা নিতে গেলে, বন্ধুও জোটে বটে বরাতে তোমার! রাত দিন ট্রামে-বাসে কোন নরকে ঘুরে বেড়ায় তার ঠিক আছে?

মৃদু বাধা দেবার ভঙ্গিতে বিজন বলল, ট্রামে-বাসে চাপে তো হয়েছেটা কি?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভেংচি কেটে উঠল আশা, হয়েছেটা কি, চুপ কর তুমি। ট্রামে-বাসে আবার ভদ্রলোক চাপে নাকি…।

রঘুয়া নিশ্চয়ই আজ চা-টায় চিনি দিতে ভুলে গেছে। রোজ খাই কোনোদিন এত তেতো তো লাগে না।

না না চা-কফি আর কিছু নয়। সকাল থেকে তিন-চার কাপ হয়ে গেছে। অন্য কিছু দাও।

ক্যাপ্টেনকে বললাম। আগেকার দিনে অন্য কিছু মানে শুধু মিনারাল-ওয়াটার নিতাম। খাঁটি নেপ্‌স্‌-এর ঝর্ণার জল বোতল বন্ধ করা। খেলে শরীর চাঙ্গা। খিদে হয় চনচনে। এ ছাড়া অন্য কিছু খাবার উপায় ছিল না তখন। একটা সিগারেটও নয়। কখন সেই চির যুবক বুড়ো মানুষটা এসে পড়েন—মানে সুব্রতবাবু। আমার হাতে লালজলের গেলাস দেখলেই ব্যাস, খতম। চিরতরে খতম। আর আমার মুখদর্শন করবেন না কখনো। সব সময় দরজায় কান পেতে থাকতে হত। কখন সেই বেঁটে, শক্ত-সমর্থ, খামখেয়ালি, সত্তর বছরের অতি সক্ষম যুবা-মানুষটি এসে পড়েন। এসে নির্ভয়ে দৃঢ়-হাতে টোকা দেবেন দরজায়। মালহীন সম্পূর্ণ খালি জাহাজের একেবারে খাড়া গ্যাংওয়ে দিয়ে সিধে উঠে এসেও একটু

হাঁপান না সুব্রতবাবু। ডেকে দাঁড়িয়ে প্রথম কাজের সমস্ত খুঁটি-নাটি জেনে তার পর ক্যাপ্টেনের দরজায় এসে দাঁড়ান। আজকাল এক এক সময় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বীয়ার খেতে খেতে মনে হয় এই বুঝি সেই পরিচিত টোকার শব্দ শুনতে পাব। দীর্ঘ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর মানুষটা কত শত জাহাজের গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠেছেন। প্রচণ্ড কাজ-পাগলা মানুষ, অথচ অত্যন্ত রসিক। গোমড়ামুখো মারকুটে বদরাগী সায়েরগুলোকে পর্যন্ত হাসিয়ে ছাড়তেন। জাহাজে যখন পুরোদমে বোঝাইয়ের কাজ চলছে, সেলিংয়ের সময় এগিয়ে আসছে, চারি দিকে হুটোপাটি আর ছুটোছুটি, স্পেস আর কিউবিকের অঙ্ক কষতে কষতে সুব্রতবাবু নিজে এবং চীফ দু জনেই হিমসিম খাচ্ছেন, তখন উনি ক্যাপ্টেনের বেজে-চলা রেডিওটার দিকে একপলক তাকিয়ে বলে উঠলেন, রেডিও শুনতে কখন সব থেকে ভালো লাগে জান ক্যাপ্টেন? তার পর নিজেই উত্তর করেন, যখন বন্ধ থাকে।

বড়মা বলতেন শুধু জাহাজের মাস্তুল ছাড়া কিছুই জানেন না উনি। খেলাধুলো, গানবাজনা ইত্যাদি দুনিয়ার কোনো-কিছু সম্বন্ধেই ওঁর আগ্রহ নেই। বই পড়তে ভালোবাসতেন ঠিক। তা কিন্তু সাহিত্যের খাতিরে মোটেই না। দাঁতের মাজন, মাথার তেল অথবা শাড়ি-সায়ার দোকানের উপর কেউ যদি একটা বেশ জ্ঞানগর্ভ জমাট নভেল লেখে, সুব্রতবাবু তা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবেন এবং তার নায়ক-নায়িকার মুখে সমাজকল্যাণধর্মী সংলাপগুলো লাল পেন্সিলে দাগিয়ে দেবেন। তার পর সে বইটি বাড়ির ছেলে-বুড়ো-মহিলা সবাইকে পড়াবার জন্যে চাকর দিয়ে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। লেখকের নাম অথবা নামকরা সাহিত্য ইত্যাদির মোটেই ধার ধারেন না সুব্রতবাবু। উনি চান লেখার মধ্যে থাকবে খুব স্পষ্ট বক্তব্য। কোনোরকম ঘোর প্যাঁচ, আভাস, ইঙ্গিত, কাব্যি-করা বা মনস্তত্ব—এ-সব উনি ঠিক সহ্য করতে পারেন না। কেউ যদি তর্ক তোলে মহাভারতেও অশ্লীলতা আছে অথচ আপনি…। উত্তরে সুব্রতবাবু বলেন, যাগ গে, ও-সব নিয়ে মাথা না ঘামালেই ভালো।

এখন 'সেই প্রেমতৃষা' পড়া হচ্ছে ওটা নিয়েই কথা হোক। মিটে গেল। ওঁর অফিস ঘরের বুক র‍্যাকে স্যার টমাস ম্যালরির একটি ধূসর বই ছিল। বইটার নামটা মনে পড়লে আজও হাসি পায়। The birth life and acts of King Aurther and his noble Knights of the round table। একটা বইয়ের এত বড় নাম যে সত্যিই সম্ভব তা আমার ধারণার বাইরে। কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, এই নাম না হয়ে যদি শুধু 'রাজা আর্থার' নাম হত, তা হলে কিন্তু সুব্রতবাবু বইটা কিনতেন না। উনি গ্র্যাণ্ড বা ফিরপো-তে লাঞ্চ খেতে যেমন ভালোবাসেন, আবার শ্যাওড়াফুলির রেল লাইনের ধারে বসে তেলেভাজা খেতেও সমান ভালোবাসেন। যেমন খামখেয়ালি তেমনি সরল মানুষটা। বড়মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওঁর মেয়ে অন্ত প্রাণ। ওঁর মেয়ে, অর্থাৎ, রুণার যদি সামান্য ঋতুর গোলমালে কষ্ট হয়, তা হলে উনি সেটা অফিস সুদ্ধু লোককে শুনিয়ে দেবেন, আজ মনটা ভালো নেই। পিরিয়ডের গোলমালে মেয়েটা ক-দিন বড় কষ্ট পাচ্ছে···কি যে করি···।

এ-সব লোকের উপর কিছুতেই বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না। আজও তাই মাঝে মাঝে জাহাজের ক্যাপ্টেনের কেবিনে বসে দরজায় সেই পরিচিত টোকার আশা করি। যদি কোনো উপায়ে সেই ছোট্ট সতেজ বুড়োমানুষটাকে ফিরে পাওয়া যেত। দূর ছাই, তার জন্যে যদি দু-পাঁচ দিন মদ নাই খেতাম, কুচ পরোয়া নেই। কিন্তু কুচ পরোয়া নেই বলে জাহাজ তো অনন্তকাল বসে থাকতে পারে না। ক্যাপ্টেন মার্সি বলল, উঃ, কতদিন হয়ে গেল বল তো তোমাদের এই পোড়া কলকাতায়। কাজ এক তিল এগুচ্ছে না, অথচ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট। জান চ্যাটার্জি, আমাদের মতো জলের পোকাদের বহুকাল ধরে সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোটা যেমন কষ্টের ব্যাপার, তেমনি আবার একই পোর্টে দিনের পর দিন শেকড় গেড়ে বসে থাকাও একেবারে অসহ্য। ভেতরে ভেতরে বাড়ি ফেরার জন্যে মনটা যে কেবলই দিন গোনে। প্রতিদিন সকালে

ঘুম থেকে উঠে ফরেড ডেকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি জাহাজের নাকটা দেশের দিকে কতটা এগুলো। ঘর-বাড়ি, ছেলে-মেয়ে সবই তো আছে আমাদের। আমরাও তো মানুষ।

পশ্চিম পাড়ের খিদিরপুর ডকে কতদিন থেকে লোডিং চলছে এই জাহাজটায়। পনেরো-শো টন কায়নাইট ওর্ বোঝাই করতে হবে। বাইরে ভাদ্রের অসহ্য পচা গরম। ডকে এসে সকাল আটটার মধ্যেই গেঞ্জি জামা ঘামে ভিজে গায়ে সেঁটে যায়। নানা-ভাবে তাড়া লাগাই। কতরকম লোভ দেখাই। প্রচণ্ড শব্দে বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো লোহার টবে পড়তে থাকে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে টব ভর্তি হয়ে যায়। সারস পাখির মতো লম্বা লম্বা ঘাড় বেঁকিয়ে ক্রেনগুলো টুপটাপ ঠোঁটে টব তুলে জাহাজের হ্যাচের ভেতর নিয়ে আসে। সশব্দে হুড়হুড় করে ঢেলে দেয় হ্যাচের মধ্যে। চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দ ব্যস্ততা আর হুটোপাটি। ওদিকে উপর থেকে দিনভর গলিত আগুন ঝরছে আকাশ ফাটিয়ে। সারা গা-হাত ঘামাচিতে ভরে গেছে। প্রায় গো-সাপের চামড়ার মতো খসখসে। তার উপর রোদে পুড়ে মুখ-হাত সব ভাজা ভাজা। এই স্পীডে কাজ চললে আর চারটে শিফটে সব ওর্ খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এ পোড়া দেশে তা কি হবার জো আছে। পরদিন সকালে ডকে গিয়েই দেখি সব একেবারে মড়ার মতো চুপ। কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই। চওড়া কি-লাইনের পুরোটাই ফাঁকা। ছিটে-ফোঁটা ওর্ও কোথাও পড়ে নেই। লোকজন নেই। চেঁচামেচি নেই। সব একেবারে টিমটিম করছে। জাহাজের বিরাট গতরে পা ঠেকিয়ে ক্রেনগুলো সব স্থির চিত্রের মতো সারি সারি দাঁড়িয়ে। মনে মনে ভাবলাম বলিহারি দৃশ্য! একটুবাদেই পুরো ব্যাপারটা জানা গেল। ওর্ যা কি-লাইনে ছিল সব মাঝরাতে উঠে গেছে। কিন্তু তার পর আর নতুন ওয়াগন দেওয়া হয় নি।

চারিদিকে চা-পানির ব্যবস্থার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ালাম। ব্যবস্থা হল ঠিকই, কিন্তু ওয়াগনের পাত্তা নেই। মাথার উপর

প্রচণ্ড রোদ অ্যাসিড ঢালছে। তেষ্টায় জিভ শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলতে পারছি না। বুঝলাম এখন দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ানো স্রেফ পাগলামি। জাহাজে উঠে সোজা তেতলায় ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে পা দিলে একতলা থেকে তিনতলা পুরোটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। পুরনো রক্তের মতো গাঢ় কালচে-লাল গোলাপ কাঠের পালিশে ঢাকা ক্যাপ্টেনের কেবিনের দেওয়াল। লেখার বিরাট টেবিলটা হালকা সবুজ ফেল্ট দিয়ে মোড়া। টেবিল আলোর শেডটাও সবুজ। এই অফিসঘরের সঙ্গেই লাগোয়া বসার ঘর। সেখানে মরচে রঙের সিল্ককার্ড ঢাকা বড় বড় গম্ভীর আরামী সোফা। কাঠের দেওয়ালে খুব হালকা রঙে আঁকা আফ্রিকার কোকো বাগানের কর্মরত মেয়েপুরুষের এক মুঠো জীবনের ছবি। পরিষ্কার একটা কাপড়ে স্টেনরিমুভার লাগিয়ে ক্যাপ্টেন ওদের বিয়ের ছবিটা খুব মন দিয়ে সাফ করছিল। প্রথমে ওকে কাজের ব্যাপারে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা সব বুঝিয়ে বললাম। এটাও জানিয়ে দিলাম যে এই অবস্থা চললে জাহাজের ঠিক সময়ে সেল্ করা প্রায় অসম্ভব। সব শুনে ক্যাপ্টেন মিটিমিটি হাসল। বলল, জাহাজ কমে যাচ্ছে, ব্যবসা পড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি কত কথা বলে তোমরা রোজ কাঁদুনি গাও। অথচ এই তো তোমার দেশের অবস্থা। কে জাহাজ পাঠাবে তোমাদের দেশে। জাহাজ এসে দাঁড়িয়ে রইল অথচ বোঝাই করার মালের তখনো দেখা নেই। মাল যদি বা এলো তাও প্রথম পেের্টের। প্রথম পোর্টের মাল নিচে রেখে, তার উপর শেষ পোর্টের মাল কখনোই লোড করা যায় না। যদি বা সব ঠিক ঠাক এলো, তখন জানা গেল মালের কোনো কাস্টমস্ ছাড়পত্র প্রস্তুত নেই। আবার যখন দেখা গেল ঠিকঠিক পোর্টের মাল আছে, কাগজপত্তরও সব ঠিক, তখন দেখা গেল যে নৌকায় মাল এসেছে সে নৌকাটাই কোথায় উধাও। কিংবা যে-সব ওয়াগনে ওর্ আছে সেই ওয়াগনগুলো প্লেস করাই হচ্ছে না। বড় উত্তম তোমার দেশ চ্যাটার্জি। কিন্তু এ বিষয়ে

আমার কতটা হাত আছে বললে না হয় চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমি বললাম, এ-ব্যাপারে তোমার আমার কারুরই কোনো হাত নেই ক্যাপ্টেন। আমি শুধু তোমাকে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম যাতে পরে তুমি আমায় 'কুঁড়ের বাদশা' বলে গাল না দাও।

ক্যাপ্টেন হাসতে হাসতে বলল, তোমার দেশে তো শুনেছি বাদশা রাজার ছড়াছড়ি। তবে তারা সব 'ঘুম', 'কুঁড়েমি', 'প্রমোদ' ইত্যাদি আরো কত রাজ্যের মহারাজা তা অবশ্য আমার সঠিক জানা নেই। বাদ দাও ওসব। তুমি তো সেই ঝর্ণার জল ছাড়া কিছু খাবে না। বোসো, এক বোতল আনতে বলি। দিব্যি ঠাণ্ডা ঘরের মাটিতে ছুঁচ-পড়া স্তব্ধতায় একলা বসে বসে আরামে চোখ বুজে আসছে। গায়ের জামাটা ইতিমধ্যেই অনেকটা শুকিয়ে এসেছে।

ঘুম তাড়াবার জন্যে ইটালির 'ন্যাশনালি' সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলাম। সিগারেটটা তেমন কিছু কড়া নয়। তবে তামাকের একটা অদ্ভুত কড়া গন্ধ আছে। খানিকটা চারমিনারের মতো। মুহূর্তের মধ্যে কেবিনটা বিদেশী তামাকের গন্ধে ভরে উঠল। বেশ চাঙ্গা হয়ে চোখ চেয়ে বসলাম। চোখের সামনেই ক্যাপ্টেনের সেই চিরাচরিত 'ওগো বর, ওগো বধূ'-মার্কা যুগলবন্দী ছবি। ক্যাপ্টেনের সে চুল আর এখন নেই। ফাঁকে ফাঁকে টাক দেখা যায়। পাতলা গোঁফটা তো কবেই উবে গেছে। ফিরে এলো ক্যাপ্টেন। বলল, অমন করে ছাখার কি আছে। আমি কি চিরকালই এইরকম বুড়োহাবড়া ছিলাম নাকি। বয়েসকালে আমিও একজন পাকা লেডি-কিলার ছিলাম তা জান।

হেসে বললাম, না, এ ছবিটা দেখে অন্তত তোমায় ঠিক কিলার অর্থাৎ ঘাতক ঘাতক মনে হচ্ছে না। তোমাদের দেশে তো আবার একেবারে ঘায়েল করতে না পারলে বিয়ে হয় না—তাই না। আবার একবার বিয়ে হয়ে গেলে তাকে সহজে ঘাড় থেকে

নামানোও যায় না। বিয়ে নিয়ে তোমাদের খামকা এত কড়া-কড়ি কেন বল তো। কী করে হয় তোমাদের বিয়ে, রেজিস্ট্রি করে ?

ক্যাপ্টেন বলল, জানতে যখন চাইলে তখন বলছি সব। শুধু একটু রোসো, একটা সিগারেট জ্বালিয়ে স্থির হয়ে বসি আমি।

ফের ক্যাপ্টেনের বিয়ের ছবিটার দিকে চোখ পড়ল। হঠাৎ দরজায় খুট খুট, একজন কাস্টমস অফিসার এসেছে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। ডেকের একটা খালাসি নাকি তার ক্যামেরা বিক্রি করে বলছে সেটা চুরি গেছে। অথচ ক্যামেরাটা কাস্টমস তালিকায় উল্লেখ করা ছিল। তা ছাড়া আরো কার কার ঘরে নাকি বেশ কয়েক বোতল মদ পাওয়া গেছে।

সেগুলোর কিছুই নাকি ওদের কাগজে ডিক্লেয়ার করা নেই. সুতরাং শুল্কবিভাগ ছাড়বে না। এইরকম কিছু কিছু পরিচিত ঝামেলার ফয়সালা করতে হয় ক্যাপ্টেনকে রোজই। আজও তাই। ফলে, আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্টেন মার্সি আমার হাত ধরে ফের সোফায় বসিয়ে বলল, ধ্যাৎ, তুমি বসো না। আমি নিচে গিয়ে ক্রু-গুলোর কাছে একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি। তার পর তোমাদের কাস্টমস্ অফিসারকে ঠাণ্ডা করে পাঁচ মিনিটে আমি ঘুরে আসছি।

হায়রে কপাল। কোথায় পাঁচ মিনিট। বসে আছি তো বসেই আছি। ফের চোখ পড়ল সেই বিয়ের ছবিটার দিকে। শুধু চোখ। মন নয়। ফ্রেমের মধ্যে ধীরে ধীরে বর-বউ বদলে গেল। কানে বাজল কলকাতার বিয়েবাড়ির সানাই। সেই পরিচিত সব দৃশ্য। বেলফুল বেনারসী, লুচিভাজা ঘিয়ের গন্ধ, কুকুর, কলাপাতা, ভিখারি। সান্তুদির বিয়ে। বহুদিন পর সারা দত্তবাড়ি রঙ হয়েছে। ফিকে গোলাপী রঙে বাড়িটা হাসছে। গেটের মাথায় পরীদের গায়ে মস্ত মস্ত টুটো আলো। আলো ফুল বেনারসীতে সারা বাড়ি ঝলমল করছে। অজস্র রঙিন প্রজাপতির মতো সানাইয়ের সুর

বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। কতকাল পরে সুন্দর করে দাড়িটা বানিয়েছি। নিজের অজান্তে বার বার তাই দাড়িতে হাত ঘসে ফেলছি। ধুতি পাঞ্জাবি তো পরাই হয় না। আজ আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে শরীর মন সব ফুর ফুর করছে। একটু আগেই স্নান-ঘরের আয়নায় নিজেকে ঘুরে ফিরে দেখছি। একটু পরিষ্কার-টরিষ্কার হলে আমাকেও বেমালুম কোনো বড়লোকের ভাগ্নে-জামাই বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। নিজের চোখেই তো বড়লোকের জামাইয়ের রূপ দেখলাম। মাত্র পাঁচ ফুটের কালো রোগাটে মানুষটা চোখে সেই আদ্দিকালের সরু সোনালী ফ্রেমের চশমা যা নাকি এখন আবার স্টাইল হয়েছে। কানে লম্বা লম্বা চুল, মাথার সামনে হালকা টাক। ইনিই হলেন আজকের সবচেয়ে সম্মানিত পুরুষ। পাঞ্জাবি পরলে অন্তত ওর চেয়ে আমায় বেশি মানায়। তবে আমার তো কোনো চালচুলো নেই, আর চার অঙ্কের চাকরিও নেই। তা ছাড়া যাকে বলে সমাজের উপরতলার সঙ্গে 'বিগ্ কানেকসান্স্' আমার যে তাও নেই।

পাঞ্জাবিতে হাড়ের বোতাম দিয়ে কি বড়লোক সাজা যায়। কাতারে কাতারে লোক আসছে। গাড়ি থেকে নামবার সময় কোঁচার খুঁট ধরে খুব সাবধানে ফর্সা ফর্সা পা-গুলো নামিয়ে দিচ্ছে রাস্তায়। এদের অধিকাংশই এই উত্তর কলকাতার সরু গলির অন্ধকার ঘরে বসে মুখে রাজা-উজির মারে আর ছোট এলাচ দেওয়া হালকা খিলির পান খায়। রাতদিন অন্ধকার ঘরে বসে থাকলে তো গা-হাত ফর্সা হবেই। নিজেদের পূর্বপুরুষের আমলের শ্বেতপাথরের কাকাতুয়ার মতো ওরা চুপটি করে অন্ধকারে বসে থাকে। এইসব ফালতু বড়লোকগুলো নিশ্চয়ই খুব পায়ের যত্ন নেয়। তা না হলে এমন সন্দেশমার্কা পা তৈরি হয় কি করে। আমার পা জুতো খুললেই চিত্তির। যেমন লম্বা তেমনি ধুমসো। শেডবাবু রবি মিত্তির আমায় ঠাট্টা করে বলত আমার জুতোয় নাকি একটা আস্ত গরুর চামড়া লাগে। চোখের সামনে কী সুন্দর সুন্দর সব বেনারসী

বউ-ঝিরা নামছে। দেখতে দেখতে মন খারাপ লাগে। ওখান থেকে সরে ভিড়ের মধ্যে সিগারেট বিলি শুরু করলাম। মিঃ বোস আর সরকার সায়েবের সঙ্গে বিগলিত হাসি বিনিময়ে ব্যস্ত স্বয়ং হরেনবাবু। আমায় ইশারায় সিগারেট দেখাবার ইঙ্গিত করলেন। সিগারেটের টিন খুলে ওঁদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। ওঁদের কিন্তু সিগারেট নেবার সময় নেই তখন। মিঃ বোস সবে জাপান সেরে এসেছেন। সরকার সায়েব বিলেত। একজন শরীর সারাতে গিয়েছিলেন। অন্যজন ছেলের সঙ্গে বাৎসরিক দেখা সারতে। বিলেত আর জাপানের সুখ দেবার বাঁট টেনে কে কতটা আরাম বেশি দুয়ে নিতে পেরেছেন, তার তুলনামূলক আলাপের ফাঁকে, একে অন্যের বুকে হাঁটু চাপবার প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিলেন। ঠাণ্ডার সময় হিটিং সিস্টেমটা বিলেতে এখনো নাকি অত্যন্ত সাবেকি ধাঁচের এবং বাজে। অথচ জাপানে বাড়ি দূরের কথা, প্রতিটি ট্যাক্সিতেও পায়ের কাছে ইলেকট্রিক হিটার ফিট করা। পা গরম রাখতে না পারলে জীবনে বেঁচে থেকে লাভ কি।

মুহূর্তের জন্যে আমার চোখের উপর ভেসে উঠল সেইসব প্রায়-উলঙ্গ সুন্দরী ললনাদের সুললিত সুগন্ধি পায়ের সারি, যাদের আমরা শুধু মার্কিন ছবির পর্দায় দেখতে অভ্যস্ত। আহা রে, তাদের পায়ে শীত লাগলে সত্যি বড় কষ্টের ঘটনা। স্টেট এক্সপ্রেসের ঢাকা খুলে আমি যথেষ্ট বিনীত ভঙ্গি ফোটাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে মনে বুঝছি যে সেটা ঠিক মুখে যেন ফুটছে না। তা না হলে এরা আমার হাত থেকে সিগারেট নিচ্ছে না কেন। হঠাৎ পেছন থেকে এক ঠেলা। ফিরে দেখি রুণা।

কী অপরূপ দেখতে লাগছে রুণাকে। রুপোলী বুটি দেওয়া একটা হালকা জাম রঙের বেনারসী পরেছে। ফর্সা কপালে জাম রঙেরই ঝুরো কুমকুমের লম্বা চোখের মতো টিপ। আর কী ঠাণ্ডা নরম গভীর ওর চোখ দুটো। সে চোখে চোখ পড়লে চোখ ফেরানো যায় না। দু পাশে কচি সবুজ শালবনের ফাঁক দিয়ে বীরভূমের লাল

মাটির পথ যেমন যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর, দেখে দেখে শেষ পাওয়া যায় না, চোখ ফেরানোও যায় না, রুণার চোখ তেমনি অনিমেষ চেয়ে থাকার চোখ। হালকা লালচে চুলের নরম স্পঞ্জ কেকের মতো খোঁপায় যুঁইয়ের শাদা গড়ে মালা দিয়ে আইসিং করা। খানিকক্ষণ আমি স্রেফ একটি ল্যাবাকান্ত ল্যাম্পপোস্ট হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে-ছিলাম। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। রুণাই প্রথম কথা বলল, হাঁ করে দেখছ কি। লজ্জা করে না কাজের বাড়িতে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে? পরিবেশনের জন্যে দাদা উপরে লোক খুঁজছে। তুমি শিগ্‌গির ছাদে যাও।

আমি ততক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছি। বললাম, তার আগে একটা আস্ত অক্সিজেন সিলিণ্ডার জোগাড় করতে হবে আমায়। ঐ বিশাল বিশাল বালতিতে ডাল আর মাছের কালিয়া নিয়ে দশবার চারতলা-একতলা করলে দম ফুরিয়ে আমার বুকে টান ধরবে।

গলার স্বরটা নামিয়ে রুণা বলল, তোমার বুকেও টান ধরে তা হলে।

কথা শেষ করেই রুণা পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি পথ আগলে বললাম, উপরের ছাদটা তো পুরো মহিলামহল। ওখানে আমি মোটেই কিন্তু সুবিধে করতে পারব না। অত মেয়ের দঙ্গলে আমার কী রকম নার্ভাস লাগে। হাত-পা কেঁপে কার পাতে ঢালতে গায়ে ঢেলে দেব, তখন মরি আর কি। প্লিজ, তুমি বাঁচাও আমায়। সুনীলদাকে বলে দিও নিচে যারা আসছে তাদের রিসিভ করার কেউ নেই।

ওসব কোনো প্লিজ-টি্লজ চলবে না।

আমায় মাঝপথে থামিয়ে রুণা বললে, আমি দাদাকে কিছু বলতে পারব না। সরো আমাকে যেতে দাও, কাজ নেই বুঝি আমার।

আমি একটু সরতেই রুণা হরিণ পায়ে মিলিয়ে গেল। ওর খোঁপার যুঁইফুলের সুবাতাস ছড়িয়ে গেল আমার নাকে-মুখে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম ক্যাপ্টেন মার্সি ফিরে এসে একটা প্রকাণ্ড

সিন্‌জানোর বোতল থেকে রক্তাভ পানীয় ঢেলে গেলাস ভর্তি করছে। একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। মার্সি বলল, তোমায় এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত। আমরা কি যেন বলছিলাম। হ্যাঁ, আমাদের দেশের বিয়ে সম্বন্ধে তুমি জিগেস করছিলে। শোনো তা হলে। আগেকার দিনে আমার দেশে চার্চ আর সিভিল কোর্টে মোটেই বনিবনা ছিল না। তখন লোকে প্রথম সিভিল কোর্টে বিয়ে রেজিস্ট্রি করাতো। তার পর আবার ধর্মকর্ম বজায় রাখবার জন্যে ফের যেত চার্চে বিয়ে করতে। মনে হয় ১৯২৯ সালে সম্ভবত মুসোলিনীর সময়ে চার্চের সঙ্গে সিভিল কোর্টের একটা মীমাংসা বা চুক্তি হয়েছিল। তাতে স্থির হল গির্জায় বিয়ে হলেই চলবে। কোর্টে যাওয়ার আর দরকার নেই। তোমরা জান নিশ্চয়ই যে মুসোলিনী নিজে আবার ওসব ধর্ম-টর্মের তেমন ধার ধারতো না। কিন্তু আমাদের সারা দেশ ধর্মের নামে ডগমগ। জনসাধারণের অধিকাংশই ধর্মপাগল। মুসোলিনী জনসাধারণের এই ধর্মের জন্যে দুর্বলতার সুযোগটা নিয়ে দল ভারি করার চেষ্টা করল। নিজে ধর্ম না মানলেও অন্তত একটা লোক-দেখানো ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে মুসোলিনী যাত্রা শুরু করল। আগে ছিল কোর্টে গিয়ে সিভিল ম্যারেজ। এবার হল চার্চে গিয়ে সামাজিক বিয়ে। এটা কিন্তু মুসোলিনীর জনপ্রিয়তা লাভ করার ফন্দি ছাড়া কিছু না। সেই থেকে এতাবৎকাল এইভাবেই চলে আসছে। লোকে সোজা চার্চেই যায় বিয়ে করতে, কোর্টে নয়।

ক্যাপ্টেন থামতে আমি জিগেস করলাম, তোমরা ইটালিয়ানরা ক্যাথলিক বলেই কি সোনার হারের সঙ্গে ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখো গলায়? দুনিয়ার সব ক্যাথলিকরা এইরকম গলায় হার পরে বুঝি?

ক্যাপ্টেন বলল, দুনিয়ার ক্যাথলিকদের খবর বলতে পারব না, তবে আমরা ইটালিয়ানরা সত্যিই ওটা পরি।

কথাটা ক্যাপ্টেন শুরু করেছিল দিব্যি হাসতে হাসতে। কিন্তু

এই জায়গায় এসে একটু থেমে, মুখটা গম্ভীর করে ক্যাপ্টেন বলল, ওটা শুধু আমাদের ধর্ম নয়। ওটা আমাদের সংস্কারও বটে। সব সময় মনে হয় ওটা আমাদের রক্ষা কবচ…।

আমি গলায় তখনো ঠাট্টার সুর বজায় রেখে বললাম, তার মানে বলতে চাও ওটা খুলে ফেলে দিলে তোমার রক্ষা পাবার কোনো আশা নেই ?

ক্যাপ্টেন একটা লাজুক লাজুক ধমক দিয়ে বলল, ছিঃ, তুমি খুব পাজি লোক দেখছি। তোমাদের মতো ধর্মান্ধ দেশে এত নাস্তিক কী করে হলে। এইসব বিশ্বাস আর সেন্টিমেণ্টের জিনিস নিয়ে খবরদার ইয়ারকি মারবে না। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে ঐ গলার ক্রুশটা আমাদের রক্ষা-কবচ। জীবনভর জলে জলে ঘুরে বেড়াই। সব সময়ই সমুদ্র ঘিরে আছে আমাদের। এই সমুদ্রের উপর কত রকম ঝড়-ঝাপটা আপদ-বিপদের হাত থেকে ঐ ছোট্ট ক্রুশটা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। গলায় ঐ সোনার টুকরোটা না থাকলে, তোমাদের এই হাড়-জ্বালানো গঙ্গা পেরিয়ে কোনোদিন হয়তো দেশে ফিরতেই পারতাম না।

আমি হাসতে হাসতেই জুড়ে দিলাম, কিংবা হয়তো ওটা না থাকলে, পুরো জাহাজ মাল বোঝাই করে আরো অনেক তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেতে পারতে। ওটা খুলে রেখে কখনো তো ছাখনি তুমি কি হয় না হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসেবে আমাদের গলায় পৈতে পরতে হয়। আমি পরেওছি অন্তত ১০-১১ বছর। তার পর কবে যে ওটা গলা থেকে নেমে গেছে মনেও পড়ে না। কিন্তু তাতে যে আমি মারা যাই নি তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

ক্যাপ্টেন বলল, জানি না তোমার মাথায় কি আছে। আমি কিন্তু জীবনে এই সোনার হার খুলতে পারব না। এ বস্তুটি আমার বাবার ছিল। আমার আছে। আমার ছেলে আবার আরো বড়, আরো লম্বা হার বানিয়ে নিয়েছে। আরো শুনতে চাও—

ক্যাপ্টেনের বলার ভঙ্গিতে আমি প্রায় হো হো করে হেসে

ফেললাম। বললাম, যাক তোমার হারের ইতিকথা। এবার ফের তোমাদের বিয়ের কথা শুরু কর।

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন বললে, কিন্তু তাও তোমার ভালো লাগবে না। কারণ সেখানেও পরার ব্যাপারটা আসল। অর্থাৎ কিনা বিয়ের আংটি। আমার আংটিতে বউয়ের নাম এবং বিয়ের তারিখ। বউয়ের আংটিতে আমার নাম এবং বিয়ের তারিখ। ব্যাপারটা বেশ সুন্দর তাই না? তোমরা বিয়ের সময় আংটি পরো না?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, যারা সায়েবদের পোঁ-ধরা তারা অনেকেই আংটি পরে। তারা বাই-ডে পার্টিতে বাতি-বসানো কেক কাটে আবার বেরুবার সময় বাচ্চারা কেউ হেঁচে ফেললে ফিরে এসে বাচ্চাকে কান মলে থাপ্পড় কসায়। যাক গে এদের কথা বাদ দাও। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় এরা এতই অল্প যে এদের নিয়ে মাথা ঘামানো বোকামি। দেশ জেগে উঠলে ওরা আপনিই সরে যাবে। এবার আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। চিন্তা এবং বুদ্ধির জগতে এত বৈজ্ঞানিক উন্নতি হল ইয়োরোপের অথচ তোমরা ইটালিয়ানরা ক্যাথলিক ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামিগুলো আঁকড়ে এখনো কেন বসে আছ জানি না। ফিয়েট ফায়ারি আলফা-রোমেও গাড়ির রোজ নতুন নতুন মডেল বানিয়ে সারা দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছ তোমরা। কিন্তু দিনের পর দিন, যে বউয়ের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, যার চীৎকারে বাড়ি ফিরে কানে তুলো দিতে হয় তোমাদের সেই বউয়ের বস্তাপচা মডেলটা শুধু শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে আগলে থাকার কোনো মানে আছে। অর্থাৎ আমি বলছি ডিভোর্সের কথা। ওটা কি তোমরা বুদ্ধি দিয়েও স্বীকার করো না?

ক্যাপ্টেন খুব একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফোটাল। যেন আমার প্রশ্নটার কোনো গুরুত্বই নেই। আর তেমনি হালকা গলায় উত্তরও দিল, ডিভোর্স ব্যাপারটার সত্যিই কি খুব একটা দরকার আছে? ডিভোর্স না, করেও তো অনেকে অনেক কিছু করতে

পারে—তাই না? আমার ব্যক্তিগত ধারণা ডিভোর্সে জীবনের কোনো সমস্যার ঠিক কোনো সমাধান হয় না। গুচ্ছের বাপের ঠিক নেই, ছেলে নিয়ে সমাজের সমস্যা আরো বাড়ে বই কমে না। অথচ ডিভোর্স না করেও তুমি যার সঙ্গে যা খুশি করে বেড়ালে, এটুকু নিশ্চিত যে, বাড়তি ছেলের বাপ ঠিক করার জন্যে সমাজকে অন্তত ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। তাতে ঘরোয়া শান্তিরও খুব একটা ঘাটতি হবে না। কারণ স্বামী-স্ত্রী দু জনেরই যা খুশি করার সমান স্বাধীনতা এবং অধিকার থাকবে। তবে একটা কথা তোমায় এই মুহূর্তে না বললে নিছক ভণ্ডামি করা হবে। কথাটা হল আমরা যতই ধর্মের বড়াই করি না কেন, ডিভোর্স এখন আমাদের দেশেও একটু-আধটু চালু হয়ে গেছে। যদিও শুধু বড়লোকদের মধ্যেই সেটা এখনো সীমাবদ্ধ। আইনকে টাকার জোরে আরো পাঁচটা শাখা-আইন দিয়ে হাত করে আমাদের দেশের বড়মানুষগুলো দিব্যি ডিভোর্স চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গরীবদের বেলায় চু চু। অবশ্য ও ব্যাপারটা অধিকাংশ গরীব গেরস্তরা ঠিক চায়ও না…।

কথায় কথায় রাত বেড়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে সারা শরীরটা জুড়িয়ে সরপড়া দুধের মতো জমাট। বাহিরেটাও এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সন্ধ্যের কৃষ্ণচূড়া-ঝরানো হাওয়া উঠেছে কলকাতায়। পোর্টহোলের চৌকো কাঁচের ফ্রেমের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ে সিল্কের নীল মেয়েলী রুমালের মতো ছোট্ট আকাশ তারার বুটিতে ভরা। ডকের সাড়ে সাতটার মিল আওয়ার পেরিয়ে গেছে বহুক্ষণ। বাইরে এখন ফের পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে। ভেতরের ঠাণ্ডা ঘরে শব্দেরও প্রবেশ নিষেধ। কাঁচের বাইরে মূক ক্রেনগুলো সারসের লম্বা গলা নিয়ে নীরব যুগের চলচ্চিত্রের মতো ওঠা-নামা করছে। আমার এই মুহূর্তে ডেকে যাওয়া দরকার। কাজের সময় ক্যাপ্টেনের ঠাণ্ডা ঘরে বসে আড্ডা দেওয়া আমার নিয়মবিরুদ্ধ এবং অন্যায় মনে হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে আজ কী যেন কথায় পেয়েছে। থামছে না কিছুতে। ওকে থামিয়ে উঠে

পড়লে হয়তো আঘাত পাবে। রেগে যাবে। অথচ মা পিতাকে রাগিয়ে তার খুরের তলায় গাল পেতে বসা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অগত্যাঃ নানা প্রসঙ্গ ঘুরতে ঘুরতে আমাদের আলোচনা যুদ্ধের চৌমাথায় বাঁক নিল। আর তখনই ক্যাপ্টেন মার্সির মুখ থেকে সেই অদ্ভুত বক্তব্যটা বেরিয়ে এল যা আমাকে পিলে পর্যন্ত চমকে দিয়েছিল। ভোলা যায় না সে কথাগুলো।

একটু থেমে থেমে মার্সি বলেছিল, জান, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা কত প্রাণ দিয়ে, কত রক্ত দিয়ে, কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করে তবে যুদ্ধ জিতল। আর আমরা হেরে গেলাম। যুদ্ধের মার খেয়ে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল সারা দেশের। কিন্তু ছাখ, এমনই ভাগ্যের পরিহাস, জেতার পরেই বেচারা বৃটিশদের প্রকৃত পরাজয় শুরু হল। ধীরে ধীরে তুনিয়ার সমস্ত কালোনিগুলো হাতছাড়া হয়ে ফকির হয়ে গেল জাতটা। চিরকাল মস্ত জমিদারির টাকায় আগুনের ধারে বসে রাজার হালে পাইপ টেনেছে ওরা। আর আজ সে রাজা কমনমার্কেটেও ঠাঁই পাচ্ছে না। বার বার ডিভ্যালুয়েশানে নাজেহাল দেশের আজ চরম তুর্দিন। আজ শুধু চরম হার ওদের। যুদ্ধ জেতার পর একটিও গুলি খরচ না করে, কিংবা একটিও গুলি না খেয়ে, একটা সমগ্র জাত কী ভাবে ধীরে ধীরে হেরো হয়ে যায় তার প্রমাণ আজকের ব্রিটিশরা। অথচ আমরা ছাখ আজ ফের উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি নিজেরই জোরে, পরের ধনে পোদ্দারি করে নয়। যুদ্ধে হার মেনেছি—তাও নিজের সর্বস্ব দিয়ে···

গলার স্বর বদলে গেল। চোখের সামনে ক্যাপ্টেন নেই, জাহাজ নেই।

বেশ বাবা বেশ। আমি মেনে নিলাম আমি হেরেছি। আচ্ছা, বিনা যুদ্ধে যে হার স্বীকার করে তাকে কি সব সময় কাপুরুষ বলা যায় বিমলদা? ক্যাপ্টেন মার্সির বক্তব্যের ভিন্ন কোণ থেকে রুপার বক্তব্যের শুরু। কী উত্তর দেব। তু জনের বক্তব্যের বিষয়টা যদিও যুদ্ধ তবু তু জনের প্রশ্নের আলোছায়ায় কত তফাত।

সেই দত্তবাড়ির বিয়ে। সান্তুদির বিয়ের দিনটি। গাছ সেজেছে। বাড়ি সেজেছে। মেয়েদের সাজে গন্ধে হাসিতে কী দারুণ ঝলমলে একটা আস্ত রাত ছিল আমার চোখের উপর। অথচ একটু পরেই সব যেন উলটো-পালটা হয়ে গেল। অন্য একটা অনুভূতির তীক্ষ্ণ মধুর স্বাদে আমার গলা দিয়ে প্রথম যেন নির্জলা ভ্যাটের ডাবল পেগ নেমে যাচ্ছে। ছাদে পর পর প্রায় দু-তিনটে ব্যাচ পরিবেশন করলাম। ঘেমে চান করে গেছি। পাঞ্জাবিটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। ছেলেগুলো প্রথম দুটো ব্যাচ খুব উৎসাহ দেখিয়েছে। হাতা বালতি নেড়ে ছুটোছুটি করেছে। তার পর যেমন হয়। সবাই এদিক সেদিক গা-ঢাকা মেরেছে। এখানে ওখানে হুসহাস সিগারেট ফুঁকছে কিংবা এদিক সেদিক চুরি করে মেয়ে দেখার চেষ্টা। এতে মনে করার কিছু নেই। আমাদেরও একদিন ঐ বয়েস ছিল। আজ বয়েসটা হারিয়ে গেলেও মন এখনো কারুর কারুর চোখে হারানো রঙ খুঁজে পেলে থমকে দাঁড়ায়। তা না হলে বার বার রুণার দিকে এত স্পষ্ট করে তাকাতে পারতাম না। বয়েস হলে চোখের সাহস নিশ্চয়ই খুব বেড়ে যায়। আর চুরি করে তাকাবার দরকার নেই। একেবারে স্পষ্ট চোখে চোখ রাখা। ছাদে মেয়েদের দ্যাখাশোনার ভার রুণার উপর। দু পাশে জলপাতা মুন-নেবুর সরু আলপথে দু জনে প্রায়ই মুখোমুখি হচ্ছি। জায়গা এত কম যে দু জনে দু জনকে পেরুবার সময় প্রায় গায়ে গা ঠেকে যায়। আর আমার হাতে বড় বড় থালা বালতি। কাজেই আমার সাতখুন মাফ। রুণা বলল, ইস্ তুমি কি সাংঘাতিক ঘেমেছ বিমলুদা। লোকে নার্ভাস হলেই এমনি ঘামতে সুরু করে।

চিবুকটা সরু করে, একটু চাপা হাসি ছিটিয়ে রুণা আমার দিকে তাকাল। আরো একটা ব্যাচ শেষ হল। এবার পাতা তোলার কাজ চলছে। নতুন পাতা না পড়া পর্যন্ত এখন বেশ খানিকক্ষণের ছুটি। আলসের ধারে সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়ালাম। ত্রিপলের

ফাঁক দিয়ে বেশ ফুরফুরে হাওয়া আসছে। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ থাকায় হাওয়াটা ঠিক খুলছে না। মাঝে মাঝে এক এক ঝলক আসছে আবার গুমোট। রুণার কথার উত্তরে বললাম, কি জানি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে তুমি কাছাকাছি আছ বলেই বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ছি।

রুণার পক্ষে যা বলা খুবই স্বাভাবিক রুণা তাই বলল, কেন আমি কি বাঘ না ভালুক ?

আমি বললাম, না, এটা ঠিক বাঘভালুকের ব্যাপার নয়। ধর, ভিড়ের বাস থেকে নামবার সময় যে মেয়েটার বুকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে, হঠাৎ পরের দিন বোনের শ্বশুরবাড়িতে একেবারে তার মুখোমুখি। তখন যে রকম অবস্থা হয় আর কি—।

মুহূর্তের জন্যে রুণার মুখটা যেন শরতের রক্তাভ নীল সন্ধ্যে হয়ে গেল। মাটির দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, তুমি এখানেই দাঁড়াও, পালিও না। আমি এখুনি আসছি।

এক ছুটে হারিয়ে গেল রুণা। ছন্দের মতো ওর শরীরের দোলাটা ভারি বেনারসী জরীর কাঁপন হয়ে চোখে লেগে রইল। কলকাতার আকাশটা বড় দূরের। রুণার মতোই দূরের। আমার নাগালের বাইরে। এ-আকাশের মুখোমুখি হলে কিছুই করার নেই আমার। পাঁচ মিনিটেই রুণা ফিরে এল। হাতে একটা নতুন পাটভাঙা ডোরাকাটা তোয়ালে। বলল, ধরো, ভালো করে হাত-মুখ মোছ দিকি।

আমি বললাম, আমাকে খুব বিচ্ছিরি ভাখাচ্ছে তাই না ?

রুণা বলল, মেয়েদের মুখ থেকে প্রশংসা শুনতে খুব ভালো লাগে, না ? বললাম, আগে কোনোদিন কোনো মেয়ের মুখে তো শুনি নি তাই জানব কি করে ভালো না খারাপ।

আমার কথায় রুণার চোখটা হঠাৎ কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো কেঁপে উঠল। রুণা বলল, ঘামলে তোমায় দারুণ দেখায়। রুণার চোখের দিকে তাকালাম, সে চোখের ভেতরে দু দিকে অজস্র ছায়ার

গাছ সরিয়ে হাঁটছি। কী গভীর সে ছায়া। মনে হয় বাইরের প্রচণ্ড রোদ থেকে কে যেন আমায় ভারি খসখস ফেলা কোনো ঠাণ্ডা পাথরের ঘরে ডেকে আনল। বললাম, এত ফর্সা তোয়ালেতে মুখের তেলকালি মুছতে আমার একটুও ভালো লাগে না। বড্ড গা করকর করে। আঁচলে মুখ মুছতে কিন্তু আমার দারুণ ভালো লাগে। ছোটবেলায় যখন তখন এটা সেটা খেয়ে মায়ের কাছে এসে নিঃশব্দে আঁচলে মুখ মুছে পালিয়ে যেতাম। মুখে বকলেও আমি ঠিকই জানতাম যে মা মোটেই রেগে যান নি। সেইজন্যে আমার একটুও ভয় করত না। আঁচলে মুখ মোছা অভ্যেসটা আমার হয়তো সেই থেকে রয়ে গেছে।

ঝরা রজনীগন্ধার মতো রুণা একটু ম্লান হাসল। বলল, বদ অভ্যাস। তবু মুখ ফুটে যখন চেয়েই বসলে তখন নাও—সেই সুন্দর হালকা জামরঙা বেনারসীর রূপালি আঁচলটা আমার মুখের কাছে তুলে ধরল। কী অসম্ভব পাগলামি শুরু করেছ আজ রুণা। নাকি আমাকে আনাড়ি পেয়ে একটু তামাশা করার চেষ্টা করছ। চট করে মাথাটা ঘুরে গেল। বললাম, আমায় নিয়ে যদি ঠাট্টা করতে চাও তা তুমি স্বচ্ছন্দে করতে পার রুণা। কিন্তু এটুকু জেনে রাখ যে তোমার শাড়িটা দামী বেনারসী তা গরীব হলেও আমি জানি। আমার মা কোনোদিন বেনারসী পরেন নি, তাই তাঁর আঁচলে মুখ মোছার সাহস পেতাম। কিন্তু আমার ঘাড়ে এখনো দুটো মাথা গজায় নি যে তোমার বেনারসীতে মুখ মোছার সাহস পাব। হারিয়ে গেল রুণার চোখের সেই নরম গভীর ছায়া। নির্বিকার কাঠিন্যে ঠোঁট বেঁকে গেল। সরু নির্মম কণ্ঠে বলল, তুমি ভুল করলে বিমলদা। তোমার ঘাড়ে চারটে মাথা গজালেও কোনোদিন সাহস বাড়বে না তোমার। সাহস জিনিসটা হাতি-ঘোড়া কিছু নয়। ওটা জামা-কাপড় পরার মতো। যে জানে না সে কোনোদিনই পারে না। আমি এবার নিচে যাব। তোয়ালেটা রাখতে চাও তো রাখ। তুমি দামী বেনারসীটাই দেখলে। অথচ

কত দামী জিনিস যে তোমায় দেবার ছিল তা বুঝলে না—আমি সত্যিই এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ ভেতরে একটা বাজ-পড়া গাছ যেন মূক হয়ে গেল। না জেনে একজনকে আঘাত দেবার লজ্জায় নিজেই যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলাম। কে যেন বেশি চুন দেওয়া পান দিয়েছিল, কখন জিভ পুড়ে গেছে। বললাম, তুমি আমায় কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে রুণা ?

রুণা হাসল। সেই মেঘ-ভাঙা আলোর মতো হাসি। জানি এ আলোয় অনেক ক্ষমা থাকে। গঙ্গার উপরে আলো আমি অনেক অনেকদিন দেখেছি। তাই চিনি তাকে নির্ভুলভাবে। রুণা বলল, মানুষকে খামোকা কষ্ট দিতে তোমার খুব ভালো লাগে, না বিমলুদা? খুব হয়েছে। এবার আবার তৈরি হও। নতুন পাতা পড়ে গেছে সে খেয়াল আছে ?

আমি বললাম, তোমার খোঁপার মালাটা ভারি সুন্দর। ওটা তো সামান্য ফুল, দিয়ে দাও না আমায়।

রুণা ঠোঁট টিপে একটু হাসল। বলল, বারে, আমার খোঁপাটা নেড়া হয়ে যাবে না বুঝি? আবদার শুনে বাঁচি না। জাহাজী বাবুর আবার অত ফুলের শখ কেন ?

বললাম, জাহাজী বাবুরা কি শুধু মরলেই ফুল পায়, তার আগে তাদের ফুল পেতে নেই বুঝি ?

রুণা মুখ গম্ভীর করে চলে যেতে যেতে বললে, ফের শুরু করলে তো। বেশ, আমি আর থাকব না ছাদে। সত্যিই তার পর আর রুণাকে দেখলাম না। রুণা আর ছাদে ফিরে এলো না। ছাদের কোণের দিকে ঘেরা জায়গাটায় সারি সারি থালা-বালতি ইত্যাদির ফাঁকে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ছোট্ট একটা মোড়ার উপর সুনীলদা বসেছিলেন। আমি ভেতরে যেতেই গরম ফ্রাইয়ের চ্যাঙারিটা ঠেলে দিয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে বিমল, এবার এসো দিকি একটু ধীরে সুস্থে সব টেস্ট করা যাক। কাজের ব্যাপারটা এবার ছোঁড়াগুলোকে ধরিয়ে দাও। আমি বললাম, তার আর দরকার

নেই সুনীলদা। নিচে থেকে টাপু এইমাত্র খবর দিয়ে গেল যে বাইরের মেয়েদের ব্যাচ সব শেষ। অর্থাৎ ছাদে আর নতুন ব্যাচ পড়ছে না। সুতরাং সচ্ছন্দে আমরা ভালো হাতের কাজে লাগতে পারি।

খিদেও পেয়েছিল খুব। যারা বলে পরিবেশন করলে বা রান্নার কাছে থাকলে খিদে চলে যায়, আমি ঠিক সে-জাতীয় ঠুনকো খিদের লোক নই। সুনীলদাও সেটা বেশ ভালোই জানতেন। বেশ কিছু লুচি, মালাইকারি, ফ্রাই, সন্দেশ আমায় তুলে দিলেন। সব শেষ করে তবে খানিকটা ধাতস্থ হলাম। সুনীলদা নিজে বরাবরই অল্প খাওয়ার মানুষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, ইস, সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কাল সকালে ফের ডক, মনে আছে তো? সুনীলদার সঙ্গে আমিও নিচে নেমে সোজা স্নানের ঘরে চলে এলাম। খুব ভালো করে স্নান সেরে পাজামা আর ফর্সা গেঞ্জি পরে ঘরে ঢুকলাম। বাইরে থেকে তখন বাসরের হুল্লোড় ভেসে আসছে। আমার ঘরটা একটেরে বলে খানিকটা নির্জন। অন্ধকার। মাথার দিকের জানলাটা খোলা। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। হয়তো কাছেই কোথাও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এলোমেলো হাওয়ায় বৃষ্টির গন্ধ। জানলার বাইরে মাস্টারদের একতলার ঘরটায় এখনো আলো জ্বলছে। তারই খানিক আলো মোটা গরাদের ছায়া-সমেত রাস্তার উপর শুয়ে। অন্ধকার বিছানার কাছে চোখ পড়তে মনে হল কি যেন নড়ছে। চোখের ভুল নাকি! ঝট করে আলোর সুইচে হাত দিতে গিয়েই একটা চাপা কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'এই'।

প্রায় ফিস ফিস করে রুণা বলল, চুপ, চেঁচিও না। আমি তোমার সোনাদানা চুরি করতে আসি নি। মালাটা চেয়েছিলে, তাই ভাবলাম ওটা তোমার বালিশের কাছে রেখে, লুকিয়ে পালিয়ে যাব। বোকার মতো ধরা পড়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মানুষের সত্যি এমন সময় আসে যখন কিছুতেই নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস হয় না। একটা কালচে সবুজ তাঁতের শাড়ি পরেছে রুণা। পাড়টা পোড়া ইঁট রঙের। বাইরের দালানে আলো না থাকলে শাড়িটা

কালোই মনে হত। মুখের সাজ ধুয়ে ফেলেছে। কপালে চুলের গোড়ায় জলের ফোঁটা। গলায় সেই সোনার সরু চেন হারটা চিক্‌চিক করছে। আলগা খোঁপাটা ঘাড়ের উপর নরম পায়রার মতো ঘুমিয়ে। কাছে গিয়ে ওকে আস্তে বুকের কাছে টেনে নিলাম। একবারও মনে পড়ল না আমি কে আর দত্তবাড়ির মেয়েই বা কে। একটুও বাধা দিল না রুণা। নিজেকে যেন নিঃশেষ করে দেবার জন্যে ও তৈরি ছিল। আমার বুকের উষ্ণতার মধ্যে ওর সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে। ঘুমন্ত পায়রার মতো নরম খোঁপাটা আমার বুকের উপর কাঁপছে। ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটের কাছে আমার ঠোঁট। নীরবে পদ্মের পাপড়ি খুলে গেল। দু জনে দু জনকে এত জোরে জড়িয়ে ধরেছি যে দাঁড়াবার শক্তি নেই। ওর শরীরের মিষ্টি গন্ধে, জানুর গভীর উষ্ণ স্পর্শে সব বোধ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। দু জনে যেন প্রাণপণে দু জনের শরীরে মিশে যেতে চাই। কোথাও একতিল ফাঁক নেই। আলো গলবারও জায়গা নেই। রুণা ফিস ফিস করে বললে, ছাড়ো, কেউ এসে পড়লে?

বললাম, ছাড়তে পারছি না তোমায়। ছেড়ে দিলে যদি আর কোনোদিন এমন করে না পাই।

রুণা তেমনি ঝরাপাতা ওড়া শব্দের মতো বললে, আমাকে তো বিশ্রী দেখতে। আমি নিজে না এলে কোনোদিন তুমি ভালোবাসতে আমায়?

বললাম, চাঁদে হাত দেওয়ার ভাগ্য নিয়ে যে আমি জন্মাই নি তা তো তুমি জান।

অন্ধকার-ভরা কণ্ঠস্বর নিয়ে রুণা বললে, আমিই বুঝি তোমায় চাইবার যোগ্য? বাবার টাকা ছাড়া আর কি আছে বলো আমার? তোমার বউ হবার মতো শরীর কোথায় আমার। আজ ভুলে তোমায় চেয়ে ফেলেছি। তোমাকে চাওয়া মানে তোমার সব ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া। জাহাজের কাজে কত উন্নতি করবে তুমি। কত নাম আর টাকা হবে তোমার, তাই না?

আমি স্থির গলায় বললাম, আমার ভবিষ্যৎ তুমি। তোমায় পেলে আমি সব কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভবিষ্যৎ তৈরি করে নিতে পারি।

রুণা বলল, মেনে নিলাম হেরে গেছি। আমি তোমারই রইলাম। কিন্তু তুমি কথা দাও, কাউকে ভুলেও জানাবে না আমার কথা।

বেশ. কথা দিলাম। কিন্তু তুমি চিরকাল কাছে থাকবে? রুণা একটু ম্লান হাসল। ওর হাতির দাঁতের মতো কপালের মসৃণ অভিজাত চামড়ায় বাইরের আলো। বলল, বললাম তো হেরে গেছি। এর পরেও কি কথা চাও তুমি? আচ্ছা, এবার বল তো আমার সেই কথাটার উত্তর। যুদ্ধ না করে যে হার মেনে নেয়, তাকে তোমরা 'কাপুরুষ' বল. কিন্তু সে যদি মেয়ে হয়, তা হলে?

আলগা করে রুণার কপালে ঠোঁট বুলিয়ে বললাম, তখন তাকে বলা হয় শুধু রুণা কিংবা রুণা সোনা। হাতে জোরসে একটা চিমটি কেটে, রুণা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে পালিয়ে গেল। বালিশের কাছে যুঁই ফুলের গন্ধে ঘুম এল না ভোর রাত অবধি। মনে হচ্ছে রুণার চুলের গন্ধ পাচ্ছি। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সামান্য ছাট আসছে জলের। তবু জানলাটা বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। জোলো হাওয়ায় মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি। যেন মাল্লাটা এখুনি উড়ে যাবে··· গন্ধ উড়ে যাবে···রুণা থাকবে না···কিছু থাকবে না···কেউ থাকবে না। এমনি একটা অদ্ভুত কালো আশঙ্কা ছোট্ট একটা শব্দের ঢেউ তুলল, তার পর মাঝরাতের রিক্সাওয়ালার ক্লান্ত হাতের ঘন্টির মতো মনের মধ্যেই তা মিলিয়ে গেল।

কেই বা কথা রাখে—।

তুমি কি যে বল চ্যাটার্জি। কথা রাখার মতো ছেলেমানুষি কি আমাদের আছে।

ছোট্ট একটা জাহাজের জার্মান চীফ অফিসার ওয়েটকার বলল

হাসতে হাসতে। জাহাজটা পারস্য উপসাগর থেকে কলকাতা বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করে। যাতায়াতে মাত্র আড়াই মাস লাগে। ফলে, আড়াই মাস অন্তর সেই চীফ, সেই ক্যাপ্টেন, সেই রোগা তালগাছ আর মুখে ব্রণভরা ক্যাডেট—সবাই ফিরে আসে।

প্রতি ভয়েজে ওদের সঙ্গে কাজ করতে করতে জাহাজটা একেবারে ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। কারুর কাছেই আর কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ নেই। দায় নেই কোনো ভদ্রতা রক্ষার। ক্যাপ্টেন রোগা আর মাঝারি লম্বা। সিঁথেকাটা একমাথা চুল। মুখটা যেমন চিমড়ে, মেজাজটা তেমনি রাগী। প্রথম দেখলেই মনে হবে রসকসহীন কোষ্ঠকাঠিন্যওলা একটি খিটখিটে মানুষ। ওর কথার বিরুদ্ধতা করলেই ক্ষেপে যেত। আর তখন এমন জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাত যে মাথার লম্বা কটা চুলগুলো দুলত। আমাদের জাহাজের কেরানি গুপ্তবাবুও তখন রেগেমেগে বলত আহা, শালা যেন সিংহের কেশর দোলাচ্ছে। বাইরের এই চিমড়েপটাস বদমেজাজী মানুষটার ভেতরে কিন্তু সত্যিকার কর্তব্যনিষ্ঠ একটা জার্মান ভদ্রলোক বাস করত। একবার যে ওর ভেতরে ঢুকতে পেরেছে সে ঠিকই জানে, লোকটা কত খাঁটি। কিন্তু ওর ভেতরে প্রবেশ করার একমাত্র চাবি হল কাজ। সারাদিন অক্লান্ত কাজ দিয়ে ওকে জয় করা যায়, অন্য কিছু দিয়ে নয়। কাজের মধ্যে এতটুকু ফাঁকি দেখলেই ওর শাদা কপালের নীল শিরা ফুলবে। সিংহের কেশর দুলবে। চীৎকার করে, টেবিল চাপড়ে অস্থির করে মারবে। তাই সবসময় খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হত। বেশির ভাগ সময় লম্বা লম্বা লোহার রেল বোঝাই করতে হত। কখন কখন লোহার ছড় কিংবা বাঁকা বাণ্ডিল। ঐ লম্বা ভারি ভারি লোহার রেল একেবারে দেশলাই কাঠির মতো পর পর মসৃণভাবে সাজিয়ে দেওয়া তো মুখের কথা নয়। ফলে একেবারে প্রাণান্ত। তা ছাড়া এ দেশের লোকরা লোহা বোঝাইয়ে মোটে অভ্যস্তও নয়। সেই বাপ-চৌদ্দপুরুষের আমল থেকে চিরদিন পাট, গানি, চা,

হতুর্কি ইত্যাদি বোঝাই করে আসছে। আর হঠাৎ লোহা দিলে তারা পারবে কেন। উপর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের বোঝাতে আমাদের গলা চিরে যাবার জোগাড়। হ্যাচের মধ্যে এইরকম সাংঘাতিক আনাড়িপনা দেখলে জাহাজের অফিসারদেরও মাথা বিগড়ে যায়।

সারাদিন আমাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে খালি রাত্তিরের অপেক্ষায় ব্যাটারা হন্যে হয়ে থাকত। ক্যাপ্টেন ছাড়া প্রায় সবাই মেয়েমানুষের জন্যে পাগল। রাত হলে সবাই যেন শিকারী কুকুর। শিকার ধরার জন্যে চেন ছিঁড়ে ফেলার জোগাড়। লাল নীল ডোরাদার সস্তা আর্ট সিল্কের জামা পরে, গালে ভুরুতে 'টাবাক' বা 'ওল্ডস্পাইস' লোসন মেখে, সাজে-গন্ধে ভুরভুর বাবুরা চললেন হরিণীর খোঁজে। সারাদিন অক্লান্ত খাটে, রাতেও বিশ্রাম নেই। পোষা মেয়েমানুষটির দেহ তোলপাড় করে পরের দিন রোদ উঠলে যখন ফিরে আসে, তখন চোখ মুখ চুল—সব ক্লান্তির কালিতে ম্লান, বিধ্বস্ত। লাল গালে খয়েরি দাড়ি বেরিয়ে গেছে, যেন ছ মাস কয়েদ খেটে এলো। এ-সম্বন্ধে সুপারভাইজার ঘোষ বেশ বলে, জানেন, আমরা প্রথম যখন জাহাজী কাজে বেরুই, তখন জাহাজে ঝুড়ি ঝুড়ি মেয়েমানুষ আসতে দেখে ভেবেছিলাম এরা বোধ হয় জাহাজের নাবিকদেরই বউ-ঝি হবে। কিনারায় বেড়াতে গিয়েছিল, এখন ফিরে এলো। আমাদের তখনকার গুরুদেব রাজাবাবুকে জিগেস করতাম। উনি শুধু একটু হাসতেন। তার পর পেন্সিল বাড়তে বাড়তে নির্বিকারভাবে বলতেন যে আমি নাকি ঠিকই ধরেছি। ওরা বউ-ঝি বটে। তবে নিছক 'বন্দরের বউ' বা পোর্ট-ওয়াইফ।

কথাটা সেই থেকে মনে আছে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব নাবিক নামে জলের পোকাদের সঙ্গে যত মিশেছি ততই দেখেছি এদের প্রতি বন্দরে বউ থাকে, কিন্তু কোনো বন্দরে ওরা থেকে যায় না। কোনো মেয়েমানুষকেই আলাদাভাবে মনে

রাখে না ওরা। কোনো এক দূর দেশ, যা নাকি ওদের 'জন্মভূমি' নামে জানে, সেখানে কোনো নির্জন ঘরের বরফ-ঝরা রাতে, নিঃসঙ্গ স্মৃতির মতো থেকে যায় ওদের 'বিবাহিত স্ত্রী'। বন্দরের বউদের নিয়ে ওদের কত ভাব-ভালোবাসা। দেখলে মনে হয় এই মেয়েটা ছাড়া বুঝি তার বেঁচে থাকাই অসম্ভব। কিন্তু হায়, সব মিথ্যে। এ বন্দর ছেড়ে নতুন বন্দরে জাহাজ ভিড়তে যেটুকু সময়। আবার এর যে কোনো ব্যতিক্রম নেই তা নয়। কিন্তু তার সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। এবং সেই ব্যতিক্রমারাও প্রথম নাবিক জীবনে কেমন ছিল বলা শক্ত। ওদের টেবিলের উপর তাই নিজের কনে-বউয়ের ছবি কেমন যেন বেমানান লাগে। কেমন যেন নিষ্প্রাণ মাছের চোখের মতো ভাষাহীন লাগে বউটার চোখ। মাঝে মাঝে মনে হয় দেওয়ালে টাঙানো সব প্রতিকৃতিই যেন মৃত। দেওয়ালে ঝুলে ঝুলে সব ছবির মুখই একদিন মরে যায়। যার কোনো উত্তাপ-গন্ধ-স্মৃতি না থাকে, তেমন জ্যান্ত মানুষের ছবিও মৃতের ছবি হয়ে যায়। যদিও সে মানুষটা বেঁচে হাত পা নেড়ে ঘুরেও বেড়ায়, তবু। অথচ শিল্পীর হাতে একটা কনে-বউয়ের ছবিই যে কী ভাবে ক্যামেরার কবিতা হয়ে ওঠে তা ভাবা যায় না। ওয়াইল্ড স্ট্রব্যারিজ ছবিতে সেই কনের ছবিটা মনে পড়ে। কালো কাক, কালো আকাশ, কালো গাছের ডালপালা। ঠিক তার তলায় একেবারে দুধশাদা কনের পোশাক-পরা মেয়েটি সেই বৃদ্ধের যুবক বয়েসের বউ হয়ে তারই পাশে দাঁড়িয়ে। মনে হয় এই একটিমাত্র ফ্রেমে দুনিয়ার সব বৃদ্ধের মহার্ঘ স্মৃতির ছবি চিরদিনের জন্যে ধরা আছে। কিন্তু এ তো শিল্পীর ছবি।...

জীবনের ছবি কোনোদিন এমন হয় কিনা জানি না। যদি হত, তা হলে আমি রুণার ছবি এমনি করেই অমর করে রাখতাম। অন্তত সেই কটা দিনের ছবি যে কটা দিন আমরা দু জনে কাছাকাছি হয়েছিলাম। সেদিন দু জনের কাছাকাছি ছিল শুধু দার্জিলিংয়ের বরফ-ঢাকা নিঃসীম পাহাড়। থিয়েটার রোডের সেই 'টিলাভিলা'। বড়মা মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে সুব্রতবাবু রুণাকে নিয়ে

বেড়াতে এসেছিলেন দার্জিলিং। সঙ্গে সুনীলদারই আসবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে বম্বের এজেন্ট অফিস থেকে একটা জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে সুনীলদাকে বম্বে চলে যেতে হয়। বৃদ্ধ সুব্রতবাবু আর রুণাকে দার্জিলিং পৌঁছে দেবার জন্যে তাই সুনীলদার টিকিটে আমাকেই চলে আসতে হল দার্জিলিং। কোনোদিন কল্পনাও করি নি রুণার এত কাছে আসার সুযোগ পাব। শুতে পাব রুণার বুকে কান পেতে। কলকাতায় একবার ঠাট্টার ছলে রুণাকে বলেছিলাম, চল তোমায় নিয়ে পালাই কলকাতা ছেড়ে। রুণা বলল, বেশ তো চল। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমায় নিয়ে কি করবে তুমি ?

সারা দিনরাত দু জনে একটা লেপের মধ্যে শুয়ে থাকব। তিন-চার দিন পর এক একবার উঠব। একটু বেড়িয়ে আসব—ব্যাস। ফের লেপের তলায়।

কিন্তু খিদে পেলে কি করবে ?

দিনরাত চুমু খাব। তোমার ঠোঁট থেকে আমার ঠোঁট খুলবে না কক্ষনো। দু জনেই জানতাম সবটাই কল্পনা। কোনোদিনই এ রকম কিছু হবার নয়। তবু রুণাকে গভীর করে পাবার জন্যে, তার দেহের সবটুকু রামধনু রঙ ধরার জন্যে মাথায় যেন ভিসুভিয়াস জ্বলত। অথচ দিনের পর দিন না পেতে পেতে একটা গভীর অবসাদে মনটা তেতো নিমপাতা। এইভাবে শুধু প্রতীক্ষা আর অবসাদ নিয়ে কত অন্তর্মুখী বছর ঘুরেছে। তখন মনে হত আমার দিন আমার রাতগুলো শুধু রুণাকে একবার একটুখানি দেখার জন্যে তার চুড়ির শব্দ শোনার জন্যে কান পেতে আছে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেও শুধু ওর চুড়ির শব্দেই চিনে নিতে পারব রুণাকে। কোনোদিন কালবৈশাখী ঝড়জলের পর নরম নীল সন্ধ্যেতে যখন কলকাতা জুড়িয়ে যেত, তখন রাত্তিরে ঘরে ফিরে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কল্পনার মতো মনে হত সেই কতবছর আগের প্রথম দিনটির মতো আজও নিশ্চয়ই চুপি চুপি রুণা আসবে। অন্তত একটিবার এসে তার পদ্মের মতো ঠোঁট খুলে ধরবে। কিন্তু এমন মৌমাছি দিন আর

ফিরে আসে নি। ইতিমধ্যে রুণার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে বহুবার। রুণারই অমতে সব ভেঙে গেছে। আমি নীরব শ্রোতার মতো বহুদূরের নীরব শালগাছ। তার পর দীর্ঘ সাত বছর পরে হঠাৎ ঝড়ে মেঘ ছিঁড়েখুড়ে কেমন করে যেন এক আকাশ তারা।

অক্টোবরের দার্জিলিং তখন ফুলে ফলে ঝলমলে প্রজাপতি। ঘরের জানলা খুললে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। উপরের ঘন নীল আকাশ দেখতে দেখতে কাটরোড ধরে বাজারে নামলেই কমলারঙে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কালিংম্পং আর গ্যাংটকের কমলালেবুর বাগান গেরুয়া রঙে একাকার। আমার ঘরের পেছনদিকের ছোট্ট বারান্দাটা পেরুলেই রুণার ঘর। রাত্তিরে আমার জন্যে দরজা খোলা রাখতে প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় নি। ভীষণ ভয়। সেইসব অদ্ভুত মেয়েলি ভয় যার কারণ কোনো মেয়েই জানে না। শুধু বলে 'ভয় করে'। কিন্তু আমি তখন ঝড়ের মাথায় ময়ূরের পাখা। উঃ, সে কী স্বপ্নের মতো সময়ের নীলঘর নীল নীল রাতগুলো। ঠিক এখনকার ইলেকট্রিক ট্রেনের জানলার মতো। জীবনের অন্ধকারে কী প্রচণ্ডবেগে সেই আলো-জ্বলা জানলার মতো দিনগুলো স্টেশান পেরিয়ে ফের অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। সৃষ্টির প্রথমদিনের মানুষ-মানুষীর মতো শুধু আমরা দুটি প্রাণীই পৃথিবীর অধিবাসী। আর কেউ কোথাও নেই। বড় বড় কাঁচের জানলার বাইরে ঠাণ্ডা নীল শীতের রাত। বাড়ির সামনেই একটা প্রকাণ্ড স্কুল কমপাউণ্ড। সেখানে লম্বা ডানপিটে ছেলের মতো একটা পাইন ঘাড় উঁচু করে সারারাত আমাদের ঘন হয়ে-ওঠা ছবি দেখত। আমার বুকের উপর রুণার মাথা। বললাম, তুমি আজ কথা বলছ না যে? আমার উপর রাগ? উত্তর নেই। অনেকক্ষণ রুণার গলার শব্দ শুনতে পেলাম না। মনে হল নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে চাঁদের শরীর বড় হয় নি। খুব ছোট্ট একটুকরো চাঁদের আলো জানলায়-রাখা ঘড়ির গালে অশ্রুর মতো টিক টিক করছে। দূর পাহাড় থেকে ভেসে-আসা ঝিঁঝিঁর

প্রতিধ্বনির মতো রুণার কণ্ঠস্বর শুনলাম, যখন একটুও কথা বলতে ভালো লাগে না আমার। কেন জান। একদিন তোমায় পেয়ে আমি ভীষণ সুখী। কথা বলে এই দারুণ দামী সময়ের একটা মিনিটও আমি নষ্ট করতে রাজী নই। কোনোদিন জানতাম না, ভাবিও নি যে জীবন ভরে এত আছে। আমি বললাম, কিন্তু এই কটা দিনের স্মৃতি নিয়ে তো সারা জীবন বেঁচে থাকা যায় না রুণা। মনে মনে ঠিকই জানি তুমি কোনোদিনই আমার হবে না। একদিন অনেক অনেক দূরে যাবে—তাই না?

আমার বুক থেকে মাথা না তুলে ভাঙা ভাঙা গলায় রুণা বলল, তুমি যেতে দেবে কেন আমায়। জোর করে নিজের কাছে ধরে রাখতে পার না—ভীতু কোথাকার।

এ যেন রুণার গলা নয়। অন্য কেউ তার ভেতর থেকে কথা বলছে। ওর পিঠ থেকে ঢাকাটা একটু নেমে গেছে। অনাবৃত ফর্সা কাঁধ আর ঘাড় বেরিয়ে আছে। অন্ধকারে ঠিক তুলোর রাজহাঁসের মতো ছ্যাখাচ্ছে। চাদরটা আবার টেনে দিতে ও আরো ঘন হয়ে এলো আমার বুকে। কান্নাভাঙা গলায় বলল, আরো অনেক জোরে চেপে রাখ তুমি আমায় তোমার বুকে। আমার কত দিনের সাধ তোমার বুকে মাথা রেখে শুধু অমনি করে শুয়ে থাকি সারা জীবন। কিন্তু তা যে হবার নয় সে তুমি জানো বিমলুদা। প্রাণ থাকতে কেউ মেনে নেবে না আমাদের বিয়ে। দু জনে জোর করে বিয়ে করে পালিয়ে যাব—তাও সম্ভব নয়। কারণ তাতে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। বাবার কাছে প্রায়ই শুনি যে শুধু ভালো কাজ বোঝা নয় নিষ্ঠা আর সততারও খুব জান এই জাহাজী লাইনে। যার জোরে পরে নাকি তুমি খুবই উন্নতি করবে। অনেক বড় হবে তুমি। আমি চাই না আমার নিজের জন্যে বুড়ো বাবাকে আঘাত দিতে। চাই না তোমার ভবিষ্যৎ ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে।

যে অসহিষ্ণুতাটা এতক্ষণ আমার বুকে গুমরে মরছিল, এবার সেটা আর চাপতে পারলাম না। একেবারে চাঁচাছোলা গলায়

বললাম, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ আর ভবিষ্যৎ। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুনিয়ার লোকের কেন যে এত মাথা ব্যথা জানি না। সোজা কথা বলে দিলেই পার যে আমার মতো গরীবকে তোমরা পাত্তা দেবে না।

রুণা একটুও রাগল না। একটুও আহত হল না আমার ধারালো আক্রমণে। মাথাটা শুধু বুক থেকে তুলে মুখের কাছে আনল। আমার গালের দু পাশে তার নরম হাতদুটো চেপে ম্লান হেসে বলল, ওরে-বাব্বা, রাগ ছাখো বাবুর। তা তোমায় পাত্তা না দেওয়ার ব্যাপারে তুমি নিজে যখন এতই স্থির, তখন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে তুমি? রাতের পর রাত যে মেয়েটা নিজের সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে একটা মানুষকে সে কিসের আশায়? তর্ক কোরো না, ঝগড়াও না। এত অল্প সময় আমাদের যে কথা বলে তাকে নষ্ট করা পাপ। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না যে তোমায় পেয়ে আমি যত ভরে গেছি, আমায় পেয়ে তুমি কেন এত অস্থির। কেন এত অশান্তি আর জ্বালা তোমার। এখন তাই প্রায়ই মনে হচ্ছে আমার মতো এতটা জোর দিয়ে হয়তো তুমি আমায় ভালোবাসো না।

প্রথমে একটাও উত্তর দিতে পারলাম না। ধীরে ধীরে শুধু রুণাকে বুক থেকে নামিয়ে আমিই তার বুকের মধ্যে নাক ডুবিয়ে চুপটি করে তার বুকের মিষ্টি গন্ধ শুঁকলাম। নগ্ন দুটি বুকের গরম স্পর্শে রক্তে জ্বলছে সর্ষের লক্ষ গুঁড়ো। মুখ তুলে বললাম, তোমাকে পেয়েও কিছুতেই আমার সাধ মেটে না রুণা। আমার লোভ আরো অনেক বেশি। তোমার সারা দেহের স্বাদু চাই। তোমার দেহের প্রত্যেক ইঞ্চিতে আমি চুমু দিতে চাই। তোমার কাছ থেকে সন্তান চাই। চাই একটা মেয়ে যার চোখ হবে ঠিক তোমার মতো। যার দেহে থাকবে তোমার রক্ত। পারবে? পারবে দিতে আমায় এত সব।

বাইরে শীতের রাতকে ছিন্নভিন্ন করে একটা পথ-কুকুরের কান্না দূরের কুয়াশায় ডুবে গেল। রুণা নিজের ঠোঁটটা আমার কপালে

একবার ছোঁয়ালো। চাঁপার মতো আঙুল আমার ঠোঁটের উপর আলতো করে বুলিয়ে দিল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কান্নায় ভিজে গেছে ওর চোখের পাতা। কান্না-ভেজা গলায় বলল, কেন এত লোভ দেখাও আমায় বিমলুদা। নিজেকে বেঁধে রাখতে মেয়েদের যে কত কষ্ট তা তুমি বুঝবে না। তোমার সন্তান আমার মধ্যে বড় হবে, এটা আমার জীবনের যে কত বড় সাধ, তা তুমি জানবে না কোনোদিন। কিন্তু না। আজ তুমি ক্ষমা কর আমায়। একটা সুযোগ পেলাম, আর সমস্ত ভালোবাসা পুড়িয়ে শুধু দেহ নিয়ে খেলা তার পর সুখ মিটে গেলে কী ভীষণ একাকীত্ব নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরা—এ-সব বড্ড পুরনো গল্প, অনেক পুরনো-খেলা। ঈশ্বর যদি কোনোদিন আমাকে সেইদিন দেন সেদিন লুকিয়ে চুরি করে তোমার সন্তানকে আমার মধ্যে বড় করতে হবে না, সেদিন দেখবে আমি আর তোমার বলার অপেক্ষায় থাকব না। সেদিন জোর করে আদায় করে নেব সব। লক্ষ্মীটি, আজ আর লোভ দেখিও না। আমি হয়তো আর নিজেকে আটকাতে পারব না। আজ ক্ষমা কর আমায় বিমলুদা।

জল সরে যাওয়া নদীর চড়ার মতো আদিগন্ত শূন্যতা নিয়ে আমি বললাম, সেদিন অনেক অনেক অনেক দেরি হয়ে যাবে। বয়েসের ভারে ভেতরে ভেতরে একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাবে আমাদের সব ভালোবাসা।

রুণা অদ্ভুত শক্ত একটা বিশ্বাসের কাঁচিতে আমাকে কেটে বলল, তুমি পাশে এলেই দেখবে সব বরফ গলতে শুরু করেছে। গ্রীষ্মকালের পথ-ঘাট, দোকান-বাজার সব ফের বরফের তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ততদিন পারবে না অপেক্ষা করতে? বলো?

ওর চোখের উজ্জ্বল ফুলঝুরি নিবিয়ে দিতে মায়া হল। জানতাম ওর নিজের হাতেই তা একদিন নিভে যাবে। থেকে যাবে বারুদহীন ফাঁকা খোল, পোড়া তার আর বেঁচে থাকার বিনিদ্র অমাবস্যা।

দিনরাত কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যাচ্ছে ঠিক বুঝবারও

সময় পাচ্ছি না। সারা দার্জিলিং আছে, সুব্রতবাবু আছেন, কিন্তু কেউ বা কিছুই যেন ফোকাশে নেই। বার্চহিলের চেয়ে জলাপাহাড়ের দিকটাই আমার বেশি ভালো লাগে। দীর্ঘ পাইপগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছেলের কাগজ ছেঁড়ার মতো এলোমেলো রোদের টুকরো পড়ে আছে। নিচে কার্টরোড পর্যন্ত থাকে থাকে রাস্তা চোখে পড়ে। তাদের গায়ে গায়ে রঙিন মরশুমি ফুলেভরা কটেজ, অজস্র ঘাসফুল। একা একা বেড়াই। চাঁদমারি থেকে একটা ছাইরঙা ভারি কুয়াশা উপরে উঠে আসা দেখি। ধীরে ধীরে কার্টরোড, ক্যালকাটা রোড সব ঢেকে যায় কুয়াশায়। মুখ ফিরিয়ে দেখি দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে একটা শ্বেতাঙ্গী মেয়ের জ্বলন্ত লাল ফ্রক। তার বদলে ফুটে উঠছে একটা গাঢ় নীল মেয়েলি লং-কোট। তারই পাশে পাশে সেই চেনা বিলিতি গ্যাবাডিনের স্টিল গ্রে হালকা ম্যাকিনটস, গলায় মেরুন স্কার্ফ। রুণা আর সুব্রতবাবু বেড়িয়ে ফিরছেন। ওঁর ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে। চারিদিকে কাঁচের জানলাঘেরা, ভারি কার্পেট মোড়া ওঁর বসবার ঘরে একা ঘন নীল পশমের আকাশ অপেক্ষা করে আছে ওঁর জন্যে। জানলা-জুড়ে বিদেশী ক্যালেণ্ডারের ছবির মতো শাদা বরফের টুপি-পরা ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। টেবিলের উপর ঘুমিয়ে আছে তাজা চেরীকেকের প্রকাণ্ড রক্তিম স্ন্যাক। তার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে আছে পিক্ ফ্রেনের রঙিন টিন। কালচে সবুজ ফেল্টের টি-কোজিতে ঢাকা রুপোর টি-পটে হ্যাপিভ্যালির অভিজাত চা। আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, চল বিমল, চায়ের সময় হয়ে গেছে। নাকি তোমরা আর একটু বেড়াতে চাও। একটু বেশি না হাঁটলে এখানে শরীর একদম ভালো থাকে না। খিদেও হয় না। দার্জিলিংয়ের জলে পেট ভালো থাকে না—এই শ্রেণীর কমপ্লেন যারা করে, তারা আসলে এখানে ভালো থাকবার এই ট্রিক্সটা জানে না। শুধু শুয়ে বসে আর ম্যালের দোকানে চা-কফি খেয়ে কি আর শরীর ভালো হয়।

রুণা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললে, তুমি কাকে এ-সব

বলছ বাবা, উনি নিজেই একটি হাড়-কুঁড়ে। একটু হাঁটতে হলেই ওঁর গায়ে জ্বর আসে। দেখছ না আমরা বেড়িয়ে ফিরছি আর উনি সবে বেরিয়ে মাত্র এইটুকু এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

সুব্রতবাবু ধীরে ধীরে গায়ের ম্যাকিনটসটা খুললেন। ভেতরে দামী চেক টুইডের গার্ডনিং কোট, কনুইয়ের কাছে প্রথামতো কালচে ব্রাউন চামড়ার প্যাঁচ দেওয়া। মৃদু হেসে রুণাকে বললেন, দূর, আমি অন্তত বিমলকে কুঁড়ে বলতে পারব না। ডকে ওর অন্য চেহারা। সকাল থেকে কতবার যে জাহাজ আর শেড করে বেড়ায় তার হিসেব নেই। এখানে এসে হয়তো ইচ্ছে করেই একটু কুঁড়েমি করে নিচ্ছে। এসব ম্যারাথন রেসে এনার্জি গেন করার কায়দা। যাক, তোমরা এসো। আমি কিন্তু এগুলাম।

পাইনের গায়ের গাঢ় গন্ধে মাথার মধ্যে নেশা লাগছে। কাছেই কাদের একটা ছোট্ট রঙিন কটেজ। সিঁড়ির কাছে অজস্র নীল-শাদা ফরগেট-মি-নট ফুল। ইচ্ছে হচ্ছে ঐ বাড়িটার সিঁড়ির উপর দু জনে গিয়ে বসি। বললাম রুণাকে। ও রাজি হল, কিন্তু মুখে সেই দুষ্টু দুষ্টু হাসি ফুটিয়ে বলল, এত সুন্দর বাড়ির মালিকরা কিন্তু কুকুর পোষে।

রুণা জানে কুকুর আমি মোটে পছন্দ করি না। ভয় পাই। বললাম, পুষলেই বা। তাতে হয়েছেটা কি। আমি তো এমন-কিছু রগরগে জামা পরি নি যে কুকুরে তাড়া করবে।

আমার আপাদমস্তক একঝলক তাকিয়ে নিয়ে রুণা বলল, জামাটা অবশ্য তোমায় বেশ সুন্দর মানিয়েছে। কে দিল তোমায় এত সুন্দর জামাটা শুনি।

সুন্দর ছাখাবার মতো তেমন বিশেষ কিছু আমার পরনে ছিল না। কুঁড়েমি করে দাড়িটাও বানানো হয় নি। পরে আছি একটা পুরনো নেভি ব্লু উরস্টেড প্যাণ্ট আর এখানেরই ম্যালের দোকান থেকে রুণার কিনে দেওয়া ক্রিমরঙের ডাবলনিটিং উলের পুলওভার। বললাম, জামাটা যে দিয়েছে সে খুব বোকা।

রুণা একটু ঠোঁট টিপে রাগত ভঙ্গিতে বলল, তাই বুঝি ? তা হলে শুনে রাখ তুমি একটি আস্ত অকৃতজ্ঞ।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, মানছি। কিন্তু তাকে কেন বোকা বললাম তা তো জানতে চাইলে না।

রুণা বলল, কেন শুনি।

আমি আগের মতোই গম্ভীরভাবে বললাম, কারণ সে জানে না না যে শুধু গরম জামা দিয়ে শরীরের শীত আটকানো যায় না।

দার্জিলিংয়ের দিনগুলো হু হু করে উড়ে গেল সেইসব মাই-গ্রেটারি পাখির ঝাঁকের মতো, যারা ঠাণ্ডায় তুষাররাজ্য ছেড়ে উড়ে আসে এই কলকাতার আলিপুরে। আমিও ফিরে আসি সেই চেনা গঙ্গায়। যে জাহাজে কাজ করতে করতে সেই সোনার দিনগুলো পেয়েছিলাম, এবার সে জাহাজটার বিদায়ের পালা। বৃষ্টি পেছনে লেগেছে, হতচ্ছাড়া ছ্যাঁচড় বৃষ্টি। বোকা অশিক্ষিত গোঁয়ার বউয়ের মতো নাছোড়বান্দা বৃষ্টি। প্রচণ্ড রাগ ধরে, কিন্তু কিছুই করার নেই। ঘাড় থেকে নামানো যাবে না কোনোমতে। দারুণ ভয়ে ভয়ে দিন গুনছি। সেলিং সব ঠিক অথচ মাল সব তুলতে পারবো কিনা খোদা জানে। ভোরবেলা চোখ খুলে আকাশের মুখ দেখে নিজের মুখ শুকিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনকে একবার বলব ভেবে তার দরজায় ঘা দিলাম। ভেতর থেকে একটা অস্বাভাবিক চিৎকার শোনা গেল—'ইয়ে—স্'। অবশ্য কথা বলার ধরনটাই ক্যাপ্টেন ওটকারের এইরকম। যারা ওকে ঠিক চেনে না তারা ভাবতে পারে এ আবার কী রকম আমন্ত্রণের সুর। ঘরে ঢুকেই দেখি ক্যাপ্টেন খালি গায়ে, শাদা ছোট্ট সর্টস পরে, সামনে একগেলাস কাঁচা হুইস্কি নিয়ে চুপটি করে বসে আছে। ওর হাতের পাশেই ছোট্ট অলিভেতি টাইপ-রাইটারটা কপালে শাদা কাগজের পটি লাগিয়ে ঝিমোচ্ছে। আমি ঢুকতেই ক্যাপ্টেন বলল, বসো চ্যাটার্জি। খবর কি বলো।

বললাম, খবর তো ভালোই। কিন্তু তুমি সকাল থেকে হুইস্কি নিয়ে বসেছ কেন।

ক্যাপ্টেন বলল, ভীষণ পেটের গোলমাল—তাই। ছাড়ো ওসব। কাজের কথা কও। কাল সকালেই চললাম। সময় বেশি নেই। মাল সব শেষ করতে পারবে? আর কত উঠতে বাকি?

উত্তর দিলাম, টনের হিসেব দেখলে যদিও কিছুই না, কিন্তু সবই তো খুচরো মাল। জেনারেল কার্গো। ফলে সারা দিনে যতই তুলি টন পাব না। তার উপর যেমন বিশ্রী বৃষ্টি পিছু লেগেছে। এ তো লোহা নয় যে একটু আধটু ভিজেও কাজ চালিয়ে যাব।

বেশ চিন্তিত চোখে ক্যাপ্টেন আমার দিকে তাকাল। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে ঠায় ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। কোথাও এতটুকু আলগা পেলেই আমার ঘাড় ভাঙত। কিন্তু আমার তরফ থেকে কোথাও তেমন গলতি পায় নি। কাজেই ওর এখন বলার কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে তাই স্রেফ আমায় একটু চাঙ্গা করার জন্যে বললে, যাকগে, বাদ দাও ওসব। শুধু শুধু ভেবে মাথার চুল পাকিয়ে কি লাভ। তাতে বৃষ্টি তো থামবে না। চেষ্টা করো যাতে শেডের মালগুলো অন্তত উঠে যায়। বুঝলে, মিথ্যে ভেব না। মাথার চুলগুলো সব পেকে যাবে।

চীফ অফিসারের সঙ্গে দেখা হতে সেও ঐরকম বললে। তবে ওর বলার ধরনটা সব সময়ই ওর নিজের। সেই পাতলা লাল ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে রসিয়ে রসিয়ে একটি করে কথার রিং ছাড়া। মাথায় বয়েসের তুলনায় অনেক বড় একটা টাক ফেলেছে। দেখতে মনে হয় বয়েসে ও বোধ হয় ক্যাপ্টেনের জ্যাঠাবাবু। আসলে মানুষটা আমাদেরই বয়সী। আমি ঘরে ঢুকতে দেখলাম সেও শাদা ঘোড়ার বোতল পাড়ছে। আমায় বললে, এসো একটু চলবে তো?

আমি প্রায় আঁতকে উঠে বললাম, ধ্যাৎ, এখন সকাল আটটাই বাজে নি। এই সাত সকালে কেউ মদ খায়।

চীফ পরম নির্বিকার চোখে বললে, সকাল তো কি? মদের আবার কোনো সময় আছে নাকি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ক্যাপ্টেনের মতো তোমারও কি পেট খারাপ নাকি, অথবা মাথা খারাপ ?

চীফও হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, আমার পেট, মাথা কোনোটাই কখনো খারাপ হয় না। আমি খাবার যা খাই, মদ খাই তার চেয়ে অনেক বেশি। তাতে কোনো জীবাণু আমার পেটে বাঁচতে পারে না। আর মাথা ? ছ্যাখো, সারারাত আমি যেখানে পড়ে থাকি, সেখানে জাহাজের কথা একটিবারও ভাবি না।

আর জাহাজে ফিরে এসে রাত্তিরের মেয়েমানুষটার কথা মোটে ভাববার চেষ্টা করি না। আসলে আমার মাথায় একটা মনে পড়ার বাক্স আছে। সারাদিন আমি তার ডালাটা খুলে রাখি। কোথায় কি মাল নেব বা নিয়েছি, তার উপর আবার কি কি নেব, তার কোনটার জন্যে কত কিউবিক জায়গা লাগবে ইত্যাদি সব অঙ্কের হিসেব সম্বন্ধে তখন আমার জ্ঞান টনটনে। তখন সব মনে গাঁথা থাকে। কিন্তু রাতে যখন কিনারায় যাই, তখন সেই বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে, সেটা মাথা থেকে খুলে জাহাজে রেখে দিয়ে যাই। তুমিও সেইরকম অভ্যাস করো। দেখবে কখনো রক্তের চাপে ভুগবে না।

আমি বললাম, তা না হয় হল। কিন্তু ইলেকট্রিক পাখার জন্যে তুমি যে জায়গা দিয়েছ তা এখন প্রায় খতম। আমি কি টুইন ডেকে কিছু নিতে পারি।

চীফ ভুরু তুলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, উঃ তোমরা সত্যিই মাথা খারাপ করে দিতে পার। সারা রাত বাইরে কাটিয়ে এই সবে জাহাজে পা দিয়েছি। অঙ্ক কষে জায়গার মাপজোকটা অন্তত একটু মিলিয়ে নিতে সময় দাও। একটুখানি, মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় দাও আমায়। আমি তোমায় সত্যি বলছি, মাথার ভেতর সেই বাক্সের ডালাটা খোলারই আমি সময় পাই নি এখনো।

চীফকে আর বিরক্ত না করে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জোড়তাড় দিয়ে কাজ চালিয়ে সত্যিই শেডের মাল প্রায় খতম

করে দেওয়া গেল। যা রইল কাল সকালে তা চেপে ঘণ্টাখানেক কাজ করলেই মেরে দেওয়া যাবে। সুতরাং এখন মনে হচ্ছে কাল সকালে জাহাজ সহজেই চলে যেতে পারে। গ্যাংওয়ের কোলে যাতায়াতের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিলাম। হঠাৎ কালিঝুলি মাখা সেকেণ্ড অফিসারটার দিকে দৃষ্টি পড়ল। ব্যাটা একটা বীয়ারের বোতল হাতে নিয়ে নিজেরই কেবিনের বাইরের থেকে পোর্টহোলের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নাকে গালে কপালে কালি। যে বয়লার স্যুটটা পরে আছে সেটাও চিটেপড়া তেলকালিতে ভর্তি। দেখলাম ওর কেবিন থেকে পোর্টহোলের দিকে গলা বাড়িয়ে আছে একটি আধা নেপালী মেয়েছেলে। সে শুধু সেকেণ্ডের দিকে চেয়ে ফিক ফিক সোহাগী হাসি ছাড়ছে। হায়রে কপাল। কোন সোনার জার্মান মুলুকের মানুষ সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে, এখানে একটা দোআঁসলা ঝিয়ের মতো বেশ্যা নিয়ে ঢলাঢলি করছে। তায় গায়ের রঙটা যদি একটু ফর্সা হত। জানি না কী ভাষায় ওরা কুজন করে, কী ভাষায় ওদের প্রেম চলে। সবশেষে কী ভাবে যে লোকটা ওর মুখে মুখ দেয়, আর ওর বহু ব্যবহৃত পোকালাগা দেহটা ব্যবহার করে—তাই বা কে জানে!

পরের দিন সকালেও দেখলাম টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ছুটলাম জাহাজে। আর মাত্র চার-পাঁচ সিলিং মাল বাকি। কিন্তু কিছুই করার নেই। একেবারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। বৃষ্টির বেগ ক্রমশই বাড়ছে। তেমনি জোলো হাওয়া বইছে। ডেক থেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছি। কপালে নাকে চোখের পাতায় অল্প অল্প ছাট লাগছে। গ্যাংওয়েতে চোখ পড়ল সেই মোটকা সেকেণ্ড অফিসার আর তার মেয়েমানুষটাকে। একটা ছাতার আড়ালে কোনোরকমে মাথা বাঁচিয়ে দু জনে কোমর জড়িয়ে কোনোরকমে গ্যাংওয়ে দিয়ে নেমে যাচ্ছে। গেটের বাইরেই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই জাহাজ চলে যাবে। ফলে ঐ মেয়েটাও এবার শেষবারের মতো জাহাজ থেকে নেমে গেল।

মেয়েটার পরনে একটা ক্যাটক্যাটে সবুজ সস্তা জর্জেট। আর সেকেণ্ড পরেছে টকটকে লাল একটা ফুলহাতা বুশশার্ট। চারিদিকে বৃষ্টির অজস্র শাদা খৈ ফুটছে। বৃষ্টির সেই ঝাপসা পর্দার ভেতরে কালো ছাতা মাথায়, দুটি ঘন হয়ে-ওঠা লাল সবুজ আভা দূরে সরে সরে যাচ্ছে। ট্যাক্সির দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় যেন আর শেষ হয় না। আজ কেমন যেন মায়া হচ্ছে। জাহাজ থেকে নামবার সময়ই দেখেছিলাম মেয়েটার চোখে জল। এরা সেই বন্দরের বউ যারা সব জেনেশুনেও কাঁদে। তাই এদের দুঃখে ঠিক দুঃখিত হবার কোনোই কারণ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার তবু মেয়েটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। হয়তো শেষমুহূর্তে সে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিল এই পরদেশী মানুষটাকে। প্রতিদিন আসতে-যেতে চোখে পড়েছে লোকটা কত যত্ন করত মেয়েটাকে। রোজ জাহাজে এসে কত সুখাদ্য পানীয় খাওয়ানো, কত বিদেশী আতর গোলাপ উপহার দেওয়া। নিজের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে যত্ন করে গায়ে বিদেশী কম্বল দিয়ে দেওয়া। সকালে ঘুম ভাঙলে ডিম, জার্মান সসেজ আর একটা সরু সোনালী বর্ডার-দেওয়া লম্বা গেলাসে দীর্ঘ এক গেলাস টকটকে লাল জার্মান টম্যাটো জুস নিজের হাতে মেয়েটির জন্যে বয়ে আনা—কাল থেকে এ-সব কে করবে ওর জন্যে। ওর ঐ চেহারায় এদেশী কেউ মুগ্ধ হবে না ওর জন্যে। যারা আসবে তারা শুধু কড়ি ফেলে তেল মেখে চলে যাবে। আজ বিদায়ের সময় ওর কান্নাটা তাই কিছুতেই কুমীরের কান্না ভাবতে পারলাম না। উপরের ডেক থেকে ক্যাপ্টেন ডাকছে আমায়, এই চ্যাটার্জি, একা একা ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন, উপরে এস, কথা আছে।

তরতর করে উপরে উঠে গেলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে ঢুকে ক্যাপ্টেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমায় বসিয়ে নিজেও বসল। তার পর ফের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। নিজের বাথরুমে রাখা বরফের বাক্স থেকে একটা ঠাণ্ডা 'সেনালকো' বের করে, আমার সামনে খুলে দিয়ে বলল, খাও।

আমি বললাম, তুমি বসবে না?

ক্যাপ্টেন বলল, দাঁড়াও, একে একে সব ব্যবস্থা করি তার পর বসব।

নিজের টেবিল থেকে দুটি ছোট ছোট প্যাকেট নিয়ে এল। আমার সামনে রেখে দিয়ে বলল, ছাখ আমি কিন্তু কিচ্ছু ভুলি না। তুমি গতবার আমায় কিছু ভালো ব্লেড আনতে বলেছিলে। একেবারে সোর্ডমার্কা জার্মান উইল্‌কিনসন। আর এটা তোমার মেয়ে-বন্ধুর জন্যে উপহার। আশাকরি তোমার একাধিক মেয়েবন্ধু নেই।

খুলে দেখি সেই বিখ্যাত ফরাসী সুরভি স্যানেল-নাম্বার-ফাইভের ছোট্ট একটা শিশি। অবাক বিস্ময়ে ভাবছি এই কি সেই সিংহের কেশর-দোলানো অত্যন্ত খিটখিটে, বদরাগী ক্যাপ্টেন ওটকার। কবে কি আনতে বলেছি নিজেরই মনে নেই, ও কিন্তু ভোলে নি। সেণ্টটার দাম দেবার কথা বলতে ধমকে থামিয়ে দিলে আমায়। বলল, জাহাজী লাইনে থেকে থেকে তুমি একটা অসভ্য মানুষ তৈরি হয়েছ। 'উপহার' শব্দটার মানেও তোমার মাথায় ঢোকে না। পয়সা নিয়ে কি কেউ কাউকে উপহার দেয়। আর শোন, মাল ওঠার ব্যাপারে একটুও চিন্তা কোরো না। আমার সঙ্গে চীফের কথা হয়ে গেছে। আমি ওকে বলেও দিয়েছি। বৃষ্টিটা একটু কমলেই এক নম্বর হ্যাচের একেবারে স্কোয়্যারে ঐ ৩-৪ সিলিং মাল ঝটপট ডাম্প করে দিও। আমরা পরের পোর্টে ওগুলো শিফট করিয়ে নেব। কেমন খুশি তো এবার?

আমি শেষ গুডবাই করার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। আমার জামার পকেটে প্রথমে একটা বিশাল লম্বা সিগার গুঁজে দিল। জানে আমি সিগার ভালোবাসি। তার পর ফের আর একটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ওটা হল তোমার এখনি যে-কোনো দিনে খাবার জন্যে, আর এটা হল আজ যে রবিবার সেটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে। জীবনে রবিবারকে চিনতে ভুল কোরো না কোনোদিন।

তা হলেই দেখবে সপ্তার অন্য ছটা দিন হাজার কষ্টের হলেও, ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে।

ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। আর যায় কোথা। শুরু করে দিলাম কাজ। স্রেফ ডাম্প করতে কত আর সময় লাগবে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সব উঠে গেল। ইতিমধ্যে হার্বার-মাস্টারও জাহাজে উঠে পড়েছে। এখুনি গ্যাংওয়ে তুলে নেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ার জন্যে গ্যাংওয়েতে পা দিলাম। উপর থেকে চীফ অফিসারের গলা শুনলাম, মাথার মধ্যে স্মৃতির বাক্সের ডালাটা সব সময় খুলে রেখো না যেন, ওটা বেশি খুলে রাখলেই দুঃখ।

এই চীফ এই ক্যাপ্টেন আর কখন ফিরে আসবে কিনা জানি না। হয়তো আর দেখা হবে না ওদের সঙ্গে। এই ভয়েজ শেষ করে ওরা ছুটিতে যাবে। লম্বা ছুটি শেষ করে যখন আবার কাজে যোগ দেবে তখন জাহাজ নিয়ে হয়তো অন্য কোনো সাগরে, অন্য কোনো মহা-দেশে পাড়ি দিতে হবে। ক্যাপ্টেন, চীফ কারুর কথাই মনে থাকে না। স্মৃতির বাক্সের ডালা বন্ধ করতে প্রায়ই ভুলে যাই। তার জন্যে কষ্টও পাই। আর রবিবার? রবিবারকে প্রায়ই চিনতে ভুল করি। কাজের চাপে রবিবারটা প্রায়ই সপ্তার অন্য বারগুলোর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। বুঝতেই পারি না কখন রবিবার এসেছিল।

সেটাও ছিল এমনি একটা বুঝতে না পারা রবিবার। আগে ভেবেছিলাম দিনটা একটু শুয়ে বসে কাটাব। হল না। যে জাহাজটা শনিবার সেল করার কথা ছিল সেটা চব্বিশ ঘণ্টা 'পুটব্যাক' করতে বাধ্য হয়েছে। কি সব ইঞ্জিনের গোলমাল। ফলে বেরুতেই হবে ডাক। অথচ আমার সব ঠিক ছিল আজ মর্নিং শোতে 'গুডবাই মিস্টার চিপস্' দেখব। রবার্ট ডোনাটের সেই পুরনো ছবিটা। আগে অন্তত তিন বার দেখেছি ছবিটা। তবু আজও ছবিটা কোথাও এসেছে শুনলেই দেখতে ইচ্ছা করে। বিনা স্বার্থে, অকারণে ফুল-দিয়ে-যাওয়া কোনো গাছের মতো মনে হয় রবার্ট

ডোনাটকে। গাছটাকে সবাই চিনি আমরা। কিন্তু কোনোদিন তাকে মনে করি না। হয়তো গ্রাহ্যও করি নি কোনাদিন যে গাছটা আছে। আমাদের কাজ, খেলা, গর্ব অথবা শোকে কোনোদিন মনে পড়ে নি তাকে। অথচ পুজোর সময় নীল শিশির-টলমল ভোরে আমাদের হাত বাড়াবারও প্রয়োজন হয় নি। গাছটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় পায়ের কাছেই পেয়েছি রাশি রাশি শাদা শিউলির ঝাঁক। শাদা দেখলেই মনটা শরতের আলোয় ভরে যায়। শাদার বড় রঙ নেই। তবু কেন যে মানুষ এত রঙ চায়। গেটের মুখেই বিজনের সঙ্গে দেখা। তার বউ আশার জন্যে সে কি একটা বিশেষ রঙের বিশেষ লিপস্টিক চায়। রেভলনের সেই বিশেষ রঙের শেডটি আমায় জাহাজের চীফকে দিয়ে আনিয়ে দিতে হবে। জাহাজটা বরাবরই প্যাসিফিক লাইনে যাতায়াত করে। পাঁচ-ছ মাসের ভেতরেই স্টেটস্ থেকে কলকাতায় ফিরে আসবে। বিজন বেশ ভালোই জানে চীফ আমার খুব বন্ধু। সুতরাং আমি বললে আমার কথা সে নিশ্চয়ই ফেলতে পারবে না। এই সূত্রে আমায় একটু গাছে তোলার চেষ্টা করল যাতে আমি খুশি হই। আমার কথায় নাকি অফিসাররা সব ওঠে-বসে ইত্যাদি ছোঁদো তেল-মাথানো ভাষা। তার পর সামান্য তেলমাখানোর ভাষা দিয়ে, নিজের কাজ বাগাবার অসাধারণ বুদ্ধিতে নিজেই খুশিতে ডগমগ হয়ে বেরিয়ে গেল। মনে মনে খুব খানিকটা হেসে আমিও ডকের পথে পা বাড়ালাম।

মোটা মোটা পাইপ দিয়ে জাহাজ থেকে জেটিতে ট্যালো নামানো হচ্ছে। জেটির উপর ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকের উপর ট্যাঙ্ক। পাইপ দিয়ে সোজা ট্যালো চলে যাচ্ছে সেই ট্যাঙ্কের ভেতর। এতে আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা শুধু অন্য হ্যাচগুলো পরিষ্কার এবং ওভারসাইড থেকে কিছু কিছু গানি বোঝাই করছি। এ কাজটা দেখার কথা অবশ্য ফোরম্যানের। কিন্তু কাউকেই ঠিক বিশ্বাস করা যায় না এখন। অন্তত যতক্ষণ

জাহাজে থাকি ততক্ষণ নিজেই সব লক্ষ্য রাখা ভালো। ট্যালোর নোংরায় সারা জাহাজের ডেক, রেল, হ্যাচ-কোমিং সব তেলচিটে হয়ে গেছে। আর একটা বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। চীফ স্টারবোর্ড সাইড থেকে হাতের ইশারায় ডাকল আমায়। বয়েসের তুলনায় লোকটাকে যেন একটু বেশি বুড়ো দেখায়।

মাথার চুলটা ছাঁটার দোষে, না নাকটা বেশি লম্বা আর মোটা বলে, না চিবুকটা ভারি বলে—কি জন্মে যে ওকে বুড়োটে দেখায় জানা মুস্কিল। প্রথমবার এসে যখন বউয়ের ছবি দেখিয়েছিল সেবারই ওকে ওর তুলনায় বউয়ের কচি মুখ নিয়ে যথেষ্ট ঠাট্টা করেছিলাম। উত্তরে চীফ নিজেও বেশ ছুঃখের সঙ্গে বলেছিল, ছাখ না, দেশেও যখন বউকে নিয়ে বাইরে যাই, সবাই ওকে আমার মেয়ে বলে ঠাট্টা করে। অথচ আমার সঙ্গে আমার বউয়ের বয়েসের তফাত মাত্র ছু বছরের। বিশ্বাস করতে পার?

আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে, বলল, ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ কি। দশটা বেজে গেছে, জান না এটা আমাদের কফি টাইম।

চীফের হাতের মোটা গ্লাভসটা একেবারে তেলকালিতে কালো হয়ে গেছে। গায়ের শাদা ওভারঅলটা হয়ে গেছে নস্যি রঙের। মানুষ থেকে ডেক হ্যাচ চারিদিকে এই তেল কালি নোংরা। অথচ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেই একেবারে অন্য চেহারা। চারিদিক অসাধারণ পরিষ্কার ঝকঝকে আর পুরোটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। প্রতিটা ঘর হাল আমলের ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। দেওয়াল থেকে দেওয়াল কার্পেট মোড়া। ডাইনিংরুম, বার, লাউঞ্জ—সব বড় বড় একখণ্ড কাঁচের জানলা দিয়ে ঘেরা। সে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ আর সমুদ্র, অবাধ নীল আর সবুজ হুড়মুড় করে ঘরে চলে আসে। আমায় ঘরে বসিয়েই চীফ সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল। গ্লাভস আর ওভারঅল খুলে, ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আমার সামনের সোফায় বসল। বলল, আরে,

তুমি হাত মুড়ে বসে আছ কেন। কফিটা ততক্ষণ সুরু করতে পারতে।

বললাম একা খেতে আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলামই বা, ক্ষতি তো কিছু নেই।

লম্বা হাতটা মুখের কাছে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে নেড়ে চীফ বললে, ধ্যাৎ বাদ দাও আমার কথা। রাতদিন এই শালা ট্যালো ঘেঁটে ঘেঁটে আমার শরীর ঘিনঘিন করে। গা পাকায়। সারা জাহাজ থেকে একে ফের পরিষ্কার করে তুলতে আমার জীবন বেরিয়ে যাবে। অথচ ভালোভাবে ঐ ট্যাঙ্কগুলো পরিষ্কার না করলে ওতে অন্যকিছু লোডও করতে পারব না। আচ্ছা জ্বালায় পড়েছি বটে…।

আমি এবার খুব ভেবেচিন্তে একটি আস্ত বোকা পাঁঠার মতো প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, ঐ 'ট্যালো' 'ট্যালো' শুনছি তো কবে থেকে। ঐ তেলের মতো বস্তুটা চোখেও দেখলাম কতবার। কিন্তু আসলে জিনিসটা কি বল তো। কি বা হয় ওটা দিয়ে। কোন কম্মে লাগে?

আমার এইরকম অদ্ভুত সরল প্রশ্ন শুনে সুগভীর অজ্ঞতা দেখে চীফ খুব খানিক প্রাণ খুলে হাসল। তার পর বলল, যাক জান না যে এটাই তোমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে। যদি জানতে তা হলে তোমারও আমার মতো গা পাকাত। সাধারণত যে-সব জীবজন্তু আমরা খেয়ে থাকি, তাদের নাড়িভুঁড়ি, তেলচর্বি থেকে তৈরি হয় এই ট্যালো। আর কি কাজে লাগে জিগেস করছ? ঐ ট্যালো মিশিয়েই রাজ্যের সব ভালো ভালো সাবান লিপস্টিক ইত্যাদি তৈরি হয়। দুনিয়ার যত সুন্দরীদের ঐ যে-সব লাল, শাদা, গোলাপী, কমলা, কফি আর মধু রঙের ঠোঁট দেখে আমাদের ঠোঁট সুড়সুড় করে, সবের সঙ্গে ট্যালো আছে মনে থাকে যেন।

আমি মুখ বিকৃত করে ছো ছো করতে চীফ ফের হাসতে হাসতে বললে, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে জীবনে আর কখন কোনো লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটে চুমু খাবে না—তাই না?

বললাম, তুমি আমায় চিনলে না চীফ। ট্যালোয় আমার মোটেই ঘেন্না নেই। আসলে লিপস্টিক বস্তুটাই আমার ঠিক পছন্দ নয়।

আশ্চর্যভাবে আমার কথায় সায় দিয়ে চীফ বলল, ঠিক বলেছ। আমারও তাই মনে হয়। বিশেষত লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটে মুখ দিলে কখনোই মনে হয় না চুমু খাচ্ছি। মনে হয় যেন এককাপ পিপারমেন্টে চুমুক দিচ্ছি।

চীফের কথাটা মনে মনে ভাবছি আর হাসি পাচ্ছে। হায়রে বিজন, হায়রে তোমার মহারাণীমার্কা অতি শৌখীন বউ আশাবতী। যদি একবারও জানতে তোমরা যে, গরু-ভেড়া ছাগল শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি, তেল চর্বি থেকে আমাদেরই মতো অজস্র নোংরা মাখা কতকগুলো সাধারণ মানুষ তৈরি করছে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় বিলাসদ্রব্যগুলো—তা হলে হয়তো এতটা ঘৃণা করার সাহস হত না তোমাদের। সারা সভ্য জগতের সব কিছু বিলাস আর সুরভি-সোহাগের পেছনে এমনি করে লুকিয়ে আছে কারুর না কারুর ঘাম আর নোংরা হাতের স্পর্শ। ঘাম আর নোংরামির বিচিত্র কেমিকেল থেকে বেরিয়ে আসছে কত জ্বলন্ত ফুটন্ত বর্ণ-গন্ধ-রঙ, যা দুনিয়ার সব মেরিলিন মনরোদের লোভনীয় সাজে সাজিয়ে দিচ্ছে, অথচ তারা কেউ জানে না কোথা থেকে এ-বিলাস, কোথায় তার শেষ।

জীবনের বেশ কটা বছর এই দত্তবাড়িতে কাটিয়ে বিলাসের যে অদ্ভুত ধরন-ধারণ দেখেছি, তার তুলনা নেই। এই অদ্ভুত বিলাসিতা থেকে এ বাড়ির ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যায় না। এই দেশ, যেখানে নিজের বাড়ি থেকে বেরুবার দরকার নেই, জানলা খুললেই হাজার হাজার শুকনো আখের মতো সরু সরু হাত এগিয়ে আসবে কিছু পাবার আশায়, সে দেশেই আবার কেউ কেউ কিছুতেই বুঝতে পারে না লুচির ফুলকোটা বেশি মোটা হয়ে গেলে মানুষ তা খায় কি করে। বিজনের এলাহাবাদের পিসিমা আর পিশে আসতেন

তাদের আধডজন ছেলেমেয়ে নিয়ে। মার্বেলের দালানে বসে সেজবাবুকে ঘিরে তাদের ক্ষুদ্র ভোজসভা বসত দু বেলা। সেজমা ফোড়ন দিতেন, এই মোটা মোটা লুচি খাওয়া বাবার জন্মে দেখি নি বাপু। আমাদের জমিদারী রক্তে যে লুচির সোয়াদ লেগে আছে তোমাদের ভিটেয় পা দিয়ে তা তো ভুলেই গেছি।

এরপর অবধারিতভাবেই সেজবাবু ডাক পাঠাবেন বামুন শিবুকে। শিবুঠাকুব হাত কচলাতে কচলাতে হাজির। সেজবাবুর বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল।

একি ছাদ্ধবাড়ির লুচি এনেছ। যত বয়েস হচ্ছে তত মাথাটা খারাপ হচ্ছে।

এরপর লুচি কেমন হবে সেজমার ব্যাখ্যান থেকে তা অনুমান করে নিতে হত। অর্থাৎ তার সাইজ হবে ফুচকার থেকে আকারে কিছু বড়। তার ফুলকোটা হবে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম। আমের সময় যে আমের সারা গায়ে কোথাও একটু নরম হওয়ার আভাস থাকত তা পচা মার্কা পেয়ে তৎক্ষণাৎ চাকরদের কোটায় চলে যেত। বড়দিনের সময় পাথরের দালান ভরে যেত ফল-মাছ-মিষ্টিতে। পাতলা নরম কাঠের ফাইবারের গোল গোল বাক্সে ৩/২ লেয়ার তুলোয় মোড়া ভূমধ্যসাগরীয় দেশের আঙুর আসত। সব জাহাজী শ্রমিকদের বড়দিনের ভেট। কর্তাদের আমলের গোবিন্দ-বিগ্রহ বাড়িতে থাকায় মুরগি ঢোকার নিয়ম ছিল না বাড়িতে। তার বদলে কাজেকর্মে আট-দশ ডজন হাঁস আসত রোস্টের জন্যে। একটা হাঁসকে দু টুকরোর বেশি করলে তা আর বাবুদের পাতে দেবার নিয়ম ছিল না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল বাবুরা কেউই তেমন খাইয়ে ছিলেন না। সেজবাবু তো চিরকালই পেটরোগা মানুষ। তবু পাতের কাছে গোল করে অন্তত গোটা দশেক বাটি সাজানো না থাকলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত। কোনটায় তর্জনী, কোনটায় কড়ে আঙুল ডুবিয়ে তিনি শুধু চেখেই বাটি সরিয়ে দিতেন। পাশেই ভাগ্নে ভাইঝি ছেলেমেয়েরা তার

সদ্ব্যবহার করত। শ্রীগোবিন্দের গরম হবে বলে সারা গরম কালটা ঠাকুর ঘরে পাখা চলত। বাড়ির কচি বউরা কাননদেবীর ছবি দেখে এসে সেই অনুযায়ী গয়না গড়াতেন, জামাকাপড় তৈরি করাতেন। অদ্ভুত সুন্দর বিলিতি লেসের কাজকরা সায়া পরতেন। তার উপর এমন শাড়ি পরতেন যাতে সায়ার লেসের ভারী কাজ চাপা না পড়ে। কাননবালার সেই 'বেকারনাশন' ব্লাউজের হিড়িক উঠল যেবার, সেবার ডান কাঁধে মাত্র তিনটি স্ট্র্যাপ দেওয়া বেকার-নাশন ব্লাউজ পরতে কেউ আর বাদ পড়ল না। বউরা রুপোর ডিশ-গেলাস শাড়ি দিয়ে গরীবঘরের বউদের এয়ো করতেন স্বামী-পুত্রের মঙ্গলব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে। হাঁড়ি হাঁড়ি সাদা যুঁইয়ের মতো রাঁধুনীপাগল চালের গন্ধে ভুরভুর করত সারা বাড়ি। বর্ষাকালে মাঝগঙ্গার জাহাজ থেকে ফেরার পথে বাবুরা ঝুড়ি করে রুপোলী ইলিশ আনতেন। কাঁটাহীন করে গোটা ইলিশ সর্ষেবাটা দিয়ে ভাপে রান্না হত। অত্যন্ত মিহিদানা জাভার চিনি দিয়ে ইলিশের ডিমের চাটনি হত। অরন্ধনের দিন সারা তালতলায় কেউ বাকি থাকত না দত্তবাড়িতে পাত পাড়তে। অন্তত চার টুকরো গরম ইলিশভাজা, শুকনো মিষ্টি ডাল আর পান্তা জুটত সেদিন সকলের ভাগ্যে। তার পর ঢেকুর তুলতে তুলতে বৈঠকখানায় একটু গড়িয়ে নেওয়া। তিনি 'ত' অর্থাৎ, তামাক, তাস, তাকিয়া কিছুরই অভাব নেই সে বৈঠকখানায়। ফের তিনটে থেকে শুরু হত অবিরাম চা চা চা।

সন্ধ্যের আগেই কর্তারা সব বাইরে থেকে ফিরে আসতেন। খালি গায়ে পরিষ্কার র‍্যালির বাড়ির ধুতি পরে সব সারি সারি ঘুটঘুট বসে পড়তেন উঠোনের সামনের মার্বেল-বাঁধানো রোয়াকে, সিঁড়িতে। সুব্রতবাবু লঘুভাবে পায়চারি করতে করতে গাছে জল-দেওয়া তদারক করতেন। মেজবাবু, অর্থাৎ, হরেন্দ্রচরণ এলেই জাহাজ আর কারবারের কথা শুরু হয়ে যেত। ছোট কুতকুতে চোখ, সরু নাক, সরু ভুরু আর মুখে বিনয়ের অবতার-মার্কা হাসি—ইনিই হলেন

সেই হরেন্দ্রচরণ। ইতিহাস বইয়ের ঔরঙ্গজীবের মতো মুখের আদল। ছোট্ট হাঁ মুখ, তার নিচে পাইপের ডাঁটির মতো আধবাঁকা পাতলা চিবুক। একেবারে বসানো অহীন্দ্র চৌধুরীর ঔরঙ্গজীব। তখনো কেউ জানত না যে শুধু চেহারা নয়, চতুর বুদ্ধি আর প্রায় হিংস্র স্বার্থপরতায় উনি ঔরঙ্গজীবকেও হার মানাতে পারেন। কারবার বড় হওয়ায় এবং সুব্রতবাবুর বয়েসের ভারে তাঁর পক্ষে সমস্ত দায়িত্ব বহন করা আর সম্ভব ছিল না। প্রথমে তাঁকে কিছুটা ভারমুক্ত করার জন্যেই হরেন্দ্রচরণ কারবারের অনেক কিছুই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তার পর তাঁর কাছে জবাবদিহি চাইবার আর কেউ ছিল না। তিনিও সেই সুযোগে মেপে মেপে পা ফেলে এগিয়েছেন নিজের শিকারের দিকে। এই সময় তাঁকে সাহায্য করেছিল কয়েকটা দামী মৃত্যু এবং বেশ কিছু পাহারাহীন সময়ের মারপ্যাঁচ। সুব্রতবাবু তখন অনেক দূরের মানুষ। আর হরেন্দ্রচরণকে মুখ তুলে কিছু জিগেস করার মতো সাহস তখন আর দত্তবাড়ির কারুর ছিল না।

বেশ মনে পড়ে একটা জরুরি টেলিফোনে ডকের ভেতরেই আমায় খবর দেওয়া হয়েছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে। কে ফোন ধরেছিল জানি না। যে খবরটা দিল সে আর কিছুই বলতে পারল না আমায়। কিছুতেই অনুমান করতে পারছিলাম না কার কি হতে পারে। এক এক করে দত্তবাড়ির অনেক মুখ চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কে হতে পারে? সুব্রতবাবু? না না। যদিও বয়েস হয়েছে তবু চেহারা তাঁর বেশ শক্ত। আমার সামনেই তো আজ ভোরবেলায় রুণাকে নিয়ে কালীঘাট গেলেন। তা হলে নিশ্চয়ই পেটরোগা সেজবাবু। মেজবাবু হরেন্দ্রচরণ সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো কারণই নেই। তালতলার সেই চিরচেনা গলিটায় যখন ঢুকলাম, দত্তবাড়ির সামনেটা তখন মানুষে গাড়িতে ছেয়ে গেছে। উপরের চিকফেলা বারান্দাগুলো থেকে মিলিত চাপা কান্নার রোল। হঠাৎ বাথরুমে পড়ে গিয়ে সুনীলদা অজ্ঞান হয়ে যায়। তাঁর জ্ঞান

আর ফিরে আসে নি। সত্যিই ভাবা যায় না। দত্তবাড়ির সবচেয়ে প্রিয়দর্শন এবং মিষ্টিস্বভাবের মানুষ সুনীলদা। কেউ কখন রাগতে দেখে নি সুনীলদাকে। ঠিক তেমনি মিষ্টি আর হাসিখুশি সুনীলদার বউ আভা বৌদি। ছোট্ট একচিলতে সরু নাক, চিবুকটা সরু কিন্তু গালটা ভারী। হাসলে ঠোঁটের বাঁ-পাশে গজদাঁতটা বেরিয়ে পড়ে, তখন মুখটা যে কি মিষ্টি লাগে বলা যায় না। পড়ন্ত যৌবনের একটা ম্লান দীপ্তি ছিল আভাবৌদির শরীরে। রেখায় কোনো উগ্রতা নেই, তীক্ষ্ণতা নেই, তবু আভাবৌদির চেহারাকে কেউ ঢ্যাপসা বলতে পারবে না। দেখা হলেই প্রাণখোলা ঠাট্টা, ইয়ারকি। চোখে সব সময়ই শরতের হালকা আকাশের ছায়া। কথার প্রতিছত্রে অন্তত দুটি করে 'ভাই' বলা চাই। আভাবৌদিকে নিজের থেকেই দিদি বলতে ইচ্ছে করে, বৌদি নয়। পাতলা লাল ঠোঁটের ফাঁকে সেই গজদাঁত সমেত হাসি—দেখলেই মনে হয় জগতে কোথাও কোনো অভাব নেই, যুদ্ধ নেই, হিংসে নেই। অন্তত আভাবৌদির জগতে এইসব শব্দগুলো সত্যিই অনুপস্থিত। ঘরের শো-কেসের ভেতরে ভারি সুন্দর তিনটি বেলজিয়ান কাঁচের লাল ফুটন্ত টিউলিপ ছিল। বিয়ের পরে সুনীলদাই কবে যেন আভাবৌদিকে উপহার দিয়েছিলেন। কাঁচ হলেও এত নরম তার পাপড়ি আর রঙের মধ্যে এমন-একটা উষ্ণতা যে মনে হত আর একটু ফুটলেই বুঝি ফুলটা ঝরে যাবে। এ ফুলগুলো ভীষণ প্রিয় ছিল আভাবৌদির। প্রায়ই বার করে পরিষ্কার ন্যাকড়ায় সাবান মাখিয়ে ওগুলো ধুয়ে-মুছে ফের নিজের হাতে সযত্নে তুলে রাখতেন। এইরকম সময়ে একদিন দেখা হতে আভাবৌদি আমায় বলেছিলেন, আমি মরে গেলে, এই টিউলিপগুলো আমার সঙ্গে দিয়ে দিও ভাই। সত্যি বলছি ওগুলো আমি মরে গেলেও ছাড়তে পারব না। আমার হাত দেখে একজন গণৎকার আমায় ভাই বলেছিল আমার নাকি সতীনভাগ্য। এ ফুলগুলো কিন্তু আমি ভাই কিছুতেই সতীনকে দিয়ে যেতে পারব না—সে তোমার দাদা যতই রাগ করুন। যে

যা বলুক, তুমি কারুর কথা শুনবে না। বল না ভাই, দেবে তো ফুলগুলো আমার সঙ্গে…।

কে কার ফুল সঙ্গে দেয়। উপরে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। সারি সারি লিকলিকে পামগাছের পাতার উপর উজ্জ্বল নীল আকাশ। মাটিতে একটা কালো মরা ডেঁও পিঁপড়েকে আর একটা পিঁপড়ে টেনে নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। একটি একটি করে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেছি আমিও এরপর বহুবার। মৃতদেহ বার করার সময় প্রতিবার যেন আশ্চর্যভাবে বড় হয়ে গেছে দত্তবাড়ির সেই পরী-বসানো গেট। সুনীলদা মারা যাওয়ার মাত্র দেড় বছর পরেই আভাবৌদি মারা গেলেন। আর সতীন আসার ভয় ছিল না আভাবৌদির। বন্ধ শো-কেসের মধ্যে তেমনি টাটকা রয়ে গেল লাল পাপড়ি বেলজিয়ান কাঁচের টিউলিপ। শুধু অনেক লালপদ্ম আর রজনীগন্ধা তাঁর সঙ্গে হেঁটে গেল নিমতলায়। কান্না? না না কান্না পাবার সময় নেই আমার। রুণার বিয়ের দিনেও কাঁদি নি আমি। গোড়া থেকেই জানতাম রুণা আমার নয়। বড় ঘরের সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করতে পারে যে শ্রেণীর পুরুষ, তাদেরই একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে রুণার। তারা হয় নিজেরা বড়লোক, নয়তো, বড়লোক বাপের ছেলে। তা না হলে খুব বড় চাকরি করে, নয়তো বিরাট লোহা বা কয়লার ব্যবসা। আমি এ-সব দলের কেউ না। আমি স্রেফ দত্তবাড়ির পোষা বেড়াল। ভীতু আমি। আমি গেঁথে-গুনে হিসেব করে পা বাড়াই। জানি জাহাজ ছেড়ে গঙ্গা ছেড়ে দূরে সরে গেলে খেতে পাব না আমি। তখন রুণাকে বিয়ে করলে ও নিজেই আমায় গঙ্গা থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ, আমি এখানে থাকলে তার বুড়ো বাবার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গার টান যে আমার নাড়িতে। স্রোতের লক্ষ সুতো বেঁধে রেখেছে আমায়। বসতে দেবে না। কাঁদতে দেবে না। শুধু ভাসছি আর ঘুরছি। রুণার বিয়ের দিনেও আমি সারাদিন গঙ্গায়। জাহাজ যাবে সেই পারস্য উপসাগরে।

জার্মান লাইনের সেই ছোট্ট তিন হ্যাচের জাহাজ। চীফ অফিসার নতুন, কিন্তু ক্যাপ্টেন পুরনো। জাহাজের কেবিন হ্যাচ হ্যালিওয়েয়র গন্ধ পর্যন্ত চিরচেনা। বড় বড় গ্লাস-কেস লোড হচ্ছে। কেসগুলোকে দেখতে পাঁচ ফুট বাই সাত ফুট প্রকাণ্ড বইয়ের মতো। শেডের ভেতর থেকে কী-লাইনে সারাটা পথ এগুলোকে দাঁড় করিয়ে বয়ে আনতে হয়। তার পর হ্যাচের মধ্যেও এগুলোকে দাঁড় করিয়ে সারি সারি বইয়ের মতো সাজিয়ে রাখতে হয়। ইত্যাদিতে সময় চলে যায় অনেক। অথচ কালই জাহাজ চলে যাবে। হাতে পাওয়া মাল তুলতে না পারলে একেবারে ছো ছো ব্যাপার। চারদিকে দ্বিগুণ বকশিসের ব্যবস্থা। তবু যথাসাধ্য জোরে কাজ চলছে। লোহা ঠেলার হু হু শব্দে কানে তালা লেগে যায়। সারাদিন ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা টনটন করছে। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আকাশ থেকে লাল আগুন ডকের তেলা জলে পড়ে বিচিত্র ক্যানভাসে অদ্ভুত-সব ছবি তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ মানে আসলে একটি লোহার খাঁচা। লোহার মেজে, লোহার ছাদ, লোহার দেওয়াল। সারাদিনের খাঁ খাঁ রোদ খেয়ে এই বিরাট খাঁচার যে কি অবস্থা হয় তা ইঁটের বাড়ির বাসিন্দারা কোনোকালে বুঝবে না। ডেকে দাঁড়িয়ে মনে হয় কেউ বোধ হয় আতসকাঁচ দিয়ে তার গোলার্ধে ফেলার চেষ্টা করছে। ছেলেবেলায় শীলেদের বাড়ির ছাদে অসিতের আতসকাঁচ দিয়ে খবরের কাগজ পুড়িয়ে খেলা করতাম। কিছুতেই আগুন দেখতে পেতাম না। শুধু কাগজ-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগলেই দেখতাম কাগজটা পুড়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি এবার বুঝি আমার গা থেকেও ধোঁয়া বেরুবে। শ্মশানের সেই মানুষপোড়া গন্ধ। অদৃশ্য আগুনে আমি তিলে তিলে পুড়বো…রুণা চলে যাবে কতদূর। হঠাৎ, পেছন থেকে কাঁধে কার স্পর্শ পেলাম, এসো বীয়ার খাই।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ক্যাপ্টেন ফস্ দাঁড়িয়ে। ঠিক তেমনি রোগাটে লম্বা ছিপছিপে একহারা চেহারা। মাথায় কালচে লাল

ছোট ছোট ঢেউ-তোলা চুল। অ্যামেরিকানদের মতো খুব ছোট করে ছাঁটা। পাতলা টিকালো নাক। মুখটাও রোগা আর লম্বাটে। গালে চোয়ালে একটুও বেশি মাংস নেই। ঠোঁটের উপরে বাঁ দিকে মেয়েদের বিউটিস্পটের মতো ছোট্ট একটা তিল। আর চিবুকটা তো যেন মেয়েলি। চোখ নীল। সুন্দর টানা টানা ভুরু। খুদে খুদে হলেও চোখটা সত্যিই হাসতে পারে ক্যাপ্টেন ফসের। যেমন মিষ্টি দেখতে তেমনি মিষ্টি স্বভাব। আমি ক্যাপ্টেনের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। শরীর তখন শুকিয়ে কাঠ। দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। কাজ এমনিতেই এখন খুবই জোর চলছে। ফলে নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। ক্যাপ্টেনের কেবিনটা ছোট জাহাজের কেবিন যেমন হয় তেমনি। চারিদিকে গাঢ় লাল কাঠের প্যানেলিং। সবকিছু খুব পরিষ্কার করে গোছানো। লেখার টেবিলের ঠিক উপরে অতি সাধারণ দ্বিমাত্রায় আঁকা একটা ছবি বেশ চোখে পড়ে। হয়তো কারুর স্মৃতি। ছবিটা কিছু না। শুধু স্মৃতির জন্যেই ওর দাম। আমি জানি, শুধু কলকাতা সিলোন নয়, ক্যাপ্টেন ফস্‌কে আদর করতে ভালোবাসে এ-রকম বহু মেয়ে পৃথিবীর অনেক বন্দরে ছড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাধারণত খুব একটা বন্ধুত্ব হয় না। কারণ বয়েস আর মেজাজের তফাত। কিন্তু তার ব্যতিক্রম হল ক্যাপ্টেন ফস্‌। খুবই অল্প বয়েসে ক্যাডেট হয়ে জাহাজের কাজে ঢুকেছিল। তার পর খুব তাড়াতাড়ি দারুণ উন্নতি করে এবং পরীক্ষা দিয়ে আজ মাত্র ছত্রিশ বছরে ক্যাপ্টেন। অথচ এ-সবের জন্যে ফসের কোনো গর্ব নেই, কোনো নাক-তোলা ভাব নেই। অত্যন্ত বিনয়ী আর ভদ্র। জলের মানুষরা সাধারণত ঠিক এ ধাঁচের হয় না। ফলে, ক্যাপ্টেন ফসের সঙ্গে এমন-একটা সহজ বন্ধুত্ব হয়েছিল যা ভোলা যায় না। আমি যখন ওর কেবিনে ঢুকলাম তখন ওর কেবিনে আরো দু জন খুব ঘন লম্বা সোনালী চুলের হাবলু-গুবলু ধরনের ছেলে বসে ছিল। তাদের সামনের টেবিলে দুটি খালি বীয়ার বোতল। ফসের নিজের টেবিলে আরো

ছুটি খালি বোতল। বুঝলাম ওদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের আগেই দু বোতল হয়ে গেছে।

ওর কেবিনে ঢোকার আগে একবারও বুঝতে পারি নি যে আমার সময় আজ কেমন করে জানি না ক্যাপ্টেন ফসের ব্যথার ঘড়িতে ঘুরতে থাকবে। মানুষ আজকাল সব পারে, শুধু একটা পলাতক সেকেণ্ডকে কিছুতেই এক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড় করাতে পারে না। মরা সময়কে মরা পিঁপড়ের মতো পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে ধরে রাখার চেষ্টা চলে ছবিতে, চলচ্চিত্রে। 'জীবন সঙ্গিনীর' যুবক ছবি বিশ্বাসকে দেখে জীবানন্দরূপী বৃদ্ধ ছবি বিশ্বাস হেসে ফেলবেন। ছবিতে ধরা থাকে যৌবন, বাস্তব জীবনে নয়। মাঝ রাতে আমায় দেখে আমিও আজ হয়তো হেসে ফেলব। রুণার বিয়ের লগ্ন রাত এগারোটার পরে। আমার জীবন থেকে রুণা বহুদূরের কুয়াশা হয়ে যাবে। আমার কাছে থাকবে কিছু মরা সময়, বাসি স্মৃতি—ভুলে যাওয়া কোনো মেয়ের চুলের গন্ধের মতো। আমি প্রত্যেকদিন বুড়ো হয়ে যাব, কিন্তু স্মৃতিগুলো তেমনি যুবক থেকে যাবে। সেইসব নীল নীল দুরন্ত লম্বা চুমু-টানা দিনগুলো···এক সঙ্গে হৈহৈ করে স্মৃতির স্কুল থেকে বেরিয়ে আসবে···আমি বুড়ো জামগাছ হয়ে ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব···ওরা আমার চোখের তলায় গোল হয়ে খেলা করবে···। ধ্যুৎতেরি, কি যে সব ছাইপাঁশ ভাবছি। সামনের ছেলেদুটির কাঁচের জাগ্-এ সোনালী বীয়ার তখন শেষের ফেনায় কাঁপছে। ক্যাপ্টেন ফস্ আমার হাতেও ধরিয়ে দিল সেই চিরচেনা বরফের ভালো-লাগা বেক্স্। গাঢ় সবুজ বোতলের মাথায় রূপালী রাংতার টুপি। গায়ে লাল লেবলের উপর মস্ত সোনালী চাবি আঁকা। পরিচয় করিয়ে দিল পূর্ব জার্মানির ছেলে-দুটোর সঙ্গে। পূর্ব জার্মানি, অর্থাৎ সেই রাশিয়ান গণ্ডী। একটা প্রকাণ্ড রাশিয়ান জাহাজে ওরা এসেছে কলকাতার জন্যে মাল নিয়ে। খানিক বাদেই ছেলে-দুটি উঠে গেল। ওদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে নিজেদের জাহাজে। জাহাজটা রয়েছে এ-জাহাজের মাত্র দুটি বার্থ

পরেই। তবু ওদের তাড়াহুড়োর শেষ নেই। কারণটা জানাল ক্যাপ্টেন ফস, ওরা চলে যাবার পরে। ওদের পেছনে সবসময় গোপন রিভলভার নিয়ে সাদা পোশাকে স্পাই ঘুরে বেড়ায়। ওরা যেখানেই যাক তার প্রতি মিনিটের হিসেব নির্ভুল লেখা থাকবে ওদের নামের পাশে, জাহাজের লগ্ বুকে। তার জন্যে ওদের চাকরি যেতে পারে, ইজ্জৎ যেতে পারে—এমন-কি প্রাণটাও যেতে পারে। একমাত্র কমিউনিস্ট দেশ ছাড়া, ত্নুনিয়ার অন্য-কোনো বন্দরে অন্য-কোনো মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা মানে ওদের পক্ষে নিজের বিপদ ডেকে আনা। ক্যাপ্টেন ফস্ ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছে আর আমি শুনে যাচ্ছি। গেলাস শেষ করে একবার ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকালাম। মুখের স্বাভাবিক সাদাভাব চলে গিয়ে তখন সারা মুখটায় একটা অস্বাভাবিক লাল দীপ্তি। মুখে যেন অনেকটা রক্ত উঠে এসেছে। নাকের উপরে আর কপালের ত্নু-পাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রগের উপর ছোট্ট নীলশিরাটা দপদপ করছে। আমি উঠব উঠব করছিলাম। আমার হাত চেপে ধরে ক্যাপ্টেন মিনতি জানাল, প্লিজ, এখুনি যেও না। আর একটু বস। একটুখানি। আর একটা বীয়ার খাও। না বলতে নেই। ত্যাখো, তুমি আসার আগেই আমি তিনটে শেষ করেছি। আর তুমি একটা খেয়েই উঠবার চেষ্টা করছ। নাও সিগারেট নাও। সিগারেটের জন্যে আমার অনুমতির অপেক্ষা কোরো না। স্রেফ টেনে যাও। শুধু আমায় একা ফেলে আজ তুমি পালিও না। ভাবছ আমি এত বীয়ার খাচ্ছি কেন, তাই না? তোমায় সত্যি বলছি 'বিম্' আমি পারছি না। কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। জীবনটা দারুণ বেয়াড়া, আর অসহ্য অর্থহীন মনে হচ্ছে। ঐ যে পূর্ব জার্মানির ছেলেত্নুটিকে দেখলে, জান ওরা কে? ওদের একজন আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ভাই বন্ধু কেন তার বড় যদি কিছু থাকে। আমরা ত্নু জনে একই গ্রামে, একই রাস্তায় একসঙ্গে খেলাধুলো করে মানুষ হয়েছি। একসঙ্গে সাঁতার দিয়েছি।

একসঙ্গে সাইকেল চড়া শিখেছি। সাইকেলে চেপে কতদিন স্কুল থেকে দু জনে গভীর বনের মধ্যে পুরনো দুর্গ দেখতে চলে গেছি। ও আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সকলকে চেনে। আমি বাড়ি না থাকলেও ক্ষতি নেই। পল্ দিব্যি রান্নাঘরের নিচু টুলে মায়ের পাশে বসে গরম গরম স্যুপ চাখত। ওর খাওয়া মোটেই অপরিষ্কার নয়। আর খেতে খুব ভালোও বাসত। আমি বরাবরই অল্প খাই। মায়ের সঙ্গে তাই প্রায়ই রাগারাগি।

মা পলের উদাহরণ দিলে আমার আরো রাগ ধরত। পল কিন্তু আমায় ভীষণ ভালোবাসত। আমার একটু ছবি আঁকার সখ ছিল বলে প্রায়ই ওর মায়ের রঙ তুলির বাক্সটা আমায় এনে দিত। ওর মা সুন্দর ছবি আঁকতেন। ছোটদের জন্যে অবিকল ছোটদের মতো একমাত্রার ছবি আঁকতেন। আমায় প্রায়ই নিজের আঁকা ছবি উপহার দিতেন। মাত্র একটা দুটো রেখায় কি সুন্দর রাগী চোখ, ভেংচি-কাটা মুখ, কিংবা হাসিভরা মুখের ছবি আঁকতেন। আমার টেবিলের উপর ঐ যে অতি সাধারণ ছবিটা দেখছ, ওটাও পলের মায়ের আঁকা। ঐ ছবিটা ছাড়া আর কোনো ছবি আমার কাছে নেই। শুধু ছবি কেন, কোনো স্মৃতিও আর নেই আমার। জলজ্যান্ত মানুষগুলোই সব হারিয়ে গেল, আর ছবি স্মৃতি দিয়ে কি হবে। শুধু পল নয়, তাদের ছোট্ট বাড়িটা, তার বাবা-মা—এমনকি আমার নিজের বাবা-মা-ও আজ আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। পল রয়ে গেল তার বাবা-মায়ের সঙ্গে পূর্ব জার্মানিতে। আমি পালিয়ে এলাম পশ্চিমে। আমার বাবা-মা বুড়ো হয়েছেন। তাঁরা কেউ ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে চাইলেন না। বললেন আমার সামনে হাজার কিলোমিটার লম্বা ভবিষ্যত। তাঁদের বুড়ো বয়েসের জন্যে এখন তো শুধু দু-চার মিটার মাত্র বিশ্রামের সন্ধ্যে। আগুন পোহাবার এই চামড়ার পুরনো চেয়ার, বাগানের দিকের রান্নাঘর, পড়ার টেবিলে আমার পিঠে-ব্যাগ বাঁধা প্রথম স্কুল যাওয়ার ছবি—এ-সব ছেড়ে কোথাও যাবেন না ওঁরা। তার পর থেকে হয়তো বছরে

একবার, কিংবা দু বছরে একবার মা-বাবাকে দেখতে যাবার সুযোগ পাই। ফেরার সময়টা ভীষণ খারাপ লাগে। মা আমার তবু খানিকটা শক্ত। কান্না চাপবার জন্যে খুব মন দিয়ে মাথা হেঁট করে আমার বাক্স গুছিয়ে দেন। আপেলের কেক তৈরি করে দেন। সারা বছর ধরে একটু একটু করে বোনা মোটা উলের সোয়েটারটা পাট করে হাতব্যাগে দিয়ে দেন। কিন্তু বেচারি বাবা। বাবা আমার বড্ড ছেলেমানুষ। মনে পড়ে আমাদের সেই আদ্যিকালের রকিং চেয়ারটায় বসে বাবা। আমি তাঁর বুকে শুয়ে শুয়ে কোটের মস্ত চকচকে বোতামটা খুলে নেবার চেষ্টা করতাম, বাবা কিছু বুঝতেই পারতেন না। একমনে সিগার টানতে টানতে একবার আমার মুখে সিগার পুরে দিয়ে মায়ের কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলেন। আমি যাবার দিন মানুষটা কিছুতেই ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুবেন না। মাকে জিগেস করলে বলতেন রাত্তিরে ঘুম হয় নি, তাই শরীরটা খারাপ। ব্রেকফাস্টও খাবেন না। আমি সব বুঝতাম। তবু যাবার সময়ে জোর করে বাবার ঘরে ঢুকতাম। কপালে চুমু খাওয়ার সময় দেখতাম যদিও চোখ দুটো বোজা, তবু চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। ভালো লাগে না···কিচ্ছু ভালো লাগে না··· কিচ্ছু না বিম···।

রাত বেড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন ফসের চোখে জল। গলার স্বর ভেঙে গেছে। কথা জড়িয়ে আসছে। তবু কথায় পেয়েছে আজ ক্যাপ্টেনকে। আর বীয়ার। বীয়ার খাওয়া যেন থামবে না কিছুতে। আমার মাথার মধ্যেও তখন একটু একটু করে বেকসের ফেনা কাজ শুরু করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে একটা ফেনার দ্বীপে বসে ক্যাপ্টেন ফস কাঁদছে আর কি সব বলছে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। কিন্তু স্রোতের টানে ফেনার দ্বীপ ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন ধরা ধরা গলায় বলছে, জান বিম, আজ আমি সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই—শালার সারা খচ্চর দুনিয়া। যে-কোনো জাতের যে কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। কথা বলি। কিন্তু একই জন্মভূমি

জার্মানি নামে একটি দেশে, আমার মা-বাবা, পল—আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কারুর সঙ্গে আজ আর কখনোই দেখা হয় না। কত যুগ পরে, কত শহর বন্দর পেরিয়ে, এই কলকাতায় এসে আজ পলকে দেখলাম। ভাবতে পার, এ সেই আমার ছেলেবেলার পল—সেই পল…অথচ আমরা দু জনে বিদেশী…দু জনের দুই আলাদা দেশের পাসপোর্ট। সেই আমাদের ছোটবেলা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। দেশ থেকে কতদূরে এই ভারতীয় বন্দরে এসে আজ পলের দেখা পেলাম। কলকাতা হুর্-রে। কলকাতা… কলকাতা…কলকাতা…আমার লক্ষ্মী সোনা কলকাতা…বেঁচে থাক আমার বন্ধু—ফিরিয়ে-দেওয়া, ছোটবেলা উপহার-দেওয়া এই সোনার কলকাতা…। এসো আজ বীয়ার দিয়ে সেলিব্রেট করি। কলকাতার দীর্ঘজীবন পান করি। কিন্তু সত্যি বলতে কি জান বিম, পলের সঙ্গে আজ আমার দেখা না হলেই বোধ হয় ভালো ছিল। এত জ্বালা সইতে হত না। আজ আমার একটা মেয়ের কাছে যাবার দিন ছিল। তার বগলে ডিওডোরাণ্ট আর স্তনের খাঁজে সেণ্ট পাউডারের গন্ধে সব ভুলে যেতাম…বেশ ভুলে থাকতাম সব কিছু…দূর ছাই কি যে হল…মরেও না পলটা…।

আবার বীয়ার খুলছে ক্যাপ্টেন ফস। এবার আর নিজে খুলতে পারছে না। হাত কাঁপছে। চাবিটা বোতলের মাথা থেকে কেবলই স্লিপ করছে। আমার হাত তখনো স্টেডি। কারণ, আমি ওর থেকে অন্তত দু বোতল কম খেয়েছি। চোখটা শুধু মাঝে মাঝে ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। মনকে ধোঁকা দিচ্ছি—ধ্যুৎ, বীয়ারের আবার নেশা কি। দু বার পেচ্ছাব করলেই তো সব ফর্সা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ বুঝতে পারছি সেই বেক্সের বিরাট চাবিটা ঘুরছে। আর একটু পরেই চাবিটা গঙ্গায় পড়বে। টুপ করে ডুবে যাবে। আর খুঁজে পাব না স্মৃতির চাবি। কেউ কথা রাখে না… রুণা চলে যাবে…টুপ করে ডুবে যাবে আমার জেগে থাকার চাবি রুণা…। বোতলটা ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে দূরে সরিয়ে

দিলাম। লাল ট্র্যাফিক লাইনের মতো চোখ তুলে করুণ মিনতি জানাল আমায়। এবারে দু জনে অর্ধেক অর্ধেক ঢেলে নিলাম। এক চুমুকে শেষ করেই ক্যাপ্টেন ফস টেবিলের উপর বোতলের পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে চোখ বুজল, আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, তুমি ভাবতে পার বিম—যে ছেলেটা তোমার ছোটবেলায় একই স্কুল আর গলির মোড়ে খেলা করেছে, সে আর তোমার কেউ না? পাইন দেবদারু সকাল শীত-কুয়াশা সূর্যস্নান বৈশাখ বেল-যুঁই সন্ধ্যের নিবিড় রুণা কি? ভাবতে পার যে তার সঙ্গে কোনো কারণে কখনো কোথাও আর তোমার দেখা হবে না? কার সঙ্গে? সেই রুণা? আর দুই দলে যুদ্ধ বাধলে ও হবে তোমার পরম শত্রু? হ্যাঁ শত্রুই তো—আলবৎ শত্রু…ও আজ আমার পরম শত্রু…। বন্দুক, আমায় বন্দুক উঁচিয়ে ধরতে হবে ওর মাথা লক্ষ্য করে। আমি বন্দুক তুলবো, নিশ্চয়ই তুলবো ওর মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু না না না না, গুলি আমি করছি না। অ্যামেরিকানরা কামান দিয়ে আমার মাথা গুঁড়িয়ে দিলেও, গুলি আমি করতে পারব না। সত্যি বিম, আমি সত্যি বলছি, আমায় কেটে টুকরো টুকরো করে দিলেও আমি গুলি ছুঁড়তে পারব না। কিছুতেই মারতে…পারব না ওকে…ও যে ভাই আমার…আমার বন্ধু… আমার আমার…আমার সব…না না না মারব না তোকে পল… কাছে আয় পল…কাছে…আরো কাছে…ছ্যাখ…ছ্যাখ।

ভাবছি আর মাথার মধ্যে সমুদ্রের নোনা জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। রুণা আর কেউ না আমায়। ক্যাপ্টেন ফস্ সেই ধরা ধরা ভাঙা ভাঙা গলায় সমানে বিড়বিড় করছে। মাথাটা টেবিলের উপর স্থির। চোখ বোজা। শেষে বিড়বিড় করাও বন্ধ হয়ে গেল। সরু লম্বা হাতটা মাথার পাশ থেকে টেবিলের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুয়ে আছে। আর একটা হাত থুতনির ঠিক তলায়। সে হাতের তর্জনী বন্দুকের ট্রিগার টেপার ভঙ্গিতে বাঁকানো। আমি আস্তে আস্তে ওকে টেবিল থেকে তুলে গাঢ় সবুজ কর্ডরায় মোড়া

ডিভানটার উপর শুইয়ে দিলাম। বেশ লম্বা। কুলাচ্ছে না ডিভানে। চটিপরা পা ছুটো ঝুলে রইল। মনে মনে বললাম, ঘুমিয়ে থাক রাজা, জেগো না আর। রূপালি চাবিটা সুন্দরভাবে হারিয়ে ফেলেছ তুমি, আমিও চাই আজ চাবি হারিয়ে ফেলতে··· হেরে গেছি একদম। জ্ঞান হারাবার যে কি সুখ তা বোকা হলেও আমি বুঝি। ঢেউয়ের নিত্য নতুন বিছানায় কেটে গেল তিন দিন তিন রাত। বাড়ি নেই ঘর নেই রুণা নেই।

কিন্তু এইভাবে এত তাড়াতাড়ি হেরে যাব ভাবি নি কখনো। শুধু রুণা নয়, একে একে দত্তবাড়ির সব ঘর অন্ধকারে হারিয়ে গেল। দত্তবাড়ির শেষ মজার খেলা দেখালেন মেজবাবু হরেন্দ্রচরণ। সেই চিরচতুর ঔরঙ্গজীব হরেন্দ্রচরণ। নিজের সম্পত্তির হিসেব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে আলিপুরের নতুনবাড়িতে উঠে গেলেন। সুনীলদা মারা যাওয়ার পর থেকেই সুব্রতবাবু কাজের হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। সবকিছু ভুলে যেতেন। ব্যবসার কিছুই আর খতিয়ে দেখবার চেষ্টাও করতেন না। ছাতা না নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ার মতো অসহায় মনে হত তাঁকে। মাঝে মধ্যে সকালের দিকে এক-আধবার জাহাজে যেতেন নেহাত অভ্যাসের বশে। কারবারের সব ভার ছিল হরেন্দ্র-চরণের উপর। তখন একমাত্র তাঁরই ছিল চেক সই করার ক্ষমতা। সুযোগটা উনি বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। তলে তলে দত্তকম্পানির সবচেয়ে বড় জাহাজি লাইনটা নিজের ব্যক্তিগত লাইন করে নিলেন। এর জন্যে তাঁকে কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল এটা ঠিক। কম্পানির কাজের নাম করে ছু-তিনবার বিলেত যেতে হয়েছিল তাঁকে। আসলে নিজের কাজ ফতে করে ফিরলেন কম্পানির পয়সায়। এখানের হিউটন সায়েব ছিলেন এজেণ্ট অফিসের এক নম্বর। তার বউকে হীরের হার এবং মাসে মাসে আরো বাড়তি কিছু সোনা-রুপো ছড়িয়ে সায়েবকে কিনে ফেলতে সময় বিশেষ লাগল না। তাই তো যারা বলে বৃটিশ বড় সাচ্চা জাত, তাদের

দেখলে হাসি পায়। ভালোমন্দ সব জাতের মধ্যেই আছে। একদিকে যেমন নির্লোভ, ন্যায় বিচারের ইংরেজ দেখেছি, অন্যদিকে তেমনি মিথ্যেবাদী, ঘুষখোর হীন ইংরেজও কম দেখি নি। হিউটন ছিল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। কাজেই নিঃশব্দে সব ঘটে গেল। সব জানলেন, সব শুনলেন সুব্রতবাবু। কিন্তু বাজ-খাওয়া পোড়ো বাড়ির মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একটা প্রতিবাদের সামান্য ইঙ্গিতেও তাঁর ঠোঁট কাঁপল না একবার। সেই চুনোট করা চওড়া পাড়ের ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবি আর চকচকে কালো বার্নিশ করা চীনেবাড়ির নরম চটি পরে, প্রকাণ্ড সাদা বুইক চেপে হরেন্দ্রচরণ মাঝে মাঝে আলিপুর থেকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করতেন। স্থির, অপলক সুব্রতবাবু শুধু একটি কুশল প্রশ্ন করে দূর গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তখন থেকেই দত্তবাড়ির চেহারা বদলে গেল। বড় তাড়াতাড়ি বিধাবার মতো মলিন থাম ন্যাড়া-গা আর করুণ হয়ে গেল দত্তবাড়ি। ক্যারাম আর তাসের আড্ডা নিভে গেছে। ঘুঁটি হারিয়ে গেছে। তাস নোংরা আর ছেঁড়া।

বিজনের পায়রাগুলো কোথায় যেন সব শেষ হয়ে গেল। পায়রার ছাদের তলায় আর রাবণের উনুন জ্বলে না। চায়ের কেটলি হাঁড়িগুলোয় অন্ধকার মাকড়সার জাল। অর্ধেক চাকর দিরদিনের মতো ছুটি পেয়ে দেশে চলে গেছে। লাল মাছগুলো একে একে মরে ভেসে উঠেছে জলের উপর। হাঁসের মাংস দূরের কথা, এখন মাসে একবার পাঁঠার মাংসও আসে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা বিজনের বাবা, অর্থাৎ, আমাদের চিরসুখী পেটরোগা সেজবাবুকে এখন প্রায়ই ধর্মতলার ট্রামের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আর বিজন নিজে এখন কোন্ ফিরিঙ্গিপাড়ার আনাচে-কানাচে দু নম্বর বাংলার বোতল নিয়ে বসে থাকে তা কেউ বলতে পারে না। আগে আগে কৃষ্ণচরণের ভয়ে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরত। কৃষ্ণচরণ চোখ বোজার পরে কত রাতে, কী ভাবে যে বিজন বাড়ি ফেরে তা কেউ জানে না। জীবনের শেষ কয়েকমাস

কৃষ্ণচরণ বড় বেশি ভুগেছিলেন। দেখলে কষ্ট হত। একবার ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তার পর থেকে প্রায়ই মাথায় বড় কষ্ট। মাথার চুল ছেঁটে একেবারে ছোট করে দেওয়া হয়েছিল। মুখের মধ্যে শুধু বড় বড় চোখদুটো ফ্যাল ফ্যাল করত। ধীরে ধীরে কিডনি বিকল হয়ে আসছিল। কিছু খেতে পারতেন না। মাঝে মাঝে রক্ত পেচ্ছাব হত। গলার কাছে চামড়া ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। আর হাতের চামড়া আলগা হয়ে, কুঁচকে হাতির শুঁড়ের মতো ভাঁজ ভাঁজ হয়ে গিয়েছিল। নানারকম ডাক্তার আনত, কত ওষুধ আর ইনজেকসান। মাঝে মাঝে নিজেই বলতেন, দ্যাখ বিমল, এ ভাবে বাঁচতে আর ভালো লাগে না। সেই সেজমা। বেচারী সেজমা: যিনি কাউকে একটা ফর্সা জামা পরতে দেখলে হিংসেতে বিছে কামড়ানোর মতো ছটফট করতেন, কিংবা ভাবতেন নিশ্চয়ই তাঁর ছেলের পাঞ্জাবিটা চুরি করে পরেছে, তিনিও তখন সেজবাবুকে কেউ দেখতে গেলে বসতে বলতেন। যে আমটায় পচ ধরেছে তার পচটা সযত্নে বাদ দিয়ে অতিথিকে খেতে দিতেন। আশ্চর্যভাবে মানুষ পাল্‌টে যায়। কোথায় গেল সেই ঝাঁক ঝাঁক চাকরের দল। বিজনের জুতোর ফিতে খোলার জন্যে আজ আর একটিও চাকর নেই। নেহাত পুরনো রঘুয়া, শ্রীপতি আর হরির মা টিঁকে আছে। কারণ, তারা জানে এই বয়েসে আর তাদের এত সম্মানের চাকরি কোথাও জুটবে না। কেউ সহ্য করবে না তাদের প্রতিপত্তি। আজকালকার লোকেরা, বিশেষত বউ-ঝিরা পুরোদস্তুর গতর খাটিয়ে নিয়ে তবে টাকা ছাড়ে। আর খাবারদাবার জিনিসপত্তর তো মোটেই লোকজনের হাতে ছাড়ে না। দেওয়ালে পোকাধরা টিকটিকির মতো ওৎ পেতে থাকে, কোথা দিয়ে কে কি বার করে নিচ্ছে। জীবনভর বাটি বাটি চা পাউরুটি খাওয়া অভ্যেস। এখন বললেই কি তা উবে যাবে। আরে বাবা টাকা তো বাবুদের, তোরা মেয়েমানুষ হয়ে এত পিড়িং পিড়িং কেন। আশা বৌমার মেজাজ নিয়ে শ্রীপতি নিজের মনেই বিড়বিড় করত 'কুয়োভাঙা রোদ্দুর—তার বড় চড়-

চড়ানি। অল্প বয়েসে গিন্নি—তার বড় ফড়ফড়ানি। অর্থাৎ, কুয়াশার পরের রোদটা যেমন তেজী, অল্প বয়েসের বউগুলোর মেজাজও তেমনি তিরিক্ষে।

আর বিজন। কোথায় গেল সেই গায়ে সেণ্টমাথা, সিল্কের শার্ট আর বিলিতি কাপড়ের প্যাণ্টপরা লালটু বিজন। এখন বিজন প্রতীক্ষা করে থাকে শুধু সন্ধ্যের। কতক্ষণে সন্ধ্যে হবে। দিনটা তার কাছে ফালতু। সন্ধ্যে হলেই খাঁটি বাংলা চাই। অন্য কিছু খাওয়ার পয়সা জোটে না। গাল ঢুকে, চুল উঠে, কপাল চওড়া হয়ে আর বুকটা ছিনে হয়ে অদ্ভুত দেখতে হয়েছে বিজনকে। তার উপর এমন-সব সস্তা গামছার কাপড়ের চেকদার হাওয়াই শার্ট পরে যে দেখলে গা গুলোয়। মনে হয় খানিকটা হয়তো আশার জন্যেই ছেলেটা অমন হয়ে গেল। সেই মান্ধাতার আমলের রাজবাড়ির জাঁক নিয়ে মেয়েটা এখনো এমন-এক জগতে বাস করে যেখানে রাজা-রাজরাদের পেচ্ছাবের শব্দও সংগীত-নির্ঝর হয়ে বাজে। এখনকার হতচ্ছাড়া গরীব বিজন সে রাজ্যে ঢোকবার পথ পায় না। এটা ঠিক একদিনে হয় নি। দিনের পর দিন আশার নির্বিকার নির্মম ঔদাসিন্যে ব্যাপারটা এগিয়েছে। বিজনের বা দত্তবাড়ির কোনো দুঃখকষ্ট, অভাব, বেদনার সঙ্গে আশা কোনো-দিন নিজেকে জড়িয়ে নেয় নি। সব সময়ই একটা গর্বমেশা ছাড়ো-ছাড়ো দূরত্ব। আশার ভাবগতিক দেখে মনে হয় ও যেন দয়া করে জমিদার বাড়ি থেকে এদের বাড়িতে সার্কাস দেখতে এসেছে। বেশ মনে পড়ে প্রতিদিন সকালে আশার নিয়ম করে পাখিকে আপেল খাওয়ানোর দৃশ্য। প্রচণ্ড টানাটানি আর দৈন্যে সারা দত্তবাড়িটা যখন জ্বলছে, তখন এইরকম নির্বিকারচিত্তে পাখিকে আপেল খাওয়ানো দেখলে কার না শরীর রি রি করে। হয়তো সেইজন্যেই বিজন গভীররাতে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে না ফেলা পর্যন্ত বাড়ি ফিরত না। বহুকাল পরে মৌলালির পানের দোকানের পাশে হঠাৎ সেদিন বিজনের সঙ্গে দেখা। জ্বলন্ত চারমিনারশুদ্ধ তার

হাতটা চেপে ধরতে বিজন থতমত খেয়ে মুখের দিকে তাকাল। বলল, কি ব্যাপার, বিমল না? এদিকে কোথায়? চেহারাটা বেশ রেখেছ মাইরি। আমাদের শালা…।

আমি বললাম, সত্যি বিজন, তোমার চেহারাটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। দুদিন বাইরে ঘুরে এসো না। পুরীতে তোমাদের বাড়ি যখন খালি পড়ে আছে তখন খরচা তো বেশি নেই।

বিজন আমার চোখের দিকে অদ্ভুত কুত্‌কুত্‌ করে তাকাল। যেন একটা ভীষণ মজার কথা শুনছে। তার পর ফের মাটির দিকে তাকিয়ে, পানের পিচ ফেলার মতো কেমন একটা তরল ফিকফিকে হাসি টেনে বললে, চেহারাটা শালা গেছে। আর কিস্‌সু হবে না। আগে আটত্রিশ সাইজ গেঞ্জি হত, এখন ছত্রিশ। আর আজ দোকানে যেতে বলল, আপনার চৌত্রিশটাই তো সাইজ, ছত্রিশ চাইছেন কেন। লাও ঠেলা। আমার গেঞ্জির সাইজ শালা আমায় শিখিয়ে দিচ্ছে। দোকানদারগুলোও আজকাল বলিহারি, জ্ঞান দিচ্ছে মাইরি…। আচ্ছা চলি…। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালদার ভিড়ের দিকে হারিয়ে গেল বিজন। আমার সামনে থেকেও এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল মৌলালির ট্রাম-বাস, শেয়ালদার ভিড়। রাস্তার সব কোলাহল হৈচৈ থেমে গিয়ে কানে শুনতে পেলাম শুধু একটা করে থাম, দালান, ছাদ, বারান্দা ধ্বসে পড়ার শব্দ। দত্তবাড়ির মানুষগুলো সব টুপটাপ চুন-সুরকির মতো তার সঙ্গে ঝরে পড়ছে। সেই লোহার গেট উপড়ে পড়ল। তার পর দু-পাশের পরীদুটো খসে পড়ে গেল। তাদের নাক থেঁতো হয়ে গেল। শুকনো স্তন ভেঙে, হাঁটুমুড়ে তারা ক্রমে সাধারণ মানুষ হয়ে গেল। হঠাৎ গলাকাটা মুরগির মতো তাদের আধভাঙা ডানা দুটো শুধু আকাশের দিকে ঝটপট করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এ ভূমিকম্পের কথা দত্তবাড়ির একজন মানুষ শুধু বুঝেছিলেন, তিনি সুব্রতবাবু। তিনি ঠিকই জানতেন এ ভাঙন আসবেই।

তাই অনেক আগেই উনি দত্তবাড়ির ছায়া থেকে সরিয়ে দিলেন আমায়। প্রথমে বুঝি নি। কিংবা বুঝতে চাই নি। তাই প্রথম আঘাতটা বড় প্রচণ্ডভাবে লাগল। ভাবলাম, যাদের জন্মে জীবনের শ্রেষ্ঠদিনগুলো রক্ত দিয়ে খাটলাম, তারা আজ আমায় সরিয়ে দিতে চায়। তাড়িয়ে দিতে চায়। কতদিনের স্মৃতিভরা কাকের বাসা নড়ল। একটা নাড়িছেঁড়া যন্ত্রণা। একটা বুলেট-খাওয়া অভিমান। তখন ঠিক বুঝতে পারি নি এই ছেঁড়াকাটা যন্ত্রণা থেকে আমি আমার নিজের রাজ্য কী ভাবে খুঁজে পাব। স্বাধীনভাবে বাঁচবার মাটি পাব। সব সুব্রতবাবুর দান। তাঁর ঋণ জীবনে শোধ হবার নয়। হ্যানিসায়েবের ছোট্ট এজেন্সি অফিসে সেদিন তাঁর সামান্ত সহকারী করে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সুব্রতবাবু। কাজপাগলা, আইবুড়ো হ্যানিসায়েব খুব ধীরে ধীরে বাজিয়ে নিয়েছিলেন আমায়। যখনই জাহাজ আসতো, দিনরাত পাগলের মতো পড়ে থাকতাম জাহাজের কাজ নিয়ে। জাহাজের লোডিংপ্ল্যান আঁকা থেকে শুরু করে, ড্রাফটের ইঞ্চি মিলিয়ে, স্পেসের কিউবিক হিসেব করে, শুধু মাল নয়, তেল জল ইত্যাদিও লোড করতে শিখিয়েছিলেন সুব্রতবাবু নিজে। ফলে হ্যানিসায়েব আমার কাজে খুঁত ধরতে পারে নি কোনোদিন। অথচ লোকটা ছিল জন্ম-খুঁতখুঁতে। তাই প্রথম বেশ অবিশ্বাস, তার পর বিশ্বাস, তার পর নির্ভর, তার পর একেবারে ছেলের মতো ভালোবাসা পেলাম সায়েবের কাছ থেকে। ধীরে আমার উপর সবকিছুর ভার ছেড়ে দিয়ে একদিন দেশে ফিরে গেল হ্যানিসায়েব। শীতের দেশের মানুষ, অথচ ঠাণ্ডা মোটে পছন্দ করত না। কলকাতার মতো অতি সামান্ত শীতে সায়েব রোজ বলত যাচ্ছেতাই ঠাণ্ডা পড়েছে। কবে যে শীতটা যাবে। যাবার আগে খুব জোর দিয়ে হ্যানিসায়েব বলেছিল, তোমাদের এই পচা গরমের দেশ থেকে ওদেশে গিয়ে তবু কিছুদিন বেশি বাঁচবো।

এত জোর-গলায় বলার জন্মেই ভয় হয়েছিল। দেশে গিয়ে

হ্যানিসায়েব বেশিদিন বাঁচেন নি। প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে জাহাজে হাজির হওয়ার অভ্যেসটা আমার হ্যানিসায়েবের থেকেই পাওয়া। আগের দিন পার্টিতে যত রাতই হোক, পরের দিন সকালে হ্যানিসায়েবকে জাহাজে দেখে সাতটার সঙ্গে ঘড়ি মেলানো যেত।

সেদিনও এমনি ভোরে জাহাজে গেছি। প্রথম শীতের নীল আকাশ রোদ্দুরে ঝলমল করছে। খিদিরপুর ডকের পশ্চিম পাড়ে জাহাজ। শীতের গন্ধমেশা ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়াটা নাকে লাগছে। বেশ বুঝতে পারছি নাকের ডগাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রুণা প্রায়ই নাকটা কীরকম ঠাণ্ডা হয়েছে দেখতে বলত। যাক ওসব। আশ্চর্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা দিন। এ-সব দিনে মনটা কিছুতেই কাজে বসে না। মাথা তুললেই দৃষ্টিটা মাছি হয়ে ক্রেনের মাথা পেরিয়ে সোজা আকাশের ঘন নীল কাঁচে ধাক্কা খায়। চোখে নীল লেগে যায়। এ-সব দিনে একটু-আধটু ভুলচুক হলে কারুকে বকতে ইচ্ছে করে না। একটু ঘাম নেই, কষ্ট নেই, মাথাটা কী হালকা। গাড়িটা শেডের ছায়ায় রেখে খুব তুলতুলে মেজাজে কী লাইনের উপর দিয়ে জাহাজের দিকে যাচ্ছিলাম।

একটা অল্পবয়সী ছেলে ছুটে এসে হাতে ছোট্ট স্লিপ দিয়ে গেল। পাশের জাহাজেই সুব্রতবাবু আছেন। সুবিধেমতো আমি যেন একবার দেখা করি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাশের জাহাজটায় গেলাম। একটা পচা-গলা ধড়ধড়ে নোংরা গ্রীক জাহাজ। একেবারে গলায় গলায় গম পেটে পুরে এখানে এসেছে। ক্রেন ডেরিকে হৈহৈ করে গমের বস্তা নামছে। আমায় উপরে উঠতে দেখে ফোরম্যান মণ্ডল, হ্যাচের মিস্তির, সুপারভাইজার ঘোষ সবাই হাসি হাসি মুখে গ্যাংওয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। ওরা প্রত্যেকে আমার কাছে কাজ শিখেছে। বছরবছর দিনরাত একসঙ্গে সবাই কাটিয়েছি। অনেকদিনের অনেক হাসি তামাশা, রাগ আর ভালোবাসা ওদের সঙ্গে। কোনো-একটা জাহাজে যেন মণ্ডলকে কোন্ পোর্টের মাল

চলছে জিগেস করতে মণ্ডল বলেছিল, 'export', শুনে জাহাজশুদ্ধ সবাই হেসে বাঁচি না। বেচারা ভালোমানুষ মণ্ডল। চিরকালই একটু বেশি বোকা। গালতোবড়া, রোগা, কালো, ছিপছিপে দাঁত উঁচু আর খুব নিরীহ চেহারার মানুষ মণ্ডল। যে-সব লোকের মুখ বা চেহারা দেখে বয়েস আন্দাজ করা যায় না, মণ্ডল সেই দলের। গত বিশবছর ওকে একরকম দেখছি। বাড়িতে আবার বাঁশী বাজানোর সখ। তাই নিয়ে সবাই ক্ষেপায় ওকে। মণ্ডলের ঠিক উলটো হল মিস্ত্রির। মোটা বেঁটে আর রাম খিস্তিবাজ। মদেই মাসের রোজগার খতম। দশবারো তারিখ থেকে ধার শুরু। দু দিন অন্তর দাড়ি কামায়। ফলে, গোলগাল খোঁচা খোঁচা ইতিউতি দাড়ি ঠিক রেড়িফলের মতো দেখায়। তবে সত্যিকার কাজ বোঝে লোকটা। মদ পেটে না পড়লে, আর ইচ্ছে থাকলে সে একাই দশজনের কাজ ম্যানেজ করে দিতে পারে। আমি উপরে যেতেই সেই বীয়ারের বোতলে চা এলো। সঙ্গে তেলেভাজা। অতিথি আদরের এটাই ডকের দস্তুর। এতে না বললে ভীষণ অপমানের ব্যাপার। চায়ের ভাঁড়টা হাতে নিয়ে মিস্ত্রিরকে ঠাট্টা করে বললাম সকাল থেকে সে নিজে ডাউন-বাই-দি-হেড হয়ে যায় নি তো। জাহাজের মুড়োর দিকে বেশি মাল নেওয়া হয়ে গেলে মাথার দিকটা বেশি নেমে যায়। তখন পিছনের দিকে মাল নিয়ে ফের ইভন-কিল করতে হয়। যখন মাথার দিক বেশি ডোবে তখন বলা হয় ডাউন বাই দি হেড। বেশি মাল খেলে সাধারণত ডকে আমরা মানুষের বেলায় ঐ কথাটা বলে থাকি। সবাই হো হো করে হাসল। আমি তখন সবে চায়ের ভাঁড়টা ঠোঁটে ঠেকিয়েছি। ঠিক সেই সময় দূরে ফরেড-ডেক থেকে একটি প্রচণ্ড সম্মিলিত চিৎকার ভেসে এলো। আমার হাত থেকে ভাঁড়টা আপনি খসে পড়ল। সবাই ছুটলাম সেইদিকে। কাছে গিয়ে যে দৃশ্য দেখতে হল তা আমার মেরুদণ্ডের উপর লোহার বিম পড়ে যাওয়ার মতো মর্মান্তিক। মরচেধরা নোংরা ডেকের উপর সুব্রতবাবুর ছোট্ট দেহটা অল্প পাশ ফিরে শুয়ে আছে। নাকের গর্ত

দিয়ে আর ঠোঁটের কষ বেয়ে সরু লাল সুতোর মতো একটা রক্তের ধারা। সুন্দর করে কামানো মুখ। চোখ দুটি বোজা। ভুরুর ঠিক নিচে ডান চোখের পাতার উপর সেই পুরনো কাটা-দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চশমাটা কাছেই ছিটকে পড়ে গেছে কিন্তু কাঁচ ভাঙে নি। মানুষটাই শুধু ভেতর থেকে ভেঙে গেছে। মাথার কাছেই তিনটে নিরেট গম-ঠাসা বস্তা পড়ে আছে। মাথার ঠিক উপরেই অনেক বস্তা সমেত পুরো সিলিংটা ক্রেনের মুখ থেকে দুলছে। তার থেকে বস্তার আলগা মুখ বেয়ে হালকা বৃষ্টির মতো গম ঝরে পড়ছে সুব্রতবাবুর চুলে মুখে গায়ে। কোন ফাঁকে যে মানুষটা এদিকে এসেছিল কেউ তেমন লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ দড়ির সিলিং ছিঁড়ে তিনটি বস্তা মাথার উপর পড়ে নিমেষে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। কেউ সময় পেল না এতটুকু বোঝবার, ভাববার। অথচ আজকের দিনটা কী আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল, নরম, নীল। আমি তখনো ভাবছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ আঘাত পেয়ে হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ভীষণ পা কাঁপছে আমার। মনে হচ্ছে একটা কিছু না ধরলে দাঁড়াতে পারবো না। জাহাজের দু-তিনটে অফিসার আর স্বয়ং ক্যাপ্টেন ছুটে এসেছে। চারিদিকের ভিড় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি বোবা পাথর। কথাই বেরুচ্ছে না। আমার থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে সেই মানুষটা পচা লোহার ডেকের উপর শুয়ে, বাড়িতে যার মিশরীয় তুলার কত নরম শাদা বিছানা কাঁদছে। কিছুতেই কিছু মাথায় ঢুকছে না। যার নামে এখনো সারা কলকাতা বন্দর ছুটে আসতে পারে, সেই কর্মশক্তিতে টানটান বৃদ্ধ-যুবকটি কেন আজ এত অসহায় হয়ে এইখানে শুয়ে। হঠাৎ যেন মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। চীৎকার করে মিস্তিরকে ডেরিক ঘোরাতে বললাম শেডে। এক হ্যাঁচকায় একটা লোহার খালি ফলেঞ্চা নিজেই টান দিলাম হুকে লাগাবার জন্যে। সবাই মুহূর্তে এসে হাত মেলাল আমার সঙ্গে। জাহাজের অফিসাররা সবাই কাছাকাছি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে। সারা ডেকে বাজপড়া স্তব্ধতা। তখনো সুব্রতবাবুর চুল

বেয়ে গম ঝরছে। চোখের রেখা বেয়ে গম ঝরছে অশ্রুর মতো। অজস্র সোনালী গম কার চোখের জল হয়ে অবিরাম ঝরছে। আর অবাধ্য, নিষ্ঠুর, বোকা, অপরাধী ক্রেনটা নির্বোধ জন্তুর মতো মাথার উপর দাঁড়িয়ে। পুরনো সর্দাররা সবাই কাঁদছে। মিস্ত্রির, মণ্ডল, ঘোষ ওরাও আর কান্না চাপবার চেষ্টা করছে না। আমায় আর কিছুই বলতে হল না। বুড়ো জিয়া-সর্দার তার মেহেদিমাখা লাল দাড়ি আর ধবধবে সাদা টুপি সমেত মাথাটা নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে নিচু করে লোহার ফলেঞ্চার উপর বসেছে। কোলে তুলে নিয়েছে সুব্রতবাবুর ঘুমন্ত মাথা। চশমাটা পরিয়ে দিয়ে মণ্ডল ভীষণ কাঁদছে। ফলেঞ্চার চার কড়ায় হুক লাগানো হল। উইঞ্চে বসেছে চীফ অফিসার নিজে। ধীরে ধীরে পুরনো স্টিম-উইঞ্চের আর্তনাদ বাড়ল। দু জন মানুষ নিয়ে ফলেঞ্চাটা ডেক থেকে উঠে, আস্তে আস্তে নীল আকাশের তলায় দুলছে। আর দেরি নয়। গাড়ি আনতে হবে একেবারে কী লাইনের উপর। তখনো অসহ্য পা কাঁপছে। মনে হচ্ছে কষে দড়ি বেঁধে পা-দুটো শক্ত করে রাখি। জানি না কোন অলৌকিক শক্তিতে আমি তরতর করে নিচে নেমে গাড়ি নিয়ে দাঁড় করালাম কী লাইনের উপর। সুব্রতবাবুর মাথা কোলে নিয়ে পেছনের সিটে বসল মণ্ডল। সে কিছুতেই ছাড়বে না তার আমার সকলের বাপের মতো মনিবকে। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে আর একবার তাকালাম জাহাজটার দিকে। তার পর আকাশের দিকে। জাহাজের একেবারে ফরোেড, গায়ের উপর লম্বা ঝুলন্ত পাটাতন লাগিয়ে, দুটি লম্বা লম্বা সোনালী চুলের নাবিক তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে জাহাজের নাক পেণ্ট করছে। গায়ে তাদের লালডোরা স্পোর্টস গেঞ্জি। উপরে নীল নরম আকাশ। ওদের দু জনের সোনালী চুলঘিরে শাদা রুমালের মতো অজস্র সীগাল উড়ছে। রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানাল একরাশ পাখা। বিদায়। সবাই বিদায় জানাচ্ছে স্তব্ধ নীরব তাদের বহুদিনের জলের রাজাকে। কোন ক্যাপ্টেন যেন একবার বলেছিল, 'Seagulls are

born from the handkerchiefs that wave goodbye in ports।' ডানায় জল-লাগা অজস্র সীগাল, কান্না-ভেজা অজস্র শাদা রুমাল। উড়ে উড়ে বিদায় জানাচ্ছে সেই মানুষটাকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর যিনি এই গঙ্গার বুক বেয়ে অজস্র জাহাজে উঠেছেন। কিন্তু আজ থেকে আর কোনো জাহাজে উঠবেন না। কোনো দিন না।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে এই শীতের রাতেও যেন মাথায় আগুন জ্বলছে। ঘুম আসছে না কিছুতে। সুব্রতবাবুকে জড়িয়ে সারা দত্ত-বাড়ির কত রঙের দিনরাত আর মুখের মিছিল। ছেলেবেলায় অতি প্রিয় কোনো জাপানী খেলনার স্মৃতির মতো—রুণা। তার পর সব অন্ধকার। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা স্বপ্নের যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল। মাথার চুলের গোড়ায় ছোট্ট ফোড়ার মতো কি যেন একটা হয়েছিল। অজান্তে খুঁটে ফেলে ভীষণ জ্বালা করছে। স্নানের সময় যতবার কলের তলায় মাথা দিচ্ছি, জলের সঙ্গে মাথা দিয়ে কেবলই রক্ত বেরুচ্ছে। সমস্ত জলটা কি দারুণ লাল হয়ে যাচ্ছে।

—